সমাজ ও শিল্প-সমীক্ষা

সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা

প্রতিভা গুপ্ত, এম. এ., বি. টি. (কলিকাতা)

ডিপ্লোমা ইন্ নার্সারী এণ্ড প্রাইমারী এডুকেশন (লণ্ডন), ট্রেনিং ইন বেসিক এডুকেশন, (সেবাগ্রাম, ওয়ার্দ্ধা) পরিচালিকা, শিশুশিক্ষা শিক্ষণবিভাগ, অধ্যাপিকা, শিশুশিক্ষা-নীতি ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেন, কলিকাতা এবং ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ, কলিকাতা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা-১২

তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তথ্যের প্রয়োজন। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি যাতে প্রমাণসিদ্ধ হয় তার জন্য পরীক্ষামূলক শিক্ষাকার্য্যের আবশ্যক। শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বগুলিকে প্রয়োগ করতে হলে প্রথমে সেগুলিকে জানতে হবে। তাই এই গ্রন্থে প্রথম চার অধ্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষামনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হলো। শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বগুলির প্রয়োগফলে, আমার শক্তিসামর্থ্যানুযায়ী যে তথ্যগুলি পেয়েছি তা শিক্ষানুরাগী সকলের নিকটে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদন করলাম।

ভূমিকা
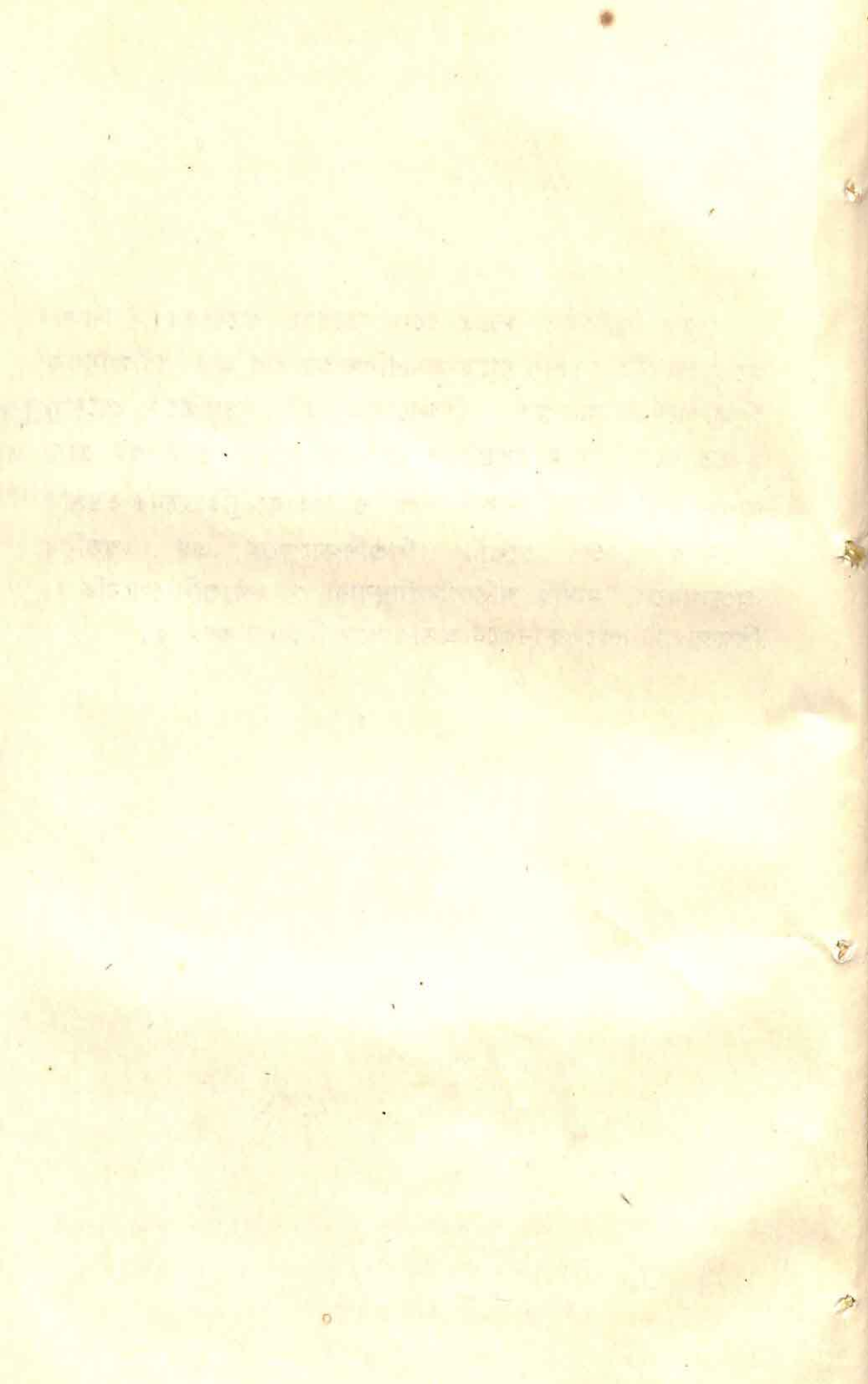
বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি কথার আলোচনা চলিতেছে—পরীক্ষা, অভীক্ষা ও সমীক্ষা। এই তিনটি কথার মধ্যে পরীক্ষা কথাটি চির পুরাতন। চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষের, বিশেষভাবে রোগীর শরীরের পরীক্ষা করেন; শিক্ষকেরা ছাত্রদের বিদ্যার পরীক্ষা অনবরত করিয়া থাকেন। এই পরীক্ষা করিবার প্রণালী গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অনেকবার পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। এই বিভিন্ন রূপের মধ্যে দেখা গিয়াছে দুইটি স্বতন্ত্র উপায় যাহাকে বলা হইয়াছে অভীক্ষা প্রস্তুতিকরণ ও অল্পবয়স্কদের সমীক্ষণ। আবার অভীক্ষাগুলি মানুষের সাধারণ জীবনের নানা দিকে কার্য্যকরী শক্তিগুলির পরিচয় দিতেছে, যেমন কৃত্যঅভীক্ষা (performance tests) মানুষের কৃত্যের পরিচয় দেয়, মানসিক অভীক্ষা (mental tests) মানুষের মনোবয়স নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার মনের বিকাশের পথ দেখাইয়া দেয়, যৌক্তিকতা-অভীক্ষা, (reasoning tests) নানা বিষয়ে যুক্তির দিকগুলি দেখাইয়া দেয়, বুদ্ধিগত অভীক্ষা (intelligence tests) অল্পবয়স্কদের মনস্বিতা বিকাশের গতি নির্ণয় করিয়া দেয়। বৃত্তীয় অভীক্ষা (vocational tests) তাহাদের উপার্জ্জন শক্তির আভাস দেয়। এইজন্য বর্ত্তমান যুগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে জন্ম-বয়সের (chronological age) সহিত মনোবয়সের (mental age) কতখানি সম্বন্ধ আছে তাহা নিরূপণের জন্য শিক্ষাবিদেরা ব্যস্ত রহিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের গবেষণার ফলে শিক্ষকেরা আজ নূতন নূতন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করিতেছেন।

এখন সময় আসিয়াছে প্রাক্-প্রাথমিক শিশুজীবন কি ভাবে গঠিত হইতেছে তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবন। নূতন দৃষ্টিতে

শিশুজীবন অনুশীলন করার দিন আসিয়াছে। এই অনুশীলনের মধ্য দিয়া পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি সকলেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের পরিচয় পাইবেন। শিশুর প্রাণধারা ও কর্ম্মধারা কোন পথে চালিত হইতেছে তাহাও জানিতে পারিবেন। শিশুর জীবনবিকাশের যে সকল সমস্যা সকল কালেই দেখা যায় তাহা সমাধানের একমাত্র উপায় শিশু-সমীক্ষণ। শিশু-সমীক্ষণ কি ভাবে করিতে হয় সে বিষয়ে শ্রীযুক্তা প্রতিভা গুপ্ত তাঁহার "সমাজ ও শিশুশিক্ষা" বইটিতে প্রথমে বিশদরূপে আলোচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৫০-১৯৫২ সালে বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় লেখিকাকে "নরসিংহ দাস পুরস্কারের" দ্বারা সমাদর করেন। এখন শ্রীযুক্তা প্রতিভা গুপ্ত তাঁহার "সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা" গ্রন্থটির মধ্য দিয়া শিশুর জীবন প্রস্তুতিতে শিশু-সমীক্ষণের স্থান কি সে সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতাগুলি জানাইয়া দিতেছেন। ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে বইখানি পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। সকলেই এই বইখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন একথা বলা বাহুল্য। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **জিতেন্দ্রমোহন সেন**
১৬ই মার্চ্চ ১৯৫৫

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

শিশুপর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি

শিশুপর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি

প্রাণের লক্ষণ বৃদ্ধি, জীবনের মহিমা প্রকাশে। প্রাণের অভিব্যক্তিতে জীবন হয় পরিপূর্ণ, কর্ম্ম হয় সার্থক। মহাপুরুষগণ মানবজীবনের যে আদর্শের কথা বলেছেন তা পরিপূর্ণতার আদর্শ। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের দ্বারা জ্ঞানে, কর্ম্মে ও প্রেমে আত্মোপলব্ধি হলে মানুষ হবে পরিপূর্ণ—এই শিক্ষাই ভারতের শিক্ষা। শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শুধু বিদ্যা সঞ্চয় করা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। মানুষকে সকল প্রকার বন্ধন হতে মুক্তি দেওয়া, মানুষের আত্মাকে প্রচ্ছন্নতা থেকে রক্ষা করাই হলো শিক্ষার সাধনা। আজকের শিক্ষায়তনে বিদ্যার যে অনুশীলন হবে তা শুধু বুদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, শিশুর জীবনে তা হবে প্রত্যক্ষ ও সত্য। তাই আজকের শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ হলো—জগৎকে জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে ও আনন্দরূপে উপলব্ধি করা। কাজেই যিনি শিক্ষার্থীর যথার্থ গুরু, তাঁর শুধু জ্ঞানের চর্চ্চা করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে চাই হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা ও কর্ম্মানুষ্ঠান, যার ফলে তিনি পাবেন শিশুর অন্তরের সন্ধান। শিক্ষা দেওয়া যান্ত্রিক পদ্ধতিমাত্র নয়—শিক্ষা হলো চিত্তের গতিবেগে চিত্তকে জাগিয়ে দেওয়া। গুরুর কাজ হলো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে আপনার চিত্তের গতিবেগে শিষ্যের চিত্তে গতি সঞ্চার করা, তাকে সক্রিয় করে তোলা।

শিশুরা স্বভাবতঃই সক্রিয়, সন্ধানী ও কুতূহলী। ব্যবহারিক জীবনে যে সব সমস্যা প্রবল হয়ে উঠে তাদের জীবনযাত্রাকে শ্রীহীন ও প্রাণহীন করে তোলে সেই সমস্যাগুলিকে নিজের চেষ্টায় সমাধান করবার তাদের একটা স্বাভাবিক তাগিদ আছে—এটি হলো শিশুদের প্রাণধর্ম্ম। এই প্রাণেরধর্ম্ম যাতে মরে না যায়, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের দ্বারা যাতে জীবনের অভিব্যক্তি আপনার ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে, তার দায়িত্ব হলো গুরুর। প্রাণধারাকে সরস, সতেজ ও আনন্দময় করবার ব্রত গ্রহণ করবে দেশের শিক্ষায়তন। এইরূপে কল্যাণের যে ক্ষুদ্র দীপশিখাগুলি জ্বলবে এখানে, একদা সমগ্র দেশেই তার আলো ছড়িয়ে পড়বে। যখনই শিশুর মনে জাগবে একটা প্রশ্ন, যখনই কোন সন্দেহ তার মনে আনবে বিভ্রান্তি, তখনই সত্যের আলোয় তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার হলো গুরুর। গোপনে, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে বীজকে অঙ্কুররূপে জাগিয়ে তোলা, মুকুলকে প্রস্ফুট রঙে রাঙিয়ে তোলা, ফুলকে সুমধুর ফলে পরিণত করে তোলাই হলো গুরুর প্রকৃত কাজ। তাই তিনি শিশুমনের অসীম রহস্য, তার হৃদয়ের বর্ণচ্ছটা, তার জীবনের চঞ্চল স্বপ্নমায়া পর্য্যবেক্ষণ

করবেন ধ্যাননিবিড় দৃষ্টি দিয়ে। তাই শিশুর কামনা-সাধনায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ও আনন্দ-বেদনায় চাই পিতামাতা ও গুরুর সহানুভূতি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি। কেননা, প্রত্যেক শিশুর মনটিকে জেনে তার স্বধর্ম্মানুসারে তাকে ফুটিয়ে তুলে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে শিক্ষা দেওয়া সহজ তো নয়ই, রীতিমত সাধনার বিষয়।

প্রাচীনকালে জীবনধর্ম্মের সহজ বিকাশ হতো প্রতি গৃহস্থের গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য দিয়ে। তাতে ফল হতো এই যে শিশু স্বাভাবিক ভাবেই তার বংশানুগত শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি ও সম্ভ্রম-নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হতো। গৃহের মনোরম পরিবেশে সে নিঃসঙ্কোচে ও স্বচ্ছন্দমনে বৃদ্ধিলাভ করতো। বিশেষ করে, প্রাচীন ভারতে মানুষের চরম লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সাধনার দ্বারা জীবনের পরিপূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধি করা—এই জীবনাদর্শের মধ্যে শিশুরও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু কালধর্ম্মে প্রাচীন ও বর্ত্তমান সময়ে কত প্রভেদ! সমাজের জটিল ব্যবস্থায় শিশু আজ তার স্বাভাবিক স্থান হতে বিচ্যুত হয়েছে, মানুষের শিক্ষাধারাও তার আদর্শচ্যুত হয়েছে। মনুষ্যত্বের প্রাচীন আদর্শকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মানুষ আজ কেবল ব্যবহারিক বস্তু সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। নিরাবরণ নিরাভরণ অবস্থা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছে অজস্র সম্পদ। বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে পেয়েছে যুগপৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করবার ক্ষমতা। বস্তু সাধনায় মানুষের যে সিদ্ধিলাভ তাকে অস্বীকার করলে চলবে না, কেননা বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা আজ অবিসম্বাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, এই সিদ্ধিলাভের ফল কি? দেখা যাচ্ছে যে, এতে মানুষ প্রবল হয়েছে কিন্তু শান্তি পায়নি। সমাজের ভিত্তিতে এসেছে অতৃপ্তি, এসেছে অশান্তি। অতৃপ্ত মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ করে যুদ্ধ করেছে এবং একটি কুরুক্ষেত্র শেষ হতে না হতেই সুরু হয়েছে আর একটির উদ্যোগপর্ব্ব। তাই মানুষের আজ চেতনা হয়েছে যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ও অচিন্ত্যনীয় শক্তি লাভ করেও তো নিদারুণ ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচা গেল না, তাহলে জীবনের এই শ্রীহীনতা দূর করবার উপায় কি? তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের নির্দ্দেশ হলো যে জীবনকে সার্থক করতে হলে চাই শিব ও শক্তির মিলন। মঙ্গল ও ঐশ্বর্য্য, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সাধনার যথার্থ মিলনে আসবে মানবসভ্যতার সম্পূর্ণতা, গড়ে উঠবে নূতন সমাজ। এই নূতন সমাজের জন্য চাই নূতন ধরনের শিক্ষা। সেই শিক্ষার ধারকরূপে চাই সুদূর-প্রসারী সমাজবিপ্লব সংগঠন, এবং তার বাহকরূপে চাই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন উন্নত চরিত্র মানুষ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে স্বধর্ম্মানুসারে মানুষ পূর্ণতা লাভ করবে এই হলো

মানুষের বাহ্যিক দাবী। আবার পারমার্থিক আকর্ষণে মানুষের সঙ্গে মানুষ মিলিত হয়ে সত্যকে উপলব্ধি করবে—এ হলো তার অন্তরাত্মার দাবী। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতা লাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব ইহা হইলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে।" (১)

মানুষের মধ্যে দুটি মানুষ যে এক নয়, এই বৈচিত্র্যকেই প্রাধান্য দিয়ে এতদিন গড়ে উঠেছে আত্মঘাতী সমাজ। এই ভেদবুদ্ধি দৃষ্টিকে এমন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে যে সত্যের পরিবর্ত্তে কেবল শক্তির পিছনে ছুটে মানুষ আজ ব্যর্থ। আজ সমগ্র বিশ্বমানব ক্রমে উপলব্ধি করেছে যে এই জটিল বৈচিত্র্যের মধ্যেই আছে মূলগত একতা এবং একমাত্র একতার সাহায্যেই আসতে পারে সুবিরাট মানবতার সুসংহত কল্যাণশক্তি। তাই আজ শিক্ষাপদ্ধতির আমূল রূপ পরিবর্তন করে শিক্ষাকে দেশের জীবনধারার সঙ্গে শুধু মানিয়ে নিয়ে নয় কিন্তু মিলিয়ে দিয়ে নব উদ্যমে নব শিক্ষা-প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলবার ইচ্ছা দেখা দিয়েছে। এতেই মানুষ একদিন তার সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে জীবনে মর্য্যাদা লাভ করবে, প্রতিষ্ঠিত হবে আপনার মহিমায়।

শিক্ষার এই নূতন রূপের সঙ্গে মানুষের জীবনধারার সামঞ্জস্য ঘটাতে হলে তার শরীর ও মনের বিকাশগতির সঙ্গে গভীর ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই। যে প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষের আত্মপ্রতীতি ও শক্তির উদ্বোধন হয়ে তার জীবনে সত্যের উপলব্ধি হয়, সেই প্রচেষ্টাকেই মনীষিগণ বলেছেন শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা সত্যকে লাভ করা একটি অন্তহীন প্রচেষ্টা—মাতৃগর্ভে যেদিন শিশুর জন্মসম্ভাবনা হয় সেদিন হতে তার সুরু আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া পর্য্যন্ত তার গতি। এই জীবনব্যাপী শিক্ষার কথাই বলেছেন গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ও ডিউয়ি।

বস্তুজগতেই হোক কি মনোজগতেই হোক সত্যের উপলব্ধি আসে কর্ম্মের দ্বারা। আত্মশক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় এমন শিক্ষা দিতে হলে কর্ম্মকে যেমন জানতে হয় তেমনি জানতে হয় কর্ম্মীকে। এই দুই এর প্রকৃত সমন্বয়েই শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। জন্মক্ষণ হতে মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের দেহ ও মন যে একটা ছন্দোময় গতিতে এগিয়ে চলে একথা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। শৈশবে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায়, পরম নিশ্চিন্তে, স্নেহ ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে মানুষ জীবনী-রসে পরিপুষ্ট হলে পরেই সে যে ভবিষ্যতে কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়, এ জ্ঞানও আমাদের অনেকের নাই। মানুষের শিক্ষাপদ্ধতি কি হবে, এবিষয়ে চিন্তা করেছেন বহু মনীষী, কিন্তু সেই শিক্ষা যে গ্রহণ করবে তার নেওয়ার ক্ষমতা

(১) ধর্ম্ম—১২০ পৃষ্ঠা—রবীন্দ্রনাথ।

কতটুকু, তার কাজ করবার শক্তি কি উপায়ে বৃদ্ধি পায়, কাজের প্রতি তার অনুরাগ বা বিরাগ কি ভাবে জন্মায়, সব শেষে তার মনকে কি ভাবে সচেতন করে তুললে সে সমাজের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজে নিতে পারবে সে বিষয়ে সুসংহত চিন্তা সবে মাত্র সুরু হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইতিহাসের বহু ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ আজ বুঝেছে যে সমাজের ভিত্তি হলো শিশু—তার সামগ্রিক সত্তার পূর্ণ বিকাশেই আসবে মঙ্গল, জীবনের সাধনা হবে সার্থক।

শিশুর মনটিকে বুঝে, তার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে বিচার করে শিক্ষাধারা গড়ে তোলবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন প্রথম পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদগণ। মধ্যযুগে প্রবল রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যলিপ্সু অভিযানের পরিণতি দেখে ইউরোপের মননশীল ব্যক্তিগণ পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। প্রকৃত মনুষ্যত্বের দ্বারাই এই ভোগবাদী সভ্যতার প্রভাব রোধ করা যাবে বলে তাঁদের ধারণা হলো। মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথ সাধনা-সাপেক্ষ, শৈশব হতেই সেই সাধনা সুরু না হলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। তাই তাঁরা সুরু করলেন শিশুকে নিয়ে। তাঁরা মনে করেছিলেন যে মানুষ জন্ম হতেই অপরাধপ্রবণ। কেননা, দেখা যায় যে ক্ষুধার পরিতৃপ্তি না হলে শিশু ক্রোধ প্রকাশ করে, স্নেহের অংশীদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, আরামের ব্যতিক্রম হলে বিরক্তিবোধ করে। এই স্বভাবতঃই দুষ্ট প্রকৃতির, অসামাজিক শিশুকে কঠোর শাসনের দ্বারা সংশোধিত করাই হলো মধ্যযুগীয় শিশুশিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য। যখন এই কঠোর, নিরানন্দময় শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল তখন সেই সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খল হতে শিশুকে মুক্তি দিলেন রুশো। তিনি বললেন যে শিশু স্বভাবতঃই নির্ম্মল, নিষ্পাপ ও সুকুমারমতি—দেবদূতের ন্যায় পবিত্র। কলুষিত মনুষ্যসমাজের বিষাক্ত সংস্পর্শে জীবনোন্মেষের ফলে সে তার দেহ ও মনের পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে। শিশুকে এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা করতে হলে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করাই হবে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। জীবনের আরম্ভকালে মানুষের হৃদয়বৃত্তিসকল ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, কৃত্রিম শিক্ষার দ্বারা তাদের অকালবোধন হলে শক্তির অপব্যয় হয়, মন দুর্ব্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তাই যে উপায়ে শিশুর হৃদয়বৃত্তিসকল পুষ্ট হতে পারে, সেই উপায়ের সাহায্যেই তাকে মানুষ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন রুশো। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে তার পূর্ণ পরিকল্পনা আছে তাঁর "এমিল" (Emile) রচনাতে। শিশুদের জন্য তাঁর কি আকুল আবেদন, "শিশুকে উৎসাহ দাও, তাকে দয়া কর। শিশুর প্রতি মমতা রাখ, তার খেলাধূলাকে অবজ্ঞা করো না,

তার আনন্দ, তার সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে স্বীকার কর। হে বয়োবৃদ্ধ! শিশুর প্রতি ইহা তোমার একটি বিশেষ কর্ত্তব্য।" (২)

শিশুর প্রতি মমতায় তাঁর হৃদয়ে কি ব্যাকুলতা—"যে শিক্ষা বর্ত্তমান বাস্তবকে এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কাছে বলি দেয়, যে পদ্ধতিতে শিশু সর্ব্ব প্রকার বন্ধনে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, কোন্ সুদূরপরাহত সুখের আশায় প্রস্তুত হতে গিয়ে তার বর্ত্তমান জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সেই নিষ্ঠুর শিক্ষার প্রয়োজন কি? কোন্ এক অনাগত দিনে সে সুখী হবে এই আশায় তার বর্ত্তমান দিনগুলিকে শিক্ষার কঠিন পীড়নে দুঃখময় করে তোলা এ কতদূর ভ্রান্ত দূরদৃষ্টি! কর্তৃত্বে নয় কিন্তু স্বাধীনতা দানেই আসবে মহত্তম কল্যাণ।" এই হলো রুশোর বাণী।

শিক্ষাকে শিশুস্বভাবোপযোগী করে জাতিগঠন কার্য্যে সফল করতে হলে যে জন্মমুহূর্ত্ত হতেই শিশুর শরীর ও মনের বিকাশধারাকে নিয়মিতরূপে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে এ সম্বন্ধে আমরা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাই পেষ্টালট্‌সির বিখ্যাত গ্রন্থে, দি জর্ণাল অফ এ ফাদার (The Journal of a Father)। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে শিক্ষাজগতে এক বিপ্লবের সূচনা হয়। শিশুমনস্তত্ত্বের নির্ভুল জ্ঞানের উপর ভিত্তি স্থাপন না করলে শিশু-শিক্ষাপদ্ধতি যে কোনমতেই সফল হতে পারে না একথা প্রথম বলেছেন, পেষ্টালট্‌সি। শিশুর মন একটি বর্দ্ধিষ্ণু চারাগাছের মত—কেবল একটি জড় আধার মাত্র নয়। তার মন নিয়ত বিকশিত হচ্ছে ও প্রসার লাভ করছে, এই কথা মনে রেখে শিশুশিক্ষার কাজে অগ্রসর হতে হবে। প্রত্যেক শিশুর মনটিকে সম্পূর্ণরূপে জেনে নেওয়া চাই, তবেই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। পেষ্টালট্‌সি এক জায়গায় বলেছেন যে, "সমস্ত সত্য ও কার্য্যকরী শিক্ষা শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যেই সার্থক করে তোলা উচিত।" (৩)

পেষ্টালট্‌সির উত্তরসাধক হলেন ফ্রোবেল। বহুদিন গভীরভাবে শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ করে তিনি উপলব্ধি করেন যে শৈশব হলো মূলতঃ খেলাধূলার সময়। বাল্যাবস্থায় শিশুর কর্ম্ম খেলাধূলার রূপ গ্রহণ করে তাকে সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। অন্তরকে বাইরে মেলে দিয়ে শিশু পায় অপার আনন্দ, আবার

---

(২) "Encourage childhood ; O men be humane ! It is your foremost duty, love childhood, encourage its sports, its pleasures, its amiable instincts." Rousseau Vol. II—John Morely.

(৩) "All true and educative instruction must be drawn out of the pupils themselves." Essays on the Child and His Education.—Pestalozzi by Corrie Gordon.

বাস্তবকে অন্তরে গ্রহণ করে হয় তার আত্মোপলব্ধি। সেই জন্য ফ্রোবেল বলেছেন যে খেলাধূলাকেই কেন্দ্র করে শিশুর শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, "এতেই আসবে আনন্দ, মুক্তি, তৃপ্তি ও পরিপূর্ণ শান্তি।" (৪)

ফুল যেমন বাগানে ফোটে তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশধারার নিয়মে, তেমনি শিশু তার নিজস্ব বংশগতিক শক্তি প্রকাশ করবে আপনার স্বাভাবিক পরিবেশে, স্বাভাবিক নিয়মে। জোর করে ফোটাতে গেলে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। শিশু-প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে গুরু কোনমতেই শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবেন না, এই হলো ফ্রোবেলের অমোঘ শিক্ষা।

মধ্যযুগে শিশুর মন সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। শিক্ষাবিদগণ শিশুর মনটিকে একটি নিষ্ক্রিয় ও শূন্য আধার বলে মনে করতেন। তাঁরা প্রথম থেকেই ধরে নিতেন যে শিশু একেবারেই নিঃস্ব। তার নিজের ঘরে পৈতৃক মূলধন যেন কাণাকড়িও নাই—যা কিছু শিক্ষা তার হবে তা সবই বাইরে থেকে নিতে হবে। ফলে দেখা গেল যে এরূপ শিক্ষায় শিশুর মন থেকে যাচ্ছে অসম্পূর্ণ, কেবল গুরুকে অনুকরণ করে সে ক্রমশঃ নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। তখন শিক্ষাবিদগণ চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে আর এক নূতন পথ অবলম্বন করলেন। এইবারে তাঁরা বললেন যে শিশুর মনটি নরম মাটির মত, গুরু তাকে নিজের আদর্শে গড়ে তুলবেন। এতেও দেখা গেল যে আদর্শের একটা পৃথিবীজোড়া মাপ নাই, আর সব ছেলের শক্তিও সমান নয়, সব ছেলেই সব কিছু পারে না, কাজেই এ শিক্ষাপদ্ধতি মতেও বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেল না। অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাঁরা বুঝলেন যে শিশুর মন জীবন্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু চারাগাছের ন্যায়, তার প্রকৃতি অনুযায়ী গুরু তাকে লালন করবেন, যত্ন করবেন, প্রয়োজন-বোধে শাসনও করবেন এবং তাকে স্বাভাবিক গতিপথে চালনা করে নিজ বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করবেন। এই নূতন ধরনের শিক্ষা দিতে হলে শিশু-মনের উপাদান ও প্রক্রিয়াগুলি কি এবং কি ভাবে তারা বিকশিত হয়ে সার্থক হয়—এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা একান্তই প্রয়োজন। তাই এই সময় থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্থান আর গৌণ রইলো না—সে আর শিক্ষা গ্রহণের আধার মাত্র নয়, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে শিক্ষার সকল সার্থকতা।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে টিয়েডম্যান (Tiedmann) শিশুদের মানসিক শক্তি কিভাবে বিকশিত হয় সে সম্বন্ধে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

(৪) "Play begets joy, freedom, contentment, repose within and without." Education of Man.—Froebel.

(৫) এই গ্রন্থে তিনি ধারাবাহিকরূপে একটি শিশুর জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করে শিশুমনস্তত্ত্বের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করলেন। তারপরে আরও নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশুর জীবনগাথা লেখেন প্রেয়ার (Preyer) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। প্রেয়ার ৪০ মাস ধরে তাঁর নিজের সন্তানের শরীর ও মনের বিকাশগতি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে মানবজীবনকে প্রেয়ার কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন যথা (ক) ভ্রূণাবস্থা (খ) শৈশব (গ) বাল্য (ঘ) কৈশোর (ঙ) যৌবন (চ) প্রৌঢ়ত্ব (ছ) বার্দ্ধক্য। পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের সার্থক মিলন মুহূর্ত্ত হতে শিশুর জন্মকাল পর্য্যন্ত যে সময়, সেই সময়টি হলো ভ্রূণাবস্থা। এই সময়ে শিশুর দেহ গঠনে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মৃত্যু পর্য্যন্ত আর কখনও সেইরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটে না। দেখা গেছে শৈশবে, অর্থাৎ জন্মমুহূর্ত্ত হতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর শরীর ও মনের বৃদ্ধি যে হারে হয়ে থাকে কৈশোরে ও যৌবনে এই বৃদ্ধির হার ঠিক সেই তালে চলে না। জীবনের প্রারম্ভে দেহ ও মনের বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হয়ে থাকে তারপর জীবনবিকাশের এই গতি ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মানবজীবনের শৈশবকাল অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে শরীর অতি সহজেই চির-কালের মত পঙ্গু হয়ে যেতে পারে কিংবা অবাঞ্ছনীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতায় শিশুর সুকুমার মনটি জটিল সমস্যাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। পূর্ণবয়স্ক মানবের চিন্তা, ধারণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তার আচরণের স্বাভাবিকতা কি অস্বাভাবিকতা, সমাজ ও কর্ম্মজীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা সবেরই বীজ নিহিত আছে শিশুমনের কোমল মৃত্তিকার ভিতরে। তাই প্রেয়ার বলেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে শিশুদের রক্ষা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইন জীববিদ্যা ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রগাঢ় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তার ফলে পাশ্চাত্যজগতে শিক্ষার আর একটি নূতন পর্য্যায় সুরু হয়। রুশো, পেষ্টালট্সি, ফ্রোবেল প্রভৃতি মনীষিগণ শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রকাশ করে গেছেন সেগুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞানের অঙ্কুরমাত্র দেখা যায়। ডারউইনের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পরে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের মধ্যে এক সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করেছেন। এই শিক্ষাবিদগণের মধ্যে ম্যাদাম মন্তেসরী ও জন ডিউয়ির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

(৫) The Development of the Mertal Faculties of Children. Tiedmann.

শিশুকে নিয়েই নূতন মানব-সমাজ রচনা করবার কল্পনা ছিল মন্তেসরীর। সঙ্কীর্ণ অর্থে আমরা যাকে শিক্ষা বলি, সেই শিক্ষা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় পূর্ণ বিকশিত হয়ে শিশু আপনার সুষমায় জগতকে মুগ্ধ করবে। শিশুর অন্তস্থলে যে সম্ভাবনা সকল সুপ্ত হয়ে আছে সেগুলিকে তিনি তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের সেই পথই দেখিয়েছে। ম্যাদাম মন্তেসরী ইতালীতে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মূক, বধির ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের এক প্রতিষ্ঠানে সহকারী চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। এই শিশুদের অবস্থা দেখে শিশুর মানসিক স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এই সব শিশু কিরূপে সংসারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, কি উপায়ে তাদের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হবে এই চিন্তাতেই ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠলো মন্তেসরী পদ্ধতি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ হতে ম্যাদাম মন্তেসরী স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুমনস্তত্বের উপরে যে সকল রচনা বা আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, ম্যাদাম মন্তেসরী সেগুলি সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সকল শিশু তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসতো তাদের হাব-ভাবও তিনি পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এই সকল গবেষণার ফলে তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি রূপায়িত করে তুললেন তার মূল কথা হলো যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অভাবে শিশুর সুকুমার মনটি জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে। পূর্ণবয়স্ক মানব নিজের ধ্যান ধারণা অনুসারে শিশুকে গড়তে চায় কিন্তু সত্য করে শিশু নিজে যা শেখে তাই হয় তার আসল শেখা, গুরুর কাজ হলো অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। শিক্ষাসম্ভাবনায় পূর্ণ পরিবেশে শিশু শিখবে তার নিজের প্রাণধর্ম্মের তাগিদে, এই হলো মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

কার্য্যতঃ ম্যাদাম মন্তেসরী তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনটি সুস্পষ্টভাবে ভাগ করলেন—(১) ব্যবহারিক জীবনের অনুশীলন (২) ইন্দ্রিয়বোধ চর্চ্চার দ্বারা শিক্ষার অনুশীলন (৩) শিক্ষামূলক সরঞ্জামের সাহায্যে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষাব্রতীকে শিশুমনস্তত্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে, কেননা শিশু-শিক্ষালয় হলো একটি গবেষণাগার—এখানে শিশুর দেহ ও মন নিয়ে চলবে গবেষণা, তার আচরণ লক্ষ্য করে, তার প্রয়োজন মত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার ভার শিক্ষকের।

ম্যাদাম মন্তেসরী তাঁর বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রচলনের দ্বারা শিক্ষাজগতের একটি অজানা রাজ্য জয় করেছেন। অভিভাবকের সহযোগিতায় শিশুপ্রকৃতির সম্যক অনুধাবন এবং আনন্দময় ও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করাই মন্তেসরী পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য বলে ধরা যেতে পারে।

যে শিক্ষাদর্শনের উপরে নির্ভর করে পাশ্চাত্যজগতে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে রূপায়িত হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠাতা হলেন জন ডিউয়ি। ডিউয়ির দার্শনিক মতবাদকে প্রয়োগবাদ (Pragmatism), নিরীক্ষাবাদ (Experi- mentalism), মানবধর্মী স্বভাববাদ (Humanistic Naturalism) প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা হয়েছে। ডিউয়ি স্বয়ং এর যে ভাষ্য রচনা করেছেন তাতে বলা যায় যে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত মানুষের বহু লব্ধ অভিজ্ঞতার উপরে, কেননা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যেই সে তার আচরণ ও জ্ঞানের নিশ্চিত ও চরম আদর্শের সন্ধান পায়। তাঁর মতে জড় ও জীবন, জীবন ও মন এবং মন ও সমাজের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে। জড়, জীবন, মন ও সমাজের মধ্যে এই যোগসূত্রের স্বাভাবিক সঙ্গতি রক্ষা করাকেই ডিউয়ি পূর্ণ শিক্ষা বলে মনে করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডিউয়ি রচিত "সাইকলজি" (Psychology) পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। তিনি প্রতিপন্ন করলেন যে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানেরই একটি শাখা এবং তখন থেকেই দর্শনশাস্ত্র হতে মনস্তত্ত্বকে পৃথক করে মনোবিজ্ঞান নামক একটি বিশিষ্ট বিভাগের সৃষ্টি করা হলো। শিক্ষামনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণাকে ডিউয়ি সুস্পষ্ট রূপদান করেন শিকাগোতে এসে। যে গবেষণামূলক বিদ্যালয় (Experimental School) শিকাগোতে সুবিখ্যাত হয়েছিল সেটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডিউয়ি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে এমন দুঃসাহসী এবং গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আর কখনও হয়নি। বাস্তব প্রয়োগের সাহায্যে শিক্ষালাভ সম্বন্ধে তাঁর যে বলিষ্ঠ মতবাদ ছিল তা তিনি কার্য্যতঃ প্রমাণ করলেন এইখানে।

ডিউয়ি বলেছেন দর্শন গতিশীল—স্থিতিশীল নয়। দর্শনের ইঙ্গিত, দর্শনের যুক্তি, দর্শনের বিচার—সব কিছুই প্রমাণিত হবে মানুষের জীবনে। যতদিন দর্শনশাস্ত্র কেবলমাত্র বিদ্বজ্জনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণের সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার যোগই বা কি, প্রভাবই বা কোথায়? যে কোন যুগের দর্শন হলো সেই সময়ের সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ সমস্যার প্রতিচ্ছবি। সমাজের নিতান্ত

বাস্তব প্রয়োজনেই এর উদ্ভব, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়ে থাকে। সমাজ-জীবনে যখন ব্যাপকভাবে কোন সমস্যা দেখা দেয়, যখন বিভিন্ন স্বার্থ ও চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, যখন এই পীড়াদায়ক অনিশ্চয়তার কোন সমাধান হয় না, কেবলমাত্র তখনই দর্শনের ক্রমপ্রকাশ এবং নূতনরূপে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কাজেই দর্শনের মূল্য মানব-সমাজের প্রয়োজনমূল্যের নামান্তর মাত্র। ডিউয়ি দর্শনকে জীবনের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে তাকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন। দর্শনকে জীবন ও সমাজের যোগে বিচার করলে শিক্ষার সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, কেননা শিক্ষা মানবজীবনের একটি বৃহৎ ও প্রবল সামাজিক প্রচেষ্টা। যে কর্ম্মৈষণার দ্বারা মানুষের সমাজগত ও ব্যক্তিগত জীবন সার্থক হয়ে ওঠে, যে প্রচেষ্টার দ্বারা জীবনের বিভিন্ন মূল্য পরিবর্ত্তিত হয়ে ক্রমে তার পূর্ণ মূল্য নির্ণীত হয়, সেই প্রচেষ্টামূলক কর্ম্মধারাই হলো প্রকৃত শিক্ষা। সামাজিক পটভূমিকায় শিক্ষার অর্থ বিচার করতে গেলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে শিক্ষা জীবনদর্শনের সক্রিয় রূপ, কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা, মানুষের প্রচেষ্টা মানবজীবনের অপর সকল দিকের ন্যায় তার প্রয়োজনের দ্বারাই নিয়মিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও দর্শন—এ দুটির সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে আলোচনাকালে ডিউয়ি শিক্ষার ব্যাপক অর্থে দর্শনকে শিক্ষার তত্ত্ব হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ যখন কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন খোঁজে, তখন দর্শনের নির্দ্দিষ্ট পথে সে বুঝতে পারে কোনটি বাঞ্ছিত, কোনটি অবাঞ্ছিত, কি প্রয়োজন আর কি বা নিষ্প্রয়োজন, কোন দিকে মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়া উচিত আর জীবনে কি নির্ম্মূল্য হয়ে গেছে অর্থাৎ জীবনে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য কি তারই যুক্তিগুলি দর্শন দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এখানেই তার কাজ শেষ, তারপরে সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে বাস্তবরূপ দান করা হলো শিক্ষার দায়িত্ব। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন না ঘটলে সমাজের অন্তঃপীড়া দূর হয় না এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তত হয় কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারা।

এই সময়ে তিনি "দি স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি" (The School and Society) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শিক্ষার সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এমন মূল্যবান পুস্তক খুব কমই লেখা হয়েছে। গবেষণামূলক বিদ্যালয়ে তিনি যে সকল মতবাদ নিরীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন, শিক্ষা সম্বন্ধে যে উন্নত প্রণালী তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই সকলের আলোচনা আছে এই গ্রন্থটিতে। এই সকল প্রণালী ও গবেষণাদি সম্পর্কে আরও গভীর ও ব্যাপক আলোচনা

আছে "হাউ উই থিঙ্ক" (How We Think) এবং "ডিমোক্রেসি অ্যাণ্ড এডুকেশন" (Democracy and Education) পুস্তক দুটির মধ্যে। এই দুটি পুস্তকে ডিউয়ি শিশুর প্রয়োজন ও আচরণ সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ গবেষণামূলক বর্ণনা দিয়েছেন সে সকল অনুশীলন করে সমস্ত পাশ্চাত্যদেশ শিশুশিক্ষাকে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্য আজ ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

ডিউয়ি বলেন যে, মানুষের শিক্ষা দুটি ধারায় চলে। একটি ধারা অলক্ষ্যে থেকে শিশুমনের মধ্যে কাজ করে, অর্থাৎ শিশুর তরুণ মন নিজের ও অন্যের অজ্ঞাতসারে বহু ধারণা গ্রহণ করে থাকে। অপর ধারাটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এটি হলো বিদ্যায়তনের শিক্ষা—এখানে বিবিধ শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে শিশু-মনটিকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা চলতে থাকে। এই প্রত্যক্ষ ধারাটি যত বেশী প্রয়োগ করা হচ্ছে, তত বেশী অলক্ষ্য শিক্ষা দূরে চলে যাছে। প্রত্যক্ষ শিক্ষা নিজের পদ্ধতি, পরিমাপ, কর্ম্মসূচী, রুটিন ইত্যাদি নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে শিক্ষার উৎস যে জীবন, সেই জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিপদের বীজ এখানেই সঞ্চিত হচ্ছে বলে ডিউয়ির আশঙ্কা। পদ্ধতি, পরিমাপের জন্য তো শিক্ষা নয়, সমগ্র জীবনকে—যা আছে, যা চাই—এই সমস্তকে জীবনে সত্য করে তুলতে প্রয়োজন পদ্ধতি ও পরিমাপ। তাই তিনি বলেন দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হতেই শিশুশিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠবে। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে সহজ আনন্দের সঙ্গে কাজ করবে শিশুর দল, যেহেতু শিক্ষায়তনগুলি মুখ্যতঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিধি-নিষেধের বেড়াজালে তাদের সজীব মনকে বেঁধে ফেলা নিতান্তই ভুল। শিক্ষাকে কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি না বলে বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের একটি বিশেষ উপায় বলাই ভালো। শিক্ষাকে জীবন প্রবাহ থেকে অবিচ্ছিন্নরূপে দেখাই হলো আধুনিক শিক্ষার মূল কথা। শিশুকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আপনার চিত্তের গতি অনুসারে অগ্রসর হতে দিতে হবে—কেবল এই চলার পথে চাই গুরুর নির্দ্দেশ। কিন্তু শিশুচিত্তের উপরে অধিকার না জন্মালে কেউ এই নির্দ্দেশ দেওয়ার দাবী করতে পারে না এবং এইজন্যই ডিউয়ি বলেছেন শিশুর শরীর ও মনের বিকাশধারা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে হবে প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে।

পশ্চাত্যজগতে যখন শিক্ষার উন্নতিকল্পে নানা গবেষণা চলছে, ভারতের তখন মহা দুর্দ্দিন। ইংরাজের আসন তখন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন তারা করলো এদেশে, তার মধ্যে আর যাই থাক মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে জাগাবার কোন আহ্বান ছিল

না। এই গভীর সত্যকে যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। কবি জানতেন যে, জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে তার শিক্ষার উপর। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী চলছিল এক সর্ব্বনাশের পথ ধরে, তাতে না ছিল জীবনাদর্শের উপযোগী শিক্ষা, না ছিল বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ হয়তো এই শিক্ষার দ্বারা কিছু কিছু পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য যে মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নি।

প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে যে শিক্ষালাভ হয়, এমন একটি সুন্দর শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশে এই শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্র কোথাও ছিল না। বিদ্যালয় বলে যা ছিল তা হলো, "চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্ম্মম বিভীষিকা।" দেশের জীবনাদর্শের সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। এমন বিজাতীয় শিক্ষার দ্বারা আর যাই হোক মানবশিশুর শিক্ষা যে সম্পূর্ণ হতে পারে না, একথা কবির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সারা দেশ জুড়ে অন্তরে বাইরে মানুষের শোচনীয় দীনতা দেখে দেশকে সচেতন করে তোলবার ব্রত গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রচলিত পথের বাইরে, প্রচলিত রীতির বাইরে তিনি সুরু করলেন শিক্ষা সম্পর্কে এক দীর্ঘ সাধনা। এই সাধনার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিশ্বভারতীতে—এই সাধনার সুরু হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। তিনি ভারতের সাধনা ও আদর্শের প্রচার করতে লাগলেন কেবল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তাঁর কর্ম্মের মধ্য দিয়েও। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কর্ম্মের পরিপূর্ণ রূপ হলো তাঁর শান্তিনিকেতন। তিনি বলেছেন, "এখানে আমি যে শিশুদের ক্লাশ করেছি সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উষারুণ দীপ্তি, যে নবোদ্গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস, না হলে আইনকানুন সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হতো। এই সব বাইরের কাজ গৌণ, কিন্তু লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে, গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা।" (৬)

কবির রচনা পাঠ করলে দেখা যায় যে তাঁর বিরাট সাহিত্যের মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ শিক্ষাদর্শন ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়,

(৬) রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ—২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮—প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।

তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত। তিনি বলেছেন, "যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাদের মন যথেষ্ট বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন-পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।" (৭)

নিজস্ব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সুসঙ্গত ও সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটবার পূর্ব্বেই পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা শিশুমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, এমনতর বৈষম্য লক্ষ্য করে কবি বললেন, "হে দেবগণ, আমার কাণ দিয়া যেন ভাল করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি। হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি।" (৮)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা হলো আনন্দ—আশ্রমের গুরু শিষ্যের সম্পর্ক হবে আনন্দের, ছাত্রদের মধ্যে গড়ে উঠবে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, প্রকৃতি ও শিশুর মধ্যে হবে অচ্ছেদ্য সাহচর্য্যের বন্ধন। এই তিনের সম্মিলনে জ্ঞানে, কর্ম্মে ও প্রেমে শিশুর মন সৃজনশীল হয়ে উঠবে। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা এর চেয়ে সহজ ভাষায় আর কি হতে পারে? এই সৃজনশীলতা কেবল আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না—মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ আশ্রমের সীমা ছাড়িয়ে প্রসারিত হবে পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে। কবি ইচ্ছা করেছিলেন বিশ্বভারতীর সাধনা দেশের জীবনধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হবে। তাই শান্তিনিকেতনে যেমন প্রতিষ্ঠিত হলো বিশ্বভারতীর সংস্কৃতিকেন্দ্র, তেমনই শ্রীনিকেতনে স্থাপিত হলো তার পল্লীসেবা বিভাগ। "প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে।" সেই নিষ্ফলতা হতে ছেলেদের রক্ষা করবার জন্য কবি চেয়েছিলেন যে আশ্রমের ছেলেরা গ্রামের লোকদের জানবে, পরিচিত হবে তাদের সঙ্গে, যুক্ত হবে আত্মীয়তার সম্বন্ধে।

শিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌছাতে হলে চাই সংযম—শিক্ষার পথে পদে পদে যাতে বাধা না আসে তার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। ব্রহ্মচর্য্য বলতে আমরা কৃচ্ছ্রসাধন বলে মনে করি —এর সঙ্গে আনন্দের যোগ কোথায়? কবির শিক্ষাদর্শনের মধ্যে কখন কখন এই স্ববিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায় বলে অনেকে সমালোচনা করেছেন।

---

(৭) শিক্ষার হেরফের।
(৮) জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা।

এ সম্বন্ধে কবি যা বলেছেন তাতে দেখা যায় যে তাঁর আদর্শে ব্রহ্মচর্য্য অহেতুক কঠোর অর্থহীন সংস্কার পূজামাত্র নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ একটি সুসংহত চিন্তাধারার উপরে সুতিপ্রষ্ঠিত। "ব্রহ্মচর্য্য পালন বলতে যে কৃচ্ছ্রসাধনা বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে, তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে, ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিমতা হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই অনাবশ্যক। প্রকৃতির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থরূপে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের বনাঙ্কুরিত নির্ম্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।" (৯)

ইউরোপীয় শিক্ষাবিদগণ যে নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও আত্মশাসনের কথা বলেছেন, সেই আত্মশাসনকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ব্রহ্মচর্য্য। শাসন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ফ্রোবেলের মত হলো, "নিয়মনিষ্ঠার প্রেরণা অন্তর থেকেই আসা উচিত, বাইরে থেকে তা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।" (১০) এইরূপ আত্মশাসনমূলক শিক্ষার জন্য একটি যোগ্য পরিবেশের প্রয়োজন, একথাও বলেছেন ফ্রোবেল। রবীন্দ্রনাথও আত্মশাসন সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাতে দেখি যে পীড়ন, শাসন, দমনের দ্বারা তিনি শিশুকে সংযত করতে চান নি। সৌন্দর্য্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তপোবনের আদর্শকে গ্রহণ করেন শিক্ষার যোগ্য পরিবেশরূপে। প্রকৃতির মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, যে বিস্তার ও নিয়ম আছে সে সকল শিশুর মনের উপর অহরহ কাজ করলে শিশু আপনা হতেই সর্ব্ব প্রকারে বাধামুক্ত হবে এই ছিল কবির বিশ্বাস।

---

(৯) শিক্ষাসমস্যা—রবীন্দ্রনাথ।

(১০) "The sense of discipline must come from within and not from without." Education of Man—Froebel

শিশুশিক্ষার পরিকল্পনাতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মত অতি সুস্পষ্ট। কোনমতে শিষ্যের মনের উপর কিছু জ্ঞান চেপে বসিয়ে দিতে পারলে গুরুর কাজ শেষ হয়ে গেল এ যেন তিনি মনে না করেন। স্রষ্টা যেমন তাঁর সৃষ্টিকে দেখেন প্রাণের নিবিড় একাত্মবোধে, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহরস সিঞ্চন করে, তেমনি গুরুর স্নেহ ও যত্নে পালিত ও বর্দ্ধিত হবে শিষ্য। এই স্নেহ যেখানে নেই, এই মিলন যেখানে ঘটেনি, শিক্ষা সেখানে ব্যাহত, দৈন্যজর্জ্জর।

"একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছিলাম, বাগানের কাজ ছিল তাঁর শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন যে, আমি ভালবাসি গাছ পালা। তরুলতায় সেই ভালবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফুলে জাগে সেই ভালবাসার প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালির সম্পর্কে একথা সত্য।" (১৩) অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় নবীন হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে গুরু আপনার সাধনার দ্বারা পরিণতির পথে চালনা করবেন এই হলো কবির নির্দ্দেশ।

যে সকল মহাপুরুষ লোকশিক্ষার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে নূতন জীবনে দীক্ষা দিয়েছেন, গান্ধীজী তাঁহাদের অন্যতম। জাতীয় শিক্ষা কি রূপ গ্রহণ করলে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে সেই শিক্ষা উপযুক্ত হবে এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন মহাত্মাজী। জীবনে যে সকল বিষয় সত্য বলে তিনি অনুভব করেছিলেন, আজীবন সেগুলিকে অনুষ্ঠানের দ্বারা পূর্ণ ও প্রতিপন্ন করে তিনি প্রমাণ করে গেছেন যে তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। শিক্ষার লক্ষ্য হলো জীবন গঠন, কেবলমাত্র জ্ঞানার্জ্জন বা বিদ্যা আহরণ নয়। এই সত্যকে স্বীকার করে তিনি শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর হতে বাইরে এনে মনুষ্যত্বের উন্মুক্ত পথে পরিচালিত করেছিলেন। শিক্ষার স্থান সমস্ত সমাজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নয় এবং শিক্ষার কাল জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনে, কেবলমাত্র বাল্য ও কৈশোরের নির্দিষ্ট কয়েকটা বৎসরের মধ্যে নয়। এই ছিল গান্ধীজির সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত।

যে শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে গান্ধীজী সকল মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য, সাম্য ও স্বাধীনতার পরিণত রূপটি দেখতে চেয়েছিলেন, তিনি জানতেন যে তার বীজ বপন করতে হবে অতি শৈশবে। এই জন্যই তিনি বহু চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পরে বলেছিলেন, "এতদিন আমরা সুরক্ষিত উপসাগরে ছিলাম, আমাদের কাজের সীমাও সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ ছিল। আজ আমরা নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে

(১১) আশ্রমের শিক্ষা।

খোলা সমুদ্রে এসে পড়লাম। এখন থেকে আমাদের কাজ মাত্র ৭ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। "নঈ তালিম" বা নূতন শিক্ষাপদ্ধতিকে জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ের জনগণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা রূপে প্রচলিত করতে হবে।"

দূরদর্শী মহাত্মা গান্ধী জানতেন যে শিশুশিক্ষাকে অপাংক্তেয় রেখে, প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রসর হতে পারে না, এবং প্রাথমিক শিক্ষা পঙ্গু হয়ে থাকলে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাকে সফল করার প্রচেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। অনাগত মানব জীবনের সমস্ত পরিণতির মূল আছে জীবনের প্রথম পাঁচটি বৎসরের মধ্যে একথা তো আজ তুচ্ছ করলে চলবে না, কাজেই এই অমূল্য সময়টির ব্যবহার যত সুষ্ঠুভাবে করা যায় ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল। প্রতি দিনের জীবনযাপনের মধ্যে শিশুর সংবেদনশীল মনটি থাকবে উন্মুক্ত, ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা শিশুর শরীর ও মন বিকশিত হয়ে নূতন মসাজের যোগ্য হয়ে উঠবে, এই ছিল গান্ধীজীর শিক্ষামত।

যে নূতন সমাজ গান্ধীজী গড়তে চেয়েছিলেন তার পরিকল্পনা যেমন ব্যাপক, তেমনই সর্ব্বাঙ্গীন। তিনি বলেছেন যে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মানুষ তার সর্ব্ববিধ কাজ নিজেই সমাধা করবে তার নিজস্ব পরিবেশ থেকেই। পরিবেশ ও কর্ম্ম হতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে তার থেকেই আসবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। "নঈ তালিমের" প্রবর্ত্তনায় ঘরে ঘরে হবে শিক্ষার চর্চ্চা, জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন—সামর্থ্যের হিসাব মত সমান যত্নে মানুষ নিজেই সে সকল উৎপাদন করবে। প্রত্যেক দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হবে। এইরূপ শিক্ষার ফলে সকলের সঙ্গে যে একাত্মবোধ হবে তাতেই আসবে তার বিশ্বানুভূতি এবং এতেই গড়ে উঠবে সর্ব্বোদয় সমাজ।

আধুনিক ভারতের অন্যতম সংগঠনকর্ত্তা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী। দুজনেই ভারতের শিক্ষাধারার সংস্কারকার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার মূলনীতিকে জীবনের মূল থেকেই অনুসরণ করতে হবে, একথা তাঁরা দুজনেই বলে গেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—যে দিকের শিক্ষাধারাই আলোচনা করা যাক না কেন, আমরা আজ বেশ সুস্পষ্ট-ভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষাদর্শন মানবজীবন ও সমাজের সহিত জড়িত হয়ে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে শিক্ষাকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবার নিতান্তই প্রয়োজন ঘটেছে। জড়শক্তিকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে বৈজ্ঞানিক ধারায় চলে নানা পরীক্ষা, যখন বাঞ্ছিত কাজে জড় শক্তির প্রয়োগ সত্য হয়ে ওঠে তখন বিজ্ঞান সার্থক হয়। সেইরূপ

শিক্ষাদর্শনের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও চাই নিরীক্ষা ওপরীক্ষা এবং তার সত্যাসত্যের বিচার চলবে শিক্ষার্থীর উপরে। শিক্ষাতত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করা বড় সহজ কথা নয়, এর জন্য চাই পূর্ণবয়স্কের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। যে শিশুকে ঘিরে গড়ে উঠবে গান্ধীজীর সর্ব্বোদয় সমাজ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, ডিউয়ির কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায়তন, সেই শিশুকেই জানতে হবে প্রথমে। শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করে মনোবিজ্ঞানের সূত্র পাওয়া যাবে, আবার সেই সূত্রগুলির প্রয়োগ ফলে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে তারই উপরে গড়ে উঠবে শিশুর শিক্ষা।

শিশুশিক্ষাকে সার্থক করতে হলে তার ভিত্তি হবে মনোবিজ্ঞানের প্রামাণিক সিদ্ধান্তের উপরে একথা অনুভব করেছেন পাশ্চাত্যদেশ অনেকদিন পূর্ব্বে। শিক্ষাবিদগণ যখন দেখলেন যে মনোবিজ্ঞান যতই দর্শন শাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন হয়ে স্বাধীন একটি বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দাবী করতে সুরু করলো, ততই তার পরীক্ষার প্রয়োজন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। যে কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছাবার একমাত্র উপায় হলো পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, কিন্তু মানবমন প্রতক্ষ্যগম্য নয় বলে জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের অনেক পার্থক্য আছে। মানুষের মনকে জানা যায় গৌণভাবে—তারহাবভাবলক্ষ্যকরে, তার কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজের মনটাই প্রত্যক্ষ। তাই মনোবিজ্ঞানের একটি পদ্ধতি হলো নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা—একে বলে অন্তর্দর্শন (Introspection)। শিশুর পক্ষে অন্তর্দৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব, কাজেই তার আচার আচরণ, দৈহিক পরিবর্ত্তন, বাক্য, কার্য্য প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে গৌণভাবেই তার মনকে জানতে চেষ্টা করা হয়। শিশুর জীবনের সমস্ত অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রেখে একটিমাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন করে তার কি ফল (Effect) পাওয়া যায় তা সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করলে শিশু সম্বন্ধে অনেক তথ্যই পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিকে পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experiment) বলা হয়। উদ্দীপক (Stimulus) ইন্দ্রিয়দ্বারে এসে আঘাত করার কতক্ষণ পরে অনুভূতি জন্মে (Reaction time experiment) কতটা কাজে শিশু একসঙ্গে মনঃসংযোগ করতে পারে (Span of attention experiment), পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে শিক্ষার কতটুকু উন্নতি হয় (Improvement of learning by repetition) এই রকম বহু পরীক্ষা মনস্তত্ত্ববিদগণ করেছেন এবং তারই ফলে শিশুর দেহ ও মন সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কি ভাবে মানবজীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ

করা হয়েছে তা প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করলে আমরা এখন শিক্ষাকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত কবতে পারি।

শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্য মনস্তত্ত্ববিদগণ যে যে পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তারই কয়েকটি বিবৃতি নীচে দেওয়া গেল। প্রথম উপায়ে কেবলমাত্র পিতামাতা, অভিভাবক ও ধাত্রীদিগের বিবৃতি শুনেই শিশুমনস্তত্ত্ববিদগণ শিশুর বিভিন্ন আচরণের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করেন। এইভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশধারা সম্পর্কে যেসকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি বৈজ্ঞানিক মতে খুব নির্ভরযোগ্য নয় বটে, কিন্তু বহু প্রচলিত প্রথা ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে ঠাকুরমা, দিদিমা ও ধাত্রীদের মতামতের মধ্যে যে বহু সত্য নিহিত থাকে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অনেক ক্ষেত্রে তরুণী জননী ও কন্যাগণ বয়োবৃদ্ধাদের এই সকল উপদেশবাণী পালন করে উপকার বোধও করে থাকেন কিন্তু শিশুমনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত করতে হলে কেবলমাত্র মা ঠাকুরমার সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করলে চলবে না, কেননা তাঁদের স্নেহ-মুগ্ধ মনে শিশুর সকল কার্য্যকলাপই যে মধুময় একথা তো অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে, মনস্তত্ত্ববিদগণ কয়েকটি শিশুর ক্রমবিকশিত ব্যবহারাদির লক্ষণগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ব্যবহারবাদিগণ (Behaviourist) বলেন যে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় মানবদেহের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনগুলি পর্য্যবেক্ষণ করলে যে তথ্য পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠবে। দৈহিক নানা পরিবর্ত্তন, যেমন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, রক্তের চাপ, দেহের উত্তাপ হচ্ছে মানব আচরণের অভিব্যক্তি। এগুলিকে মাপা যায়, পর্য্যবেক্ষণ করা যায় এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে নানারূপ পরীক্ষা করা যায়। সেইজন্য সুস্থ সাধারণ শিশুদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে ক্রমপর্য্যায়ে সেগুলি লিপিবদ্ধ করলে তাদের শরীর ও মনের বিকাশধারা সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ শিশুবিদগণ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশধারা সম্বন্ধে প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে চিকিৎসক, শিক্ষক, পিতামাতা ও অভিভাবকগণের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের অনুরোধ করেন যেন তাঁরা শিশুদের গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। এর ফলে যে সকল তথ্য নানা ক্ষেত্র হতে সংগৃহীত হয়, সে সকল অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ক্ষেত্রেও প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত হয় না বটে কিন্তু বহু প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত হলে একটি কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবকঠিন নয়।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক পরিবারে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস (Case history) সংগ্রহ করা হয়। এইরূপ জীবনেতিহাস সংগ্রহ করা হয় অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। শিশুর পিতৃ ও মাতৃকুলের ইতিবৃত্ত, তাঁদের সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা ও তার ঘাত প্রতিঘাত, শিশুর জন্মকথা, শরীর ও মনের বিকাশধারার সম্পূর্ণ বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এইভাবে একটি অঞ্চলের বা একটি ছোট গ্রামের যত শিশু দুই এক বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাদের দেহ ও মনের বিকাশধারা পর্য্যবেক্ষণ করে সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। এইরূপ ব্যাপক পরীক্ষা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কিন্তু এইভাবে নানা অগ্রসরশীল দেশে কাজ চলছে এবং পরিণামে অত্যন্ত সুফল পাওয়া গেছে।

পঞ্চমতঃ, শিশু-চিকিৎসক, মনস্তত্ত্ববিদ, খাদ্যবিদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এই সকল তথ্য ও প্রমাণ সিদ্ধ নথিপত্র সংগ্রহ করে শিশুশিক্ষাবিদগণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় তাদের বিবরণী প্রস্তুত করেছেন। এই বিবরণী থেকে বিশেষ করে জানা গেছে যে শিশুর জন্মসম্ভাবনা থেকে যৌবন পর্য্যন্ত তার শরীর ও মনের বিকাশ কি ভাবে হয়ে থাকে, কোন্ অবস্থায় শরীর বিকারগ্রস্ত হয় এবং কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে এই সকলের আশু প্রতিকার করা যেতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণীর ক্রমবিকাশে (Evolution) বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন যে মানুষ যেমন ক্রমবিকাশের ফলে ইতর প্রাণী হতে অবশেষে মানুষে পরিণত হয়েছে তেমনি মনও সামান্য অবস্থা হতে ক্রমে ক্রমে জটিলতর অবস্থালাভ করেছে। সেইজন্য পশুপক্ষীর নানা ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা মানুষের মন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করা যেতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, থর্ণডাইক, কোহলার, এবিংহস, শেরিংটন ও পাভলাভ Thorndike, Köhler, Ebbinghaus, Sherrington, Pavlov) প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সহজাত প্রবৃত্তি ও শিক্ষা প্রণালী (Instinct and learning) সম্পর্কে নানা অমূল্য তথ্য পশুর জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

সপ্তম পদ্ধতি অনুসারে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে (Experimental Methods) শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। এইরূপ পরীক্ষার জন্য এমন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিবেশ রচনা করা হয় (controlled conditions) যেখানে শিশুদের কেবল একটিমাত্র বিশেষ ব্যবহার গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে নিরীক্ষণ করবার সুবিধা পাওয়া যাবে। সচরাচর এইরূপ পরীক্ষা ও গবেষণাকালে, শিশুদের দুই দলে
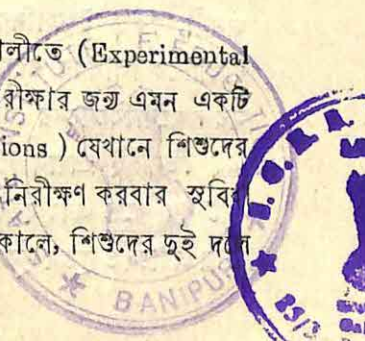
ভাগ করে নিয়ে এক দলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এবং অন্য দলকে বিশেষভাবে পরীক্ষাধীন করা হয় না। পরীক্ষার জন্য শিশুদের নানাভাবে নির্ব্বাচন করা হয়ে থাকে। পরীক্ষক নিয়ন্ত্রণাধীন দল (controlled group) এবং অনিয়ন্ত্রিত দলকে (uncontrolled group) নিরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করে তাদের ব্যবহারগত পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য ইত্যাদি অতি সতর্কতার সহিত লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং পরে তাঁর সংগৃহীত বিবরণী বিশ্লেষণ করে শিশুদের নানাবিধ আচরণ-বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন। এইভাবে শিশুদের পরীক্ষা করা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনই সময়সাপেক্ষ। শিশুর অকৃত্রিম, সহজ, সরল গতিবিধি নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ করা বড় সহজ কথা নয়, অথচ স্বাভাবিক পরিবেশে সুস্থ শিশুর আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত এই সংবাদটি শিক্ষকের জানা না থাকলে শিশুর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা তাঁর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না। এইজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করবার সময়েও শিশুকে তার নিতান্ত পরিচিত ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাধূলার সুযোগ দিতে হয় এবং অতি সঙ্গোপনে ও সন্তর্পণে শিশু-পর্য্যবেক্ষণের কাজে রত হলে তবেই সুফল পাওয়া যায়।

আজ সকল অগ্রসরশীল দেশেই শিক্ষাবিদগণ বুঝেছেন যে শিশুশিক্ষায় শিশু-স্বভাবকে আর উপেক্ষা করলে চলবে না। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা, দেহ ও মনের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং আবেগ অনুভূতির যথাযথ বিকাশের উপরেই নির্ভর করে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন। এই সকল ক্ষমতা যাতে সহজে ও স্বাভাবিক উপায়ে বিকশিত হতে পারে তারই প্রকৃষ্ট সুযোগ তাকে দিতে হবে। তবেই শিশু-জীবনের প্রগতিপথে মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন সুসংহত, সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠবে। শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনাগুলি সুপ্ত হয়ে আছে সে সম্বন্ধে আজ সকলকে অনুশীলন করতে হবে, তারই ফলে তার ক্ষমতা, প্রবণতা ও মেধা অনুযায়ী তাকে জীবনবেদে প্রথম দীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

শিশুর জীবনের প্রাথমিক বিকাশধারা সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী জানেন তার জননী, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে এই গতিছন্দের সম্পূর্ণ ধারাটিকে লিপিবদ্ধ করে রাখা সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শন, বাহ্য পর্য্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্র বিশেষে পরীক্ষণ, এই তিনটিই প্রধান পদ্ধতি। শিশুমনোবিজ্ঞান দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে শেষোক্ত দুটি পথ ধরে এবং যতই এই বিজ্ঞান অগ্রসর হবে ততই অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় এখানেও নূতন নূতন পরীক্ষণের ব্যবস্থা ও উপায় অনুসৃত হবে। এইজন্য

উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজসেবক (Social worker), মনস্তত্ত্ববিদ (Psychologist), মনঃসমীক্ষক (Psychiatrist), চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি অভিজ্ঞ ও কুশলী কর্ম্মীর নিতান্তই প্রয়োজন। শিশুমনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত করতে হলে এদের যেমন যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন, সেই সঙ্গে প্রয়োজন লোক-শিক্ষামূলক প্রচারকার্য্য। শিশুপর্য্যবেক্ষণের জন্য চাই অসীম ধৈর্য্য, অক্লান্ত পরিশ্রম, গভীর নিষ্ঠা ও সত্যসন্ধানী দৃষ্টি। পিতামাতা ও অভিভাবকবর্গকে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। পিতামাতা যদি বুঝতে পারেন যে শিশুর সমস্ত গতিবিধি ও আচার ব্যবহার লক্ষ্য করলে তার শরীর ও মনের সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস বিকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, যদি তাঁরা বুঝতে পারেন যে শিশুর জীবন কতকগুলি স্থির বস্তুর সংগ্রহমাত্র নয়, বরঞ্চ প্রবহমান ঘটনাপরম্পরার মধ্যে তার জীবনের গতি-নির্দ্ধারক শিক্ষা অবিরত অগ্রসর হয়ে চলেছে তবে তাঁরা সহজেই শিশুমনস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষকের কাজে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ ধনবান দেশগুলিতে যে সকল পদ্ধতিতে শিশুপর্য্যবেক্ষণের কাজ আজ চলেছে এবং শিশু-জীবন সম্বন্ধে যে যুগান্তকারী তথ্য পাওয়া গেছে সে সকল অনুধাবন করলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবস্থা হওয়ার হয়তো আশু কোন সম্ভাবনা নাই কিন্তু অন্যান্য অগ্রণী দেশসমূহে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বিরাট আয়োজন করা হচ্ছে, অসীম শ্রদ্ধাভরে ও অপরিসীম ঔৎসুক্য নিয়ে মানুষের ভ্রূণাবস্থা হতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তার দেহ ও মনের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করা হচ্ছে, তার আংশিকভাবেও আমাদের শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করা গেলে মনে হয় শিশুর জন্মগত অধিকার ও দাবী আমরা কিয়দংশে পূর্ণ করতে সমর্থ হবো।

গ্রন্থসূচী :—A. L. Gesell—The First Five Years of Life.

Florence Goodenough & J. E. Anderson—Experimental Child Study.

C. Murchinson—Handbook of Child Psychology.

R. Strang—Introduction to Child Study.

C. Skinner & P. L Harriman—Child Psychology.

Arthur T. Jersild—Child Psychology.

H. G. Good—A History of Western Education.

R. Freeman Butts—A Cultural History of Education.

রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্র রচনাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুর জীবন-সম্পদ
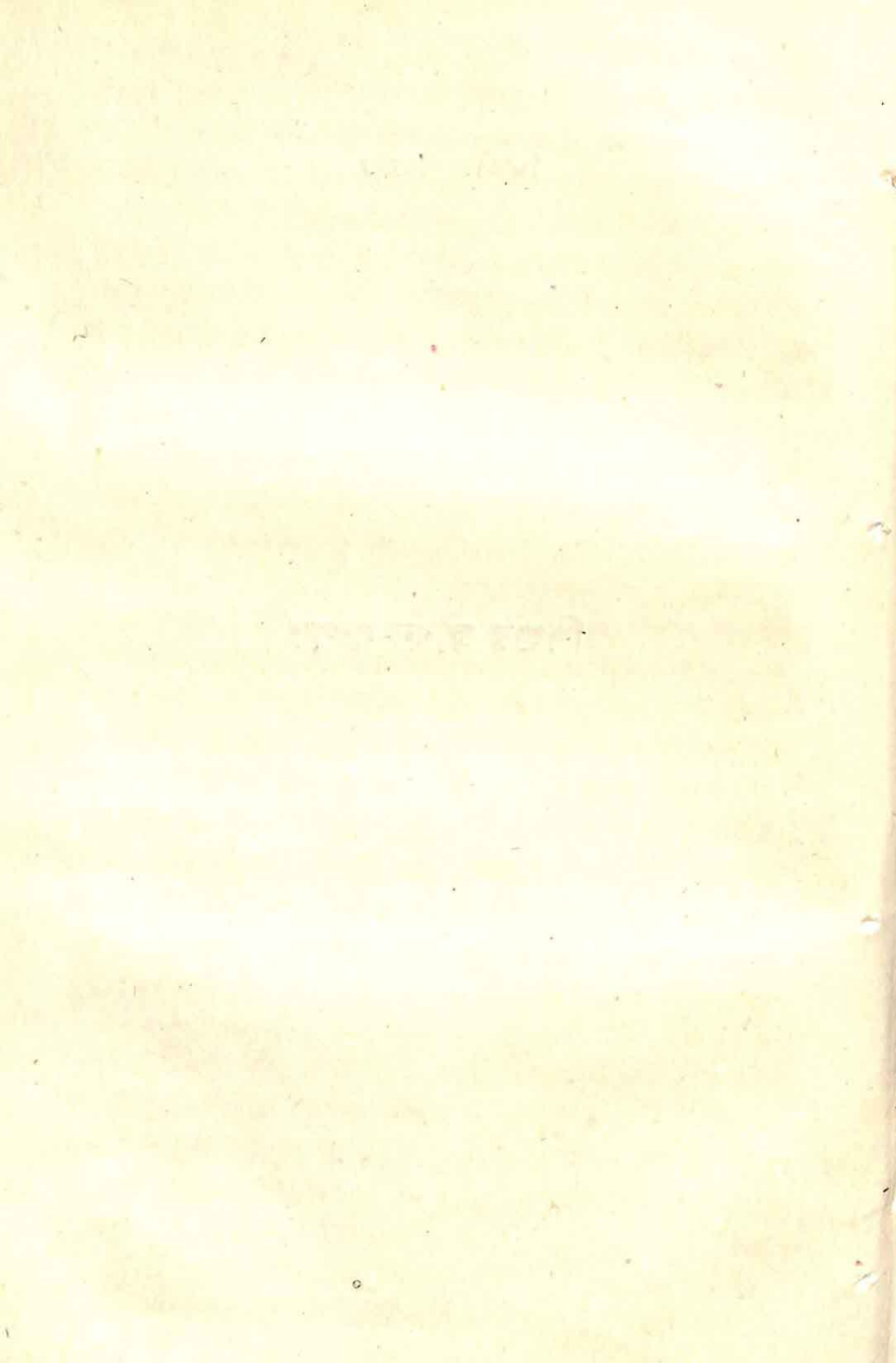
শিশুর জীবন-সম্পদ

বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি পৃথিবীতে এক নূতন জীবনধারা সুরু হয়। এ ধারণা সত্য নয়। যে মুহূর্ত্তে শিশুর জন্ম-সম্ভাবনা হয়ে থাকে সেই পরম ক্ষণটিতেই তার জীবনেরও সমস্ত সম্ভাবনা মূলতঃ নির্দ্ধারিত হয়ে যায় এবং তখন হতেই তার জীবনধারা এক নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে সুরু করে। কাজেই মানবশিশু যে সকল গুণাগুণ ও স্বভাবসম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলির সঙ্গে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের, বিশেষতঃ শিক্ষকের পরিচয় থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কেননা, এই স্বভাব-সম্পদগুলির উপরেই নির্ভর করে তিনি শিশুর শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলবেন। অন্তঃসমীক্ষণের দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক মানব নিজের মনের কোণে যে বাসনা-কামনায় ভরা গোপনবার্ত্তা লুকিয়ে আছে তা কিয়ৎ পরিমাণে নিজেই বুঝতে পারে, এবং প্রয়োজন হলে অন্যকে জানাতেও পারে। কিন্তু শিশুর পক্ষে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়, সেইজন্য তাকে বুঝতে হলে লক্ষ্য করতে হয় তার কথাবার্ত্তা, কার্য্যকলাপ ও তার ব্যবহার। শিশুর বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা মনোবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট কাজ। সুতরাং শিক্ষককে যে শিশুমনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে একথা বলাই বাহুল্য।

শিশুচরিত্র যাঁরা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা সকলেই শিশুদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেন। কোন কোন শিশু স্বভাবতঃই বুদ্ধিমান ও কাজে কর্ম্মে দক্ষ, কোন কোন শিশু শত চেষ্টাতেও ঠিক তেমন সহজে কোন বিষয়ই আয়ত্ত করতে পারে না। এমনও দেখা যায় যে, দুই সহোদর ভাইএর মধ্যে একটির দেহ সুঠাম, সুগঠিত ও গৌরবর্ণ ; অন্যটি শ্যামল, কৃশ ও ক্ষীণকায়। একজন সঙ্গীতানুরাগী ও সুকণ্ঠ, অন্যটি নিতান্তই সুরজ্ঞানহীন। একই পিতামাতার সন্তান তবুও "বনোয়ারীলাল ও ছোট ভাই বংশীলালের মধ্যে কত প্রভেদ!" (হালদারগোষ্ঠী—গল্পগুচ্ছ ৩য় ভাগ—রবীন্দ্রনাথ।) এই চারিত্রিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্যের কারণ কি? গবেষণার ফলে জীবতত্ত্ববিদগণ যে বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছেন তাকেই আজ মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বংশানুক্রম বলা হয়।

অনেকেরই ধারণা যে বংশানুক্রম একটি রহস্যময় নিগূঢ় প্রাণশক্তি। এই শক্তির ফলেই জাতক তার জনক-জননীর সাদৃশ্যে জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, রুচি, অভ্যাস, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি নির্ভর

করে তার পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশেষত্বের উপরে তো বটেই, এছাড়া তাঁদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা ইত্যাদি সকলই মানুষের উপরে কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে দুটি মূল কারণের উপরে—এ দুটিকে বলা যায় তার বংশানুক্রম ও পরিবেশ। পিতৃপুরুষের যে সদৃশ ও বিসদৃশ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই সকলের সমষ্টিকেই বংশানুক্রম বলা হয়। প্রকৃতির কোন্ নিয়মানুসারে সন্তান পিতামাতার গুণাবলীর অধিকারী হয়, কেনই বা তার ব্যতিক্রম ঘটে, বংশগত উত্তরাধিকারের ধারা কোন্ নির্দ্দিষ্ট পথ বেয়ে চলে এবং উত্তরাধিকারলব্ধ দোষগুণগুলিকে নিয়মিত করা যায় কিনা,—এই সকল তথ্য জানবার জন্য আজ অনেকেই উৎসুক।

প্রকৃতি-রাজ্যে জীবের জন্মবৃত্তান্ত বড়ই বিস্ময়কর। দুই প্রকার জনন-কোষের সার্থক মিলনফলে প্রজননের কাজ সম্পন্ন নয়। পিতার দেহ হতে আগত একটি শুক্রকীট যখন মাতার একটি অণ্ডকোষের সহিত মিলিত হয় তখনই সন্তানের উৎপত্তি হয়। এই যে দুইটি জননকোষের মিলনফলে একটি জাতপিণ্ডের (Zygote) সৃষ্টি হলো এরই মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকে পরিণত মানবের শারীরিক, মানসিক ও আনুভূতিক সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা। এই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিই সন্তানের শিক্ষা-নিরপেক্ষ পৈতৃক সম্পত্তি, প্রকৃতিদত্ত স্বভাব-সম্পদ, সম্পূর্ণরূপে অনর্জ্জিত ও অপরিবর্ত্তনীয়। একেই বৈজ্ঞানিক ভাষায় বংশানুক্রম বলা হয়।

পরিবেশের প্রভাব কিভাবে সন্তানের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে এ সম্বন্ধেও আমাদের মনে নানা কৌতূহল ও ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন যে পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হলে সন্তানের বংশানুক্রমজনিত বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হতে পারে। এই মতকেই প্রমাণিত করবার জন্য রাশিয়াতে মিচুরিন (Michurin), লাইসেনকো (Lysenko) এবং তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। রাসায়নিক সারের সাহায্যে, জলবাতাসের পরিবর্ত্তন করে তাঁরা গম প্রভৃতি খাদ্য শস্যের যে অদ্ভুত উৎকর্ষ বিধান করেছেন তাতে গোঁড়া পরিবেশবাদীরা বলেন যে পরিবেশ পরিবর্ত্তনের দ্বারা মানুষের শরীর ও মনের যে কোন পরিবর্ত্তনই সম্ভব।

মানুষের জীবনে বংশানুক্রম ও পরিবেশ—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব অধিক—এর মীমাংসা শিক্ষাজগতে একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস বিকাশে বংশানুক্রম ও পরিবেশের প্রভাব এত গভীর ও

ব্যাপক যে আমাদের প্রত্যেককেই এ সম্বন্ধে যথার্থ ও প্রমাণসিদ্ধ তথ্যগুলি জানতে হবে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে প্রাণীর জন্মবৃত্তান্ত বড়ই বিস্ময়কর। পিতা ও মাতার সঙ্গমের ফলে মাতার গর্ভে প্রথম প্রাণ সঞ্চার হয়। এই সময়ে যে জাতপিণ্ডের সৃষ্টি হলো সেটি একটি এককোষ বিশিষ্ট (Unicellular) প্রাণকেন্দ্র। এই কোষটিতে পিতা ও মাতার দৈহিক উপাদান সমানভাবে থাকে। এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোষটি দ্রুত বিভক্ত হয়ে এক হতে দুই, দুই হতে চার এইভাবে বৃদ্ধি পায়—এবং এরাই ক্রমে শিশুর সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে পরিণত হয়। মানুষের দেহে প্রত্যেক কোষের মধ্যে ২৪ জোড়া "ক্রোমোসাম" বা গুণসমষ্টিবাহী পদার্থ ইতস্ততঃ ভাবে ছড়িয়ে থাকে। এই ৪৮টি ক্রোমোসামের মধ্যে ২৪টি পিতৃবংশ হতে আগত এবং অন্য চব্বিশটি মাতৃবংশ হতে আগত। যখন একটি কোষ ভেঙ্গে দুটি হয় তখন প্রত্যেক কোষেই এই ২৪ জোড়া ক্রোমোসাম সমানভাবে বিভক্ত হয়। সুতরাং দেহের প্রত্যেকটি কোষেই পিতামাতার দেহের উপাদান ছড়িয়ে থাকে। এই ক্রোমোসামের উপরে দেহের নানা বৈশিষ্ট্য যথা, কটা চোখ, বেঁটে বা লম্বা হওয়া ইত্যাদি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকগণ এক সময়ে মনে করেছিলেন বুঝি এগুলিই বংশানুক্রমের মূল উপাদান। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে ক্রোমোসামের মধ্যে "জীন" নামক বিশেষ বিশেষ গুণনির্ণায়ক একরূপ বস্তু থাকে। মানুষের বেলায় এই জীনের সংখ্যা সহস্রাধিক। প্রত্যেকটি জীন বংশগত এক একটি গুণের পরিবাহক এবং বিভিন্ন সন্তানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন "জীন" সম্বলিত ক্রোমোসামের সমাবেশ ঘটে বলেই তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণ প্রকাশ পায়। (১) এমন কি, দুইটি যমজ সন্তানের ক্ষেত্রেও বংশানুক্রম বহুল পরিমাণে এক হলেও সম্পূর্ণরূপে এক হয় না। ভায়েজম্যান (Weismann) নামক এক বিশিষ্ট জীবতত্ত্ববিদ প্রমাণ করেছেন যে পিতৃ ও মাতৃকোষগুলি সন্তানের দেহ নির্ম্মাণ করেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না, কিন্তু সেই নূতন দেহে কয়েকটি বীজকোষ অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। আদিম পিতামাতার বীজকোষগুলি এই ভাবেই বংশধরগণের দেহে ক্রমাগত অবিকৃতধারায় চলতে থাকে, এবং এই জন্যই বংশের বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে বারম্বার বহু দূরবর্ত্তী পুরুষেও পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।

---

(১) "The child gets all his genes from his parents but his assortment differs from that of either parent, from that of any of his brothers or sisters, and even from that of any other individual anywhere, for the number of possible combinations of genes is practically infinite. The child's heredity is his own unique combination of genes." Psychology P. 164—Woodworth & Marquis.

বংশধারার গুণাগুণগুলি স্বভাবের কোন্ নিয়মে বংশপরম্পরায় প্রকাশ পায়, তাদের নির্দ্দিষ্ট কোন গতি আছে কিনা জানতে হলে প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে গবেষণার সাহায্যে যে সকল প্রমাণসিদ্ধ তথ্য পাওয়া গেছে সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। মানবজীবনে বংশানুক্রম ও পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যাপকরূপে গবেষণা করেছেন মেণ্ডেল (Johann Gregor Mendel)। ইনি জাতিতে চেক (Czech) এবং তাঁর জীবিকা ছিল পৌরোহিত্য। তিনি অতি নিভৃতে, একাগ্রচিত্তে মটরদানার ফলন নিরীক্ষণ করে জীবজগতে বংশধারা সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেন। সেই তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। মটরদানা নিয়ে পরীক্ষা করার সুবিধা হলো এই যে এদের ফলন দ্রুত, কাজেই তিন চার পুরুষের বংশানুক্রমের ধারাটি অনুসরণ করা সহজ। তাদের ক্রোমোসামের সংখ্যা মাত্র সাতটি এবং তাদের মধ্যে বিভিন্নতাও সাত রকমের, তাই তিনি মনে করেছিলেন যে ক্রোমোসামের বিভিন্ন সমবায়ের ফলেই বুঝি মটরদানাগুলির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। এছাড়া তিনি আরও আবিষ্কার করেছিলেন যে জাতকের মধ্যে কোন কোন গুণ থাকে প্রকট (Dominant) এবং কোন কোন গুণ থাকে প্রচ্ছন্ন (Recessive)। একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন গুণের সমাবেশ ঘটলে প্রকট গুণটিই সন্তানের দেহে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং প্রচ্ছন্ন গুণটি ক্ষীণবীর্য্য বলে বিকশিত হতে পারে না; সন্তানের দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রকট গুণটি তখন হয় সম্ভাব্য (Probable) এবং প্রচ্ছন্ন গুণটি থাকে সম্ভাবনারূপে (Possible)।

পুরোহিত মেণ্ডেল দুই জাতীয় মটরদানা নিয়ে তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেন। এক জাতীয় মটরের দানা ছিল সুন্দর, পরিপুষ্ট ও গোল; আর এক জাতীয় মটরের দানা ছিল শুষ্ক ও কুঞ্চিত। এই দুই জাতীয় বীজ বপন করলেন মেণ্ডেল। ক্রমে লতায় ফুল ফুটলো; বীজধারণের সময় হলে মেণ্ডেল পরিপুষ্ট দানা হতে যে ফুল ফুটেছে তাদের স্ব-নিষিক্ত (Self-pollinate) করলেন, ঠিক তেমনিভাবে করলেন কুঞ্চিত শুষ্ক দানার ফুলগুলিকে। এতে দেখা গেল পরিপুষ্ট দানার মিলনফলে অমিশ্র পরিপুষ্ট গোল মটরদানাই জন্মেছে। শুষ্ক দানার সঙ্গে শুষ্ক দানার মিলনফলে অনুরূপ শুষ্ক মটরদানাই জন্মেছে। এরূপ জন্ম সংঘটন স্বাভাবিক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তারপরে তিনি একটি পরিপুষ্ট দানার ফুল ও কুঞ্চিত দানার ফুলকে নিষিক্ত করলেন। এই জাতীয় পরাগের মিলনফলে যে ফসল পাওয়া গেল, তাতে দেখা যে তাদের মধ্যে একটিও শুষ্ক বা কুঞ্চিত মটর জন্মায় নি। কেননা, এই ক্ষেত্রে পরিপুষ্ট

মটরগুলির শক্তি ছিল প্রকট এবং শুষ্ক মটরের শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন। এই তো গেল প্রথম ফসলের বেলায়। চিত্রের সাহায্যে এই ফসলটি এইভাবে বুঝানো যেতে পারে :—
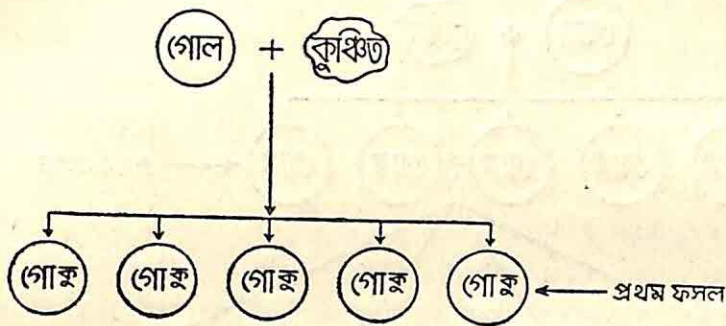
দ্বিতীয় ফসলের সময়ে গোকু জাতীয় বীজের মধ্যে মিশ্রণ করা হলো। এবারে দেখা গেল যে সব মটরদানা পুষ্ট ও গোল হয় নি। শতকরা ২৫টি দানা হয়েছে বিশুদ্ধ ভাবে শুষ্ক ও কুঞ্চিত এবং বাকী ৭৫টি গোলাকার। এই ৭৫টি গোল দানার মধ্যেও কিছু বৈচিত্র্য দেখা গেল। তাদের মধ্যে ২৫টি বিশুদ্ধ ভাবে গোল, আর ৫০টি গোলাকৃতি হলেও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়।
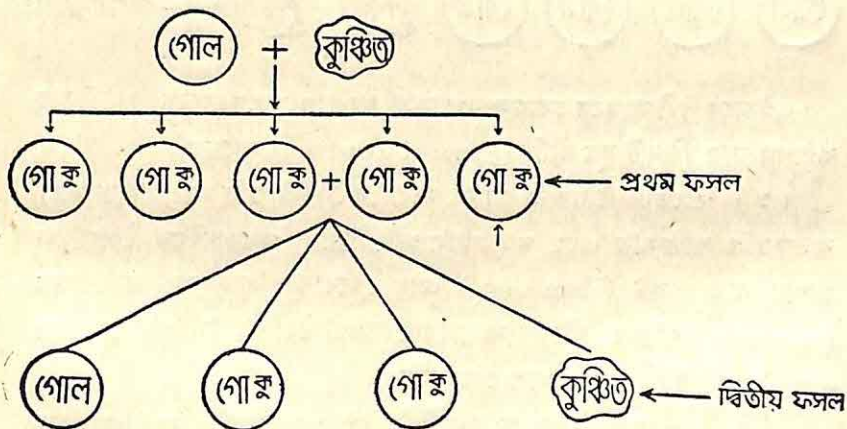
তৃতীয় ফসলে দেখা গেল যে বিশুদ্ধ গোল বীজ হতে সবগুলিই পরিপুষ্ট, সুন্দর ও গোল মটর উৎপন্ন হয়েছে এবং বিশুদ্ধ কুঞ্চিত বীজ হতে কেবলমাত্র কুঞ্চিত ও শুষ্ক মটর জন্মেছে কিন্তু মিশ্র প্রকৃতির ৫০টি গোল বীজকে স্ব-নিষিক্ত করে প্রত্যেকটিতে পাওয়া গেল ২৫টি বিশুদ্ধ, ২৫টি কুঞ্চিত এবং ৫০টি মিশ্র। অর্থাৎ গোকু জাতীয় মটরবীজ স্ব-নিষিক্ত হলে ১টি (২৫%) হবে বিশুদ্ধ গোল,

১টি (২৫%) হবে বিশুদ্ধ কুঞ্চিত এবং বাকী ২টি (৫০%) হবে মিশ্র গোল দানা। এই ব্যাখ্যাটিও চিত্রের সাহায্যে বোঝানো যায় :—
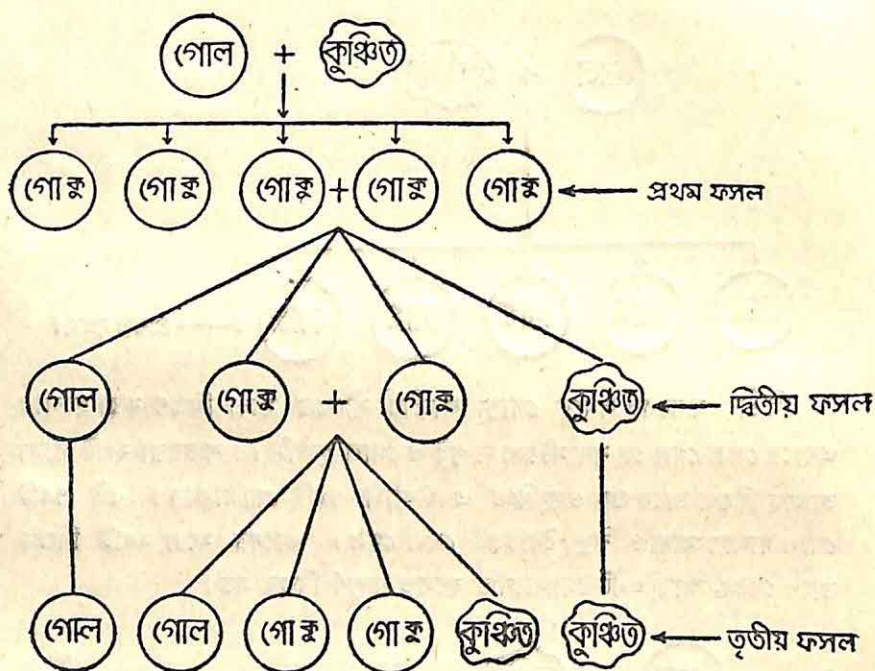
এইভাবে পরীক্ষা করে মেণ্ডেল বংশানুক্রমের ধারা সম্বন্ধে যে তথ্য আবিষ্কার করলেন তার তিনটি মূল নীতি (Laws of heredity) আছে :—

(১) প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আছে তার মধ্যে কতকগুলি শক্তিমান এবং কতকগুলি ক্ষীণবীর্য্য। প্রথমগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে প্রকট (dominant) এবং শেষোক্তগুলিকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন (recessive) শক্তি। বীজের মধ্যে বিপরীতধর্ম্মী বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলেও প্রকট বৈশিষ্ট্যটিই সর্ব্বদা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

(২) প্রজননের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। যথা আলোচ্য মটরদানার মধ্যে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—গাছটি লম্বা হতে পারে, ছোট হতে পারে, পুষ্ট হতে পারে, অপরিণত থাকতে পারে—এ সম্ভাবনাগুলির সবই বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকে, কিন্তু সেগুলির উপরে মটরদানার গোল বা কুঞ্চিত হওয়া নির্ভর করে না। আমরা প্রত্যেক প্রাণীকে দৈহিক দিক থেকে সমগ্রভাবেই দেখি বটে কিন্তু বংশানুক্রমের দিক হতে তার মধ্যে বহু বিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রধান গুণ থাকে।

(৩) জননকোষ সর্ব্বদা বিশুদ্ধ গুণগুলিকে বহন করে। প্রকট ও প্রচ্ছন্ন শক্তির মিলনফলে একটি নূতন বংশের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সন্তান পিতামাতার প্রকট গুণটিই প্রকাশ করে। মিশ্র গুণ প্রকাশ করে না। যদি দুটি জননকোষেই কুঞ্চিত গুণ থাকে তাহলে জাতকের মধ্যে কুঞ্চন বৈশিষ্ট্যই প্রকট হবে। যদি একটি গোল হয় এবং অন্যটি কুঞ্চিত হয়, তাহলে বীজটি গোল হবে কেননা গোলরূপটি এখানে প্রকট। মেণ্ডেলবাদ মানুষের ক্ষেত্রে কতদূর প্রয়োগ করা যায় তাও বিচারের বিষয়। চক্ষু তারকার রং, চুলের রং, আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য, ওষ্ঠের স্থূলতা, নৈশান্ধতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট বলেই প্রমাণিত হয়েছে। নৈশান্ধতা কেবল পুরুষদের মধ্যেই প্রকাশ পায় বটে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি কেবল মাতৃদেহে সঞ্চিত থাকে এবং জননীর দেহ হতে বংশানুক্রমে পুংসন্তানের মধ্যে প্রকটিত হয়। জননী বা কন্যার মধ্যে সচরাচর প্রকাশ পায় না। তবে নৈশান্ধ পুরুষ ও নৈশান্ধ স্ত্রীর মিলন হলে কখন কখনও কন্যার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়। সঙ্গীতের ক্ষমতা, বুদ্ধি, ত্বকের রং ঠিক প্রকট বা প্রচ্ছন্ন কিনা তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

মেণ্ডেল বংশানুক্রম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা যুগান্তকারী হলেও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তিনি মনে করেছিলেন যে ক্রোমোসামগুলিই বংশানুক্রমের মূল উপাদান এবং তাদের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের ফলেই বংশানুক্রমের ধারাটি নির্ণীত হয়। এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য নয়। পূর্ব্বেই "জীন" সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জীন বংশগত এক একটি গুণের পরিবাহক। এই সহস্রাধিক জীনের বিভিন্ন সংযোগ ও মিলনফলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া মেণ্ডেল বলেছিলেন যে প্রকট গুণের কাছে প্রচ্ছন্ন গুণ সর্ব্বদাই পরাজিত হয়। একথাও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। দুইটি বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট জননকোষের মিলনফলে অনেক সময়ে একটি মাঝারি গুণেরও সৃষ্টি হয়। একথা মেণ্ডেলও পরে স্বীকার করেন।

বংশানুক্রম ও পরিবেশ সম্বন্ধে আরও একজন ব্যাপকভাবে গবেষণা করেছিলেন—তাঁর নাম ফ্রান্সিস গ্যালটন (Francis Galton)। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে "হেরেডিটারী ট্যালেণ্ট অ্যাণ্ড জিনিয়াস" (Hereditary Talents and Genius) নামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করে তিনি আরও গভীরভাবে গবেষণা করেন এবং "হেরেডিটারী জিনিয়াস" (Hereditary Genius) নামে একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্যালটন-ডারউইন (Galton-Darwin) নামক দুটি নিকটতম সম্পর্ক-বিশিষ্ট বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করে প্রমাণ করেন যে মানব

জীবনে বংশানুক্রমের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত-ভাবে পরিচয়সূত্র দেওয়া যায় এইরূপে :—

(১) বিশেষ একজাতীয় প্রাণী কেবল তৎসদৃশ প্রাণীরই জন্ম দেয়। বানর হতে কেবলমাত্র বানরই জন্মায়; ছাগজননীর সকলগুলি সন্তানই ছাগশিশু। চাঁপাফুলের কোরক হতে যত ফুলই ফুটে উঠুক না কেন, তারা চাঁপা ফুলই হবে, গোলাপ বা চামেলী হয়ে ফুটে উঠবে না।

(২) পৃথিবীর বৃক্ষলতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী ও জীবজগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যে মানব—সকলেই স্বীয় আকৃতি ও প্রকৃতিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেই বংশ বিস্তার করে থাকে এবং তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের ধারাটিও বংশপরম্পরায় একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু সন্তানেরা পিতামাতার সাদৃশ্যে জন্মগ্রহণ করলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন কিছু বৈষম্য থাকে যাতে তারা অবিকল পিতামাতার বা এক অন্যের মত হয় না।

(৩) সন্তান পিতামাতার নিকট হতে ১/২, পিতামহ ও মাতামহের নিকট হতে ১/৪, প্রপিতা ও প্রমাতামহের নিকট হতে ১/৮ ভাগ পরিমাণ বংশের বৈশিষ্ট্যগুলির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। এই উত্তরাধিকারের ধারা কিভাবে বংশের মধ্যে প্রবাহিত হয় তা নিম্নলিখিত চিত্র অনুশীলন করলে সহজেই বোঝা যাবে।
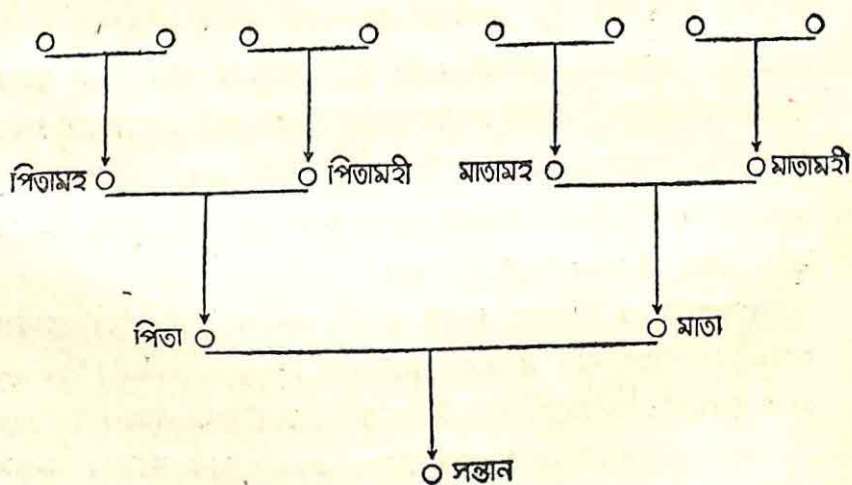
এইরূপে উর্দ্ধতন বিংশতিতম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই সন্তানকে কোন না কোনভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকেন। গ্যালটনের মতানুসারে বংশগত বৈশিষ্ট্যের উপরে পরিবেশের বিশেষ কোনই প্রভাব নাই। সদ্বংশে বরাবরই

সদ্বংশীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং নীচ বংশে নীচস্বভাবাপন্ন সন্তানের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে।

গ্যালটন প্রমাণিত বংশগতি সম্বন্ধে প্রথম সূত্রটি অনুসারে যে কোন এক-জাতীয় প্রাণী তৎসদৃশ প্রাণীর জন্ম দেয় বটে, কিন্তু এই সমজাতীয় প্রাণীদের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে বৈষম্য দেখা যায়। এই সকল কারণ নির্ণয়ের জন্য গ্যালটন ও ভায়েজম্যান যে সকল গবেষণা করেন তার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের জন্মকালে "জীন" নামক জীবকোষের একটি অংশ অবিকৃত ও অব্যাহত অবস্থায় জনিতার দেহ হতে জাতকের দেহে সঞ্চালিত হয়ে বংশধারার বৈশিষ্ট্য বহন করে চলে। প্রজননকালে যখন জীবকোষ বিভক্ত হয় তখন প্রত্যেক সন্তানের দেহে একইরূপ "জীন" সম্বলিত জীবকোষ সঞ্চালিত হয় না বলেই পিতামাতার চারিটি সন্তান সম্পূর্ণভাবে একরূপ হয় না। এইজন্য আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতিমাতাকে রহস্যময়ী ও খামখেয়ালী (Law of chance) বলেই মনে হয় কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে সৃষ্টিকালে প্রত্যেক শ্রেণীর জীব তাদের মধ্যে গড়পড়তাভাবে একটা সমতা রক্ষা করে চলে। যথা ১০,০০০ লোককে যদি তাদের শারীরিক উচ্চতা অনুযায়ী এক সারিতে দাঁড় করানো যায় তবে দেখা যাবে যে দুই তিনজন ৭ ফুটের অধিক লম্বা আর দুই তিনজন ৪ ফুটের অনধিক লম্বা। তারপরে দশ বারো জন ৬ ফুট হতে ৭ ফুটের মধ্যে, আর দশ বারো জন ৪ হতে ৫ ফুটের মধ্যে, এবং আর বাকী সকলেই ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি হতে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির মধ্যে লম্বা হয়। এইভাবে দেখা যায় যে এই বিরাট জনতার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই অতি দীর্ঘ বা অত্যন্ত খর্ব্ব। শারীরিক অনুপাতে এই তথ্যটি যেমন সত্য, মানসিক শক্তি কিম্বা মনীষার প্রখরতা তথা, যে কোনও মনের গুণ সম্বন্ধেও একথা তেমনই সত্য। হয়তো এক সহস্রের মধ্যে এক বা দুইজন অলৌকিক প্রতিভাশালী লোকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এক বা দুইজন নির্ব্বোধ ও জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মগ্রহণ করে, বাকী সকলের মধ্যে তারতম্য থাকলেও অত্যধিক বিকৃতি থাকে না। তাদের সাধারণভাবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির মধ্যে অতি অসাধারণত্বের বিশেষ কোনই স্থান নাই। তাই দেখা যায় যে অতি দীর্ঘ গঠনের পিতামাতার সন্তানেরা সাধারণ লোক অপেক্ষা দীর্ঘতর হলেও পিতামাতা অপেক্ষা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয় না বরঞ্চ খর্ব্বই হয়ে থাকে, আবার তাই বলে বামনও হয় না। প্রকৃতির মধ্যে যে একটি স্থিতি-স্থাপকতার ব্যবস্থা আছে তা সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। মনীষাসম্পন্ন পিতার সন্তান সচরাচর সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নই হয়ে থাকে, (ম্যাদাম ক্যুরীর সন্তান

আইরিণ জোলিও ক্যুরী নিয়ম নয়; ব্যতিক্রম) কেননা মানসিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে থাকলে মানবজাতি হয় শরীরে ও মনে দৈত্যের বা বালখিল্যের বংশে পরিণত হয়ে যাবে। এইজন্যই প্রাণীর প্রজননক্ষেত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি প্রত্যাবর্ত্তনপ্রবণতা (Law of Return to Average) দেখা যায়।

কোন কোন সময়ে সমজাতীয় প্রাণীদিগের মধ্যে সহসা এক অসমজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে। এইরূপ বিস্ময়কর ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলে বিবর্ত্তনবাদের (Theory of Evolution) আশ্রয় নিতে হয়। বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিত ল্যামার্ক (Lamarck) বলেন যে, প্রাণিজগতে দেখা যায় যে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করবার জন্য প্রত্যেক জীবের মধ্যে একটি স্বতঃক্রিয়াশীল প্রেরণা বা জীবন-প্রেরণার স্রোত বিদ্যমান। প্রয়োজনবোধ হলেই জীব স্বীয় ব্যবহার ও ক্ষমতাগুলিকে নিজের অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তন করে তার জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে প্রয়াস পায়। পরে পরিবর্ত্তিত বৈশিষ্ট্যগুলি নূতন সৃষ্ট বা পরিবর্ত্তিত "জীন"এর মাধ্যমে তার সন্তানসন্ততির মধ্যে ও উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ধরা যাক জিরাফের কথা। হয়তো অতীত যুগে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে জিরাফকে ক্রমাগত গলা বাড়িয়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে খেতে হয়েছে। এই খাদ্য সংগ্রহের তাগিদ হলো জিরাফের জীবন প্রেরণা এবং এরই ফলে ক্রমশঃ জিরাফের গলা একটু লম্বা হয়ে পড়ে। জিরাফের পরবর্ত্তী বংশধরগণের ঐ একই জীবন-প্রেরণার বশে গলদেশ দীর্ঘতর হয়েছে বলেই বিবর্ত্তনবাদীদিগের বিশ্বাস।

এর পরে জীবজগৎ সম্বন্ধে আরও অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ডারউইন। তিনি বলেন যে পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণিগণের মধ্যে নিয়ত একটা সংগ্রাম চলেছে। সেই সংগ্রামে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করতে পারে তারাই প্রকৃতিমাতার মনোনীত সন্তান, অন্যেরা জীবনের আসর হতে ক্রমশঃ বিদায় গ্রহণ করে। এই মতবাদটিকে ইংরাজীতে বলা হয় Survival of the Fittest কিম্বা প্রকৃষ্টতমের জীবনাধিকারবাদ। ডারউইনের মতে প্রকৃতিদেবী সৃষ্টির আনন্দে কেবলই সৃষ্টি করেন এবং সেই অসংখ্য সৃষ্ট জীবকে খাদ্য অন্বেষণের জন্য স্বীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টায় অবিরত পরিশ্রম করতে হয়। ফলে, কোন কোন জীব এই চরম প্রয়াসে অকৃতকার্য্য হয়ে ধরাতল হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আবার কোন কোন জীব সম্পূর্ণভাবে সফলতা লাভে অসমর্থ হয় বলে তাদের দেহে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, যে পরিবর্ত্তনগুলি পরবর্ত্তী বংশেও সঞ্চারিত হয়। যারা সম্পূর্ণরূপে

জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে তারাই শ্রেষ্ঠ জাতি উৎপন্ন করে সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখে।

এই সকল মতামত অনুধাবন করে অনেকের মনে দুটি প্রশ্ন জাগে—যদি কোন শিশু তার পিতৃপুরুষের শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী না হয়, কিম্বা পিতৃপুরুষগণের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলেও সে আপন প্রচেষ্টায় জীবনে সিদ্ধিলাভ করতে পারে কি? দ্বিতীয়তঃ পিতামাতা নিজেদের জীবনকালে যে মানসিক ও শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করেন, সেই অর্জ্জিত শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় কি? অর্থাৎ পারিবেশিক শিক্ষা বংশানুক্রমের দৈন্যমোচন করতে পারে কিনা এবং অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কিনা—এই দুটি সমস্যাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষরূপে বিচারের বিষয়।

পিতৃপুরুষের মনীষা বা অন্যান্য বিশিষ্ট গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ না করেও জাতক উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে উন্নততর জীবনযাপন করতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেন যে মানুষের জীবনে বংশানুক্রম ও পরিবেশ দুটি অবিরত ধারায় কাজ করছে। শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনাগুলি সুপ্ত থাকে তাদের একটা সীমা আছে। বংশানুক্রম এই সম্ভাবনাগুলির সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দেয়। আপ্রাণ চেষ্টাতেও একটি মানবসন্তানকে ২২ ফুট লম্বা করা যায় না কেননা তার দেহের মধ্যে কোথাও এমন ক্ষমতার সম্ভাবনা সুপ্ত নাই। কিন্তু যে মানুষের মধ্যে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে উপযুক্ত আহার, ব্যায়াম ও বিশ্রামের অভাবে অনেক সময়ে ৫ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়ে আর বৃদ্ধি পায় না। যে শিশুর মধ্যে সঙ্গীত বা চিত্রাঙ্কনের প্রতিভা সুপ্ত হয়ে আছে, সে সহায়ক পরিবেশে লালিত হলে, তার মনীষার স্ফুরণ হওয়ারই সমধিক সম্ভাবনা কিন্তু তাকে জঙ্গলে ফেলে রাখলে হয়তো সে কেবল সুর, তাল মাত্রা সংযোগে টিন পিটিয়েই গোচারণে দক্ষতা প্রকাশ করবে। একটি চাঁপা গাছ হতে চাঁপা ফুলই ফুটবে, চামেলী কখনই ফুটবে না, কেননা এইটিই চাঁপার বংশধারা, কিন্তু গাছে দুই একটা ফুল ফুটবে কি রাশিরাশি ফুল ফুটবে, সুন্দর তাজা ফুল ফুটবে, কি ক্ষুদ্র, বিবর্ণ ফুল ফুটবে তা নির্ভর করে মাটির উর্ব্বরতা, যথোপযুক্ত আবহাওয়ার উপরে—এটাই হলো পরিবেশ। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের নেকড়ে বাঘ-পালিতা মানবকন্যা কমলার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মানুষের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কমলা নেকড়ে বাঘের সঙ্গে মানুষ হওয়ায় তার ব্যবহারাদি নেকড়ে বাঘের মতই হয়েছিল বলে বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। মনুষ্যসমাজের উপযুক্ত ব্যবহারগুলি দমিত হওয়ায় এবং পশুর সঙ্গে বসবাসের ফলে তার নেকড়ে বাঘের মত ব্যবহারগুলি অতি সহজেই প্রকাশ পায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষের স্বভাবের উপরে পরিবেশের কি গভীর প্রভাব।

হার্ব্বার্ট, হেলভেশিয়াস, লক, স্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পারিবেশিক ও সামাজিক প্রভাবের উপরেই জোর দিয়েছেন অনেক বেশী। তাঁরা বলেন যে শিশুর মধ্যে যে সকল সম্ভাবনা সুপ্ত আছে তাদের ফুটিয়ে তুলতে হলে চাই উপযুক্ত পরিবেশ। পরিবেশের একটি প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। সেই শিক্ষার দায়িত্ব হলো পিতামাতা ও শিক্ষকের উপরে। নিকৃষ্ট বংশানুক্রমের সমস্ত সম্ভাবনা উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে রুদ্ধ করা গেছে, এবং সুশিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজের জীবনে প্রভূত উন্নতি করতে পেরেছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে শুধু কেবল কয়েকটি ব্যক্তির নয় কিন্তু একটি সম্পূর্ণ জাতিরও কতখানি উন্নতি হতে পারে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছে রাশিয়া ও নূতন চীন।

বংশানুক্রমের প্রভাবকে যাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে গ্যালটন হলেন অন্যতম। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে গ্যালটন, থর্ণডাইক, মেরীম্যান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে শিশুদের কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে গণিতে পারদর্শিতা, কাজে কর্ম্মে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির মাপকাঠিতে নিঃসম্পর্কীয় বালক-বালিকা অপেক্ষা জ্ঞাতিদের মধ্যে এবং জ্ঞাতি অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতাদের মধ্যে এবং তদপেক্ষা যমজদের মধ্যে অনেক বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁদের মতে বংশানুক্রমই শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশে অধিকতর শক্তিশালী। "গ্যালটনের জীবনসাধনার মূল কথা এই যে, মানুষের পক্ষে প্রকৃতির সহযোগিতা, শিক্ষা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন ; এই প্রতিপাদ্যটিকে যথাযোগ্যভাবে প্রমাণিত করাও যেতে পারে। মানুষ যখন এই সত্যটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে, কেবল তখনই সে আপনাকে মানসিক ও শারীরিক শ্রেষ্ঠত্বে উন্নত করে তুলবে।" (২)

স্যার পার্সি নান্ (Sir Percy Nunn) এডুকেশন, ইটস্ ড্যাটা এণ্ড প্রিন্সিপল্স (Education, Its Data and Principles) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যে মত প্রকাশ করে গেছেন, মনে হয় আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তিনি বলেছেন যে হার্ব্বার্ট ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় পরিবেশের

---

(২) "The basis of Galton's life-work was the conceptionthat nature for man is more important than nurture, that this principle can be established quantitatively, and that only when it is fully realised will humanity be able to raise itself in the scale of mental and physical fitness"—Individual Differences. P. 78 by F. S. Freeman.

পক্ষে এবং গ্যালটন ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ বংশানুক্রমের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে নিজেদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই যেন বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মানবশিশুকে মৃৎপিণ্ড মনে করা নিতান্তই ভুল। বংশানুক্রমের পক্ষে যাঁরা ওকালতি করছেন তাঁরা বলেন যে জন্মের পূর্ব্ব হতেই শিশুর সমস্ত ক্ষমতা স্থিরীকৃত হয়ে আছে এবং অন্যপক্ষ বলেন যে শিশুর জীবনকে কুম্ভকারের মত নিত্য নূতন ছাঁচে ঢেলে রূপ দেওয়াই হলো পরিবেশের কাজ। তাঁরা মনে করেন যে শিশুর বংশানুক্রম যাই হোক না কেন, তার জন্মের পর তাকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে পরিবেশকে যথাযথরূপে নিয়ন্ত্রিত করলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। নান্ বলেন যে মানবশিশু নিছক মৃৎপিণ্ড নয়, সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে, তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতাও আছে। এই ক্ষমতার দ্বারা সে তার পরিবেশকে হয়তো সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারে না কিন্তু তার জীবন-প্রেরণার সাহায্যে সে তার জন্মগত মূলধনগুলিকে বিকশিত করে তুলতে পারে। কাজেই যাঁরা বলেন যে বংশানুক্রম মানবজীবনের একমাত্র নিয়ামক, তাঁরা অদৃষ্টবাদ। এবং যাঁরা মনে করেন পরিবেশই মানবশিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অনন্য উপায়, তাঁরাও শিশুর বংশধারাকে উপেক্ষা করেন। নানের মতে "Nature and Nurture" প্রকৃতি ও পরিবেশ দুটিকেই সমান প্রাধান্য দিতে হবে। শিশুর জীবনকে সার্থক করতে হলে—এই দুই মতের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটাতে হবে, কেননা একটি অন্যের সম্পূরক। বংশানুক্রম পরিবর্ত্তন করবার ক্ষমতা মানুষের নাই বটে কিন্তু উন্নততর জীবনযাত্রার ফলে বংশানুক্রমের দৈন্যমোচন করা যায়—এই সত্যে বিশ্বাস করেন বলেই আজ শিক্ষক, সমাজ-সেবী, রাজনীতিবিদ সকলেই পরিবেশকে উন্নত ও সুন্দর করে ভবিষ্যৎ জাতির জন্য একটি অনুকূল সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। এই অনুকূল সমাজ হলো শিশুর সামাজিক উত্তরাধিকার (Social heritage)। "পূর্ব্বতন এক পুরুষ বা বহু পুরুষের কার্য্যকলাপ, ইতিহাস লোকপরম্পরায় বা প্রত্যক্ষভাবে অধস্তন পুরুষ জানতে পারে এবং তদ্দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিতও হয়ে থাকে। শিক্ষা যে সামাজিক উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ একথা অতি সুস্পষ্ট।" (৩)

দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যটিতে বিচারের বিষয় হলো এই যে, যদি এক পুরুষে কোন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করা যায়, বংশাধিকারসূত্রে সেই অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যটি উত্তর-পুরুষে

(৩) "By Social inheritance is meant the influence which one generation and all the preceding generations through their works and books exert on the new generation. Clearly education is a part of this social inheritance." Philosophy of Education—P. 136. Godfrey Thompson.

প্রকাশ পায় কিনা। ভায়েজম্যান (Weismann) বলেছেন যে জীনের পরিবর্ত্তন ভিন্ন অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানের মধ্যে দেখা যায় না। অনেক সময়ে একই পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে ভালো আঁকিয়ে বা গাইয়ে দেখা গেছে। তাতেই অনেকে মনে করেন যে অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বংশাধিকারে সন্তানে বর্ত্তায়। পরিবেশবাদীরা বলেন পরিবেশের গুণেই একপুরুষের অর্জ্জিত গুণগুলি বংশানুক্রমে পরিবারের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে অর্জ্জিত গুণেরও বেশীর ভাগ সময়েই একটি প্রকৃতিগত মূল থাকে।

এই সকল পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলাফল কি তাই আমাদের বিবেচনার বিষয়। বংশানুক্রম একটি অন্ধ, অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য শক্তি একথা মনে করাও যেমন নিতান্ত গোঁড়ামীর চিহ্ন, তেমনি পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা ব্যক্তিত্বের যে কোন পরিবর্ত্তনই সম্ভব, এও নিতান্ত জোরের কথা। এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করা বড় সহজ নয়, কিন্তু প্রশ্নটি উপেক্ষা করাও চলে না কেননা, বিষয়টি সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে বংশানুক্রম ও পরিবেশ মানুষের জীবনে এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে যে তাদের আপেক্ষিক প্রভাব নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। বংশানুক্রমও একটা সহজ শক্তি নয়, পরিবেশও সহজ শক্তি নয়। "জীবনের উন্মেষ থেকে অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারের সূত্রপাত হতেই জাতক যে সকল উপাদানে গঠিত হয় সেই সমস্তগুলিকে বংশগতি বলা হয় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতে সমস্ত বহিঃপ্রভাবকে বলা হয় পরিবেশ।" (৪)

মানবজীবনে এ দুটির প্রভাব কি—তার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বংশানুক্রম স্থির রেখে পরিবেশ পরিবর্ত্তন করে তার ফল যেমন লিপিবদ্ধ করছেন, তেমনি পরিবেশ স্থির রেখে বংশানুক্রম পরিবর্ত্তন করে তার ফলাফলও লক্ষ্য করছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে মানবচরিত্রবিকাশে বংশানুক্রম ও পরিবেশ—উভয়েরই গুরুত্ব আমাদের সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে হবে। দেহ-মনধারী মানব সৃষ্টিমূলক শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। তার সৃষ্টি করবার উপকরণ হলো তার প্রকৃতিগত স্বভাব-সম্পদ ও তার পরিবেশ—এই দুই সুষ্ঠু মিলনেই মানুষ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

---

(৪) "Heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life (not at birth but at the time of conception, about nine months before birth) while environment covers all the outside factors that have acted on him since that time." Psychology P 152. Woodworth and Marquis.

গ্রন্থসূচী :—

A. L. Gesell—Infancy and Human Growth.

N. L. Munn—Psychological Development.

P. Sandiford—Foundations of Educational Psychology.

M. Shirley—The First Two Years.

P. Nunn—Education : Its Data and Principles.

Woodworth and Marquis—Psychology.

Murphy and Newcomb—Experimental and Social Psychology.

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর শারীরিক সম্পদ

শিশুর শারীরিক সম্পদ

অতি প্রাচীন যুগ হতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীববিদ্যা ও শারীরবৃত্ত যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, একথা অত্যুক্তি নয়। মানবদেহের সুস্থ গঠন, বৃদ্ধি ও পরিণাত সম্বন্ধে যেমন সকলের একটি সহজ কৌতূহল আছে, তেমনি দেহের বিকার ও তার প্রতিকার সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণের চিরদিনই একটি বিশেষ ঔৎসুক্য আছে। দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মানুষের কত প্রচেষ্টা, কত আয়োজন আজ দিকে দিকে দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাগারে নিবিষ্টচিত্তে নিরলস সাধনা করছেন মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করবার জন্য, দেহের সৌন্দর্য্য রক্ষা করবার জন্য কতই না বিচিত্র উপকরণ ও শিল্পসম্ভারের আয়োজন করছেন শিল্পী, জীবনের আনন্দ ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য মানুষের কতই না নিত্য নূতন ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টা। এই অপরিসীম, পরিশ্রম, চিন্তা, গবেষণা ও আবিষ্কারের মূলে রয়েছে মানুষের নশ্বর দেহ, যাকে নিয়ে আজ আমাদের নিরীক্ষা ও পরীক্ষার অন্ত নাই।

প্রাণিজগতে মানুষের দেহ সংগঠন সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, যে-সকল প্রাণীর গঠন যত বেশী জটিল তাদের মানসিক শক্তিও তত বেশী বিচিত্র ও উন্নত। মানুষ চিন্তা করতে পারে, কল্পনা করতে পারে, সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারে। তার অনুভূতি গভীর, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ন। মানুষের এই সব বিচিত্র ক্ষমতার মূলে আছে তার দেহ-গঠনের বৈশিষ্ট্য। দেহ ও মনের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রচুর উদাহরণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা দেখতে পাই। শিক্ষাজগতে আমরা যেমন শিশুর মানসিক শক্তির বিকাশ-ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকি, তেমনি তার দৈহিক বিকাশ ও উন্নতি সম্বন্ধেও সজাগ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেননা, দেহের জৈবক্রিয়ার চরম বিকাশ দেখা যায় মানুষের মানসিক বিকাশে। দেহতত্ত্বের বিচার ব্যতীত মানবমনের নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝা একরূপ অসম্ভব তাই জীববিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে রয়েছে এক অচ্ছেদ্য এবং গভীর সম্বন্ধ।

মনোজগৎ অতি দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়। মনের গহনে কি চিন্তা থাকে ঘুমিয়ে, সহসা কোন প্রেরণার বশে মানুষ কি কাজ করে তার সংবাদ না পেলে মানুষকে বিচার করা একেবারে অসম্ভব। সূক্ষ্মমনের গতিবিধির পরিচয় আমরা পাই মানুষের কাজ-কর্ম্মে, কথাবার্ত্তায় ও আচার-আচরণে—অর্থাৎ তার সমস্ত ব্যবহারে। মানবোচিত ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার অবয়ব, ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থ পরিণতি ও ক্রিয়ানৈপুণ্যের উপরে। এইজন্যই প্রত্যেক

শিক্ষক ও মনস্তত্ত্ববিদকে মানবদেহের গঠন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

মাতৃদেহে অণ্ডকোষটির সহিত পিতার বীর্য্যকোষটি মিলিত হওয়ামাত্রই শিশুর জীবনধারা সুরু হলো। অণ্ডকোষটির পরিপূর্ণতার ফলে যে ক্ষুদ্র জীবকোষের সৃষ্টি হলো তার পরিধি ও ওজন এতই সামান্য যে এই অণুপরিমাণ কোষটি হতে একদিন একটি পরিণত মানবশিশু জন্মগ্রহণ করবে একথা হৃদয়ঙ্গম করাই কঠিন। কিন্তু এই বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র কোষটি দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে এবং প্রায় ২৮০ দিনের মধ্যে ভ্রূণটির ওজন হয় মোটামুটি ৮ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪ সেরের মত। মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দ্বারা ভ্রূণটি কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়, একথাও বিশেষ বিবেচনার কথা। এ সম্বন্ধে নানা প্রচলিত অথচ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকের বিশ্বাস যে মাতা যদি এই সময়ে শাক ভোজন করেন তবে গর্ভস্থ শিশুর মাথায় ঘন চুল হয়, কিম্বা গর্ভকালে জননী যদি সুন্দর শোভা দেখেন ও সুন্দর লোকের সান্নিধ্যে কালাতিপাত করেন তবে সন্তানও সুন্দর হয়। এই সকল ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে জানা নাই। তবে এ কথা সত্য যে, এই সময়ে জননীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেই শিশুর স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি সম্যকভাবে নির্ভর করে। যদি মাতার খাদ্যে কোন বিশেষ খাদ্যপ্রাণের (Vitamin) অনটন ঘটে, তাহলে শিশুর শরীরও সুপরিণত হয় না। সন্তান-সম্ভাবনাকালে অপরিমিত তামাক, অহিফেন বা অন্য কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য ইত্যাদি সেবন করা উচিত নয় ; সম্ভব হলে একেবারে বর্জ্জন করাই উচিত। কেননা, শিশুর শরীরে এই সকলের বিষ সঞ্চারিত হলে তার সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। পিতামাতার দেহ ব্যাধিদুষ্ট হলে গর্ভস্থ শিশুর দেহও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সেইজন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই জনক জননীর বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত।

মানুষের ভ্রূণ সাধারণতঃ ৯ হতে ১০ মাস ১০ দিন মাতৃগর্ভে থাকে। এই সময়ে তার বৃদ্ধির হার কত এবং কি ভাবে সেই বৃদ্ধি ও পরিণতি সাধিত হয় এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর। প্রত্যক্ষভাবে ভ্রূণটিকে নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করা তো একেবারেই সম্ভব নয়, তবুও চিকিৎসকগণ যতদূর সম্ভব নানা নমুনা সংগ্রহ করে ভ্রূণ সম্বন্ধে একটি বেশ পরিষ্কার ধারণা আমাদের দিতে পেরেছেন। প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে শিশু কি ভাবে অবস্থান করে, তার স্নায়ুবন্ধন, পেশী ও অস্থি সমূহ কি গতিতে বৃদ্ধি পায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবজন্তুর আজন্ম বৃদ্ধি ও আচরণ লক্ষ্য করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল শিশু নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেছে কিম্বা অস্ত্রোপচারের

সাহায্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাদের বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণাধীন রেখে, তাদের বৃদ্ধির হার সম্পর্কে আনুষঙ্গিক সমস্ত তথ্য ও বৃত্তান্ত রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রায় পাঁচমাস পর্য্যন্ত ভ্রূণের নড়াচড়ার কোনও বাহ্যিক চিহ্ন পাওয়া যায় না কিন্তু স্টেথোস্কোপের সাহায্যে জননীকে পরীক্ষা করলে ভ্রূণের হৃদ্স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। "সিজেরিয়েন্" অস্ত্রোপচারের পরে কয়েকটি ৭।৮ সপ্তাহের ভ্রূণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সর্ব্বপ্রথমে, মাতৃজঠরে শিশু যে দ্রবপদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এই কয়েকটি ভ্রূণকে অনুরূপ দ্রবপদার্থে নিমজ্জিত করে রাখা হয়। তারপরে তাদের অনুভূতিবোধের ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার ইন্দ্রিয়গুলি কি ভাবে কাজ করে নিরীক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্দীপকের (Stimulus) সাহায্য নেওয়া হয়। একটি ভ্রূণের ঘাড়ের নীচে একটি চুল দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া হয় কিন্তু তখন কোনই সাড়া পাওয়া যায় না। তারপরে ভ্রূণের মাথায় ও মুখে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণটির সর্ব্ব শরীর সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে এবং যে দিক থেকে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেদিক থেকে ভ্রূণটি ঘুরিয়ে নেয়, তার নিতম্বদেশও ঘুরে যায় এবং হাতদুটি নেমে আসে। অতঃপর ১ হতে ২ সেকেণ্ডের মধ্যেই ভ্রূণটি পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে যায়। ৯।১০ সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণ স্বেচ্ছায় নড়াচড়া করতে পারে, বাইরের উদ্দীপনার জন্য আর অপেক্ষা করে না। ১৬ সপ্তাহ অর্থাৎ চার মাসের পর হতেই ভ্রূণের মধ্যে নানা প্রত্যাবর্ত্তক (reflex) ব্যবহারের লক্ষণ দেখা যায়। পাঁচ মাসের পর হইতেই জননী ভ্রূণের নড়াচড়া বেশ বুঝতে পারেন এবং ভ্রূণটি বেশ শিথিলভাবে জঠর আঁকড়িয়ে ধরেছে এমনও অনেক প্রমাণ পেয়ে থাকেন। ছয় মাসের পর হতে এই সকল প্রত্যাবর্ত্তক কর্ম্মের ক্ষমতা প্রভূত রূপে বৃদ্ধি পায় এবং সাত মাসের পর নিঃশ্বাস গ্রহণের ও চুষে খাওয়ার ক্ষমতা এতদূর পুষ্ট হয় যে এই সময়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তার জীবনের আশা করা যায়।

স্বভাবের নিয়মানুসারে শিশু মাতৃগর্ভে এক মনোরম পরিবেশে, পরম আরামে ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় ঘুমিয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে থাকে উত্তাপের সমতা, উত্তেজনাহীন পরিবেশ এবং কর্ম্মহীন অবসর। এমন শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে শিশুকে চলে আসতে হয় সম্পূর্ণ এক নূতন পরিবেশে। "ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে এসে পড়তে হয় এক সম্পূর্ণ নূতন, জটিলতর এবং উত্তেজনাময় অবস্থার মধ্যে। জন্মের পর হতে তার জগৎ অপরিমেয়রূপে বিস্তৃত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে।" (১) ড্রামণ্ড বলেন, "জন্ম গ্রহণ

(১) "Birth introduces the child to a new, more complex and more intense stimulation. The world is immesasurably wider after birth than before." Psychology. N.L. Munn.

অস্তিত্বের সূচনা নয়, বিশেষ একটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। বাস্তবিক পক্ষে জীবনলীলায় জন্মকাহিনী একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা।" (২)

বাস্তবিকই, এই জন্মমূহূর্ত্তে শিশুর জীবনে এক পরম সন্ধিক্ষণ। সে স্বভাবের নিয়মে নূতন পরিবেশে এসেছে—একথা সত্য বটে, কিন্তু এখন থেকে তার প্রত্যেক কাজে চাই অবিরাম প্রচেষ্টা, না হলে সে বাঁচবে না। তাকে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে, ক্ষুধা অনুভব করতে হবে, নিজের জৈব প্রয়োজনগুলি অন্যকে জানাতে হবে। এই সব নূতন অভিজ্ঞতা শিশুর কাছে অভিনব ও শ্রান্তিকর। নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে ওঠে। শিশুর প্রথম কান্না সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু এই সকল মতের যে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, এমন কোন প্রমাণ নাই। চিকিৎসকগণ বলেন যে বাইরের নানা উদ্দীপনা শিশুর ইন্দ্রিয়গুলিকে সচেতন করে তোলে এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিশু কেঁদে ওঠে। শ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টায় শিশুর ফুসফুসে বাতাসের যে চাপ পড়ে তাতেই শিশু একপ্রকার ধ্বনি প্রকাশ করে, আমরা তাকে "ক্রন্দনধ্বনি" বলে মনে করি। এই ক্রন্দনধ্বনি ভিন্ন অনেক শিশু জন্মিয়েই "হাই" তোলে, অনেকে আবার হাঁচে। শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ, রক্তচলাচলের কাজ, হজমশক্তির ব্যবহার ও মলমূত্র ত্যাগের কাজ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে। রসস্রাবী গ্রন্থিসমূহ নির্দ্দিষ্ট উত্তেজনায় সাড়া দিতে সুরু করে এবং ক্ষুধার উদ্রেক হলে শিশুর জঠরের মধ্যে আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ হতে থাকে, এমনও প্রমাণ পাওয়া গেছে। জন্ম থেকেই শিশুর চুষে খাওয়ার ক্ষমতা থাকে, সে ঘাড় ফেরাতে পারে এবং দুই হাতে যে কোন জিনিষ আঁকড়ে ধরার ক্ষমতাটি শিশু জন্মের পর তিন সপ্তাহকাল খুবই পরিস্ফুট থাকে, তারপর ক্রমে ক্রমে শক্তিটি নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে, এবং পরে কেবল প্রয়োজনকালেই শিশু এই ক্ষমতাটি ব্যবহার করে থাকে।

এই সকল নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা ভিন্ন জন্মের পর হতেই শিশুরা নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন করে এবং নানারূপ শব্দ করে থাকে। প্রথম কয়েকমাস যে কোন উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়াজনিত চিহ্ন শিশুর সর্ব্বাঙ্গেই প্রকাশ পায়; ক্রমে নাড়ীকেন্দ্র নাড়ীসংযোগ, পেশী ও ইন্দ্রিয়যন্ত্রের পরিপুষ্টি হলে উদ্দীপনাজনিত প্রতিক্রিয়াগুলি কেন্দ্রীভূত হতে আরম্ভ করে। শিশু সর্ব্বদাই অঙ্গ সঞ্চালন করে বটে, কিন্তু যদি তার মাত্রা সহসা বৃদ্ধি পায় তখন জানতে হবে যে সে শারীরিক কোন রকম অসুবিধাবোধ করছে বলে চাঞ্চল্যের দ্বারা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(২) "Birth is not the beginning of existence but it is a crisis in existence. It is a great adventure." The Dawn of Mind—M. Drummond.

সচরাচর এই অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আহারের কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্য করা যায় এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি হলে পর শিশু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এতেই বোঝা যায় যে শিশু ক্রমশঃ তার পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে।

নবজাত শিশু যে কি ভাবে, কি অনুভব করে, কি দেখে এবং কি শোনে—এই সকল তথ্য মুখ্যভাবে আবিষ্কার করা এক রকম অসম্ভব বললেই চলে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিন চার দিন প্রায় নির্জ্জীব অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকে—জন্মলাভের জন্য তাকে যে কঠিন প্রয়াস করতে হয়েছে এই সময়ে তারই প্রতিক্রিয়া শিশুর মধ্যে দেখা যায়। মনে হয়, হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সে অবাধে বিশ্রাম উপভোগ করছে। এই অবস্থা কেটে গেলে পর শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনের রীতিপদ্ধতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে তার শরীর ও মনের গতিবিধি কিছু কিছু বোঝা যায়। যেখানে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ চলে সেখানে উদ্দীপক প্রয়োগের দ্বারা প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত শিশুর আচার ব্যবহারগুলি সযত্নে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সুস্থ শিশু চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বকের সাহায্যে জগতের সকল বস্তুর অর্থাৎ তার পরিবেশের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পরিচিত হয়। বৈজ্ঞানিকভাষায় এই ক্ষমতাগুলিকে ইন্দ্রিয়জাত ক্ষমতা বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি তাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। শিশুর এই জ্ঞান প্রথমে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থাকে, ক্রমে নানা অভিজ্ঞতার ফলে তার পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়।

নবজাত শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কি ভাবে শিক্ষালাভ করে বুঝতে হলে, জন্মকালে তার কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়জাত শক্তি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট থাকে, সে কথা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। সদ্যোজাত শিশুর ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশে এত ব্যাপকভাবে গবেষণা হয়েছে যে তাদের শিশুমনস্তত্ত্ব ও শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে প্রকাশিত সাহিত্যের পরিধি দেখলে নিতান্তই বিস্মিত হতে হয়। বহু গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করে ইভ্‌লিন ডিউয়ি (Evelyn Dewey) "বিহেভিয়ার ডেভেলপ্‌মেণ্ট ইন্ ইন্‌ফ্যাণ্টস্" (Behaviour Development in Infants) নামক গ্রন্থে শিশুর জন্মকথার অতি মনোজ্ঞ বিবৃতি ও ব্যাখ্যাদান করেছেন।

দর্শনেন্দ্রিয়—শিশুর দর্শনেন্দ্রিয় কি ভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করা খুব কঠিন নয়, কেননা পরীক্ষামূলকভাবে তার সামনে কোন বস্তু ধরলে হয় সে ঘাড় ঘোরাবে কিম্বা বস্তুর প্রতি তার লক্ষ্য নিবিষ্ট হয়ে উঠবে। তবে কোন্ বয়স থেকে শিশু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি জিনিষ পৃথকভাবে লক্ষ্য করতে আরম্ভ

করে এবং কেমন করে লক্ষ্য করে এ তথ্য জানতে হলে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আলোকরশ্মিপাতে সদ্যোজাত শিশু দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে কি না, রঙের পার্থক্য বোঝে কিনা, ঘূর্ণ্যমান বস্তু লক্ষ্য করে কিনা, এবং এ সকলের ফলে শিশুর মনে কি প্রতিক্রিয়াশীল ভাবের উদয় হয় জানবার জন্য গেসেল (Gesell), কফ্কা (Koffka) প্রভৃতি খ্যাতনামা শিশুমনোবিদগণ বহু গবেষণা করেছেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু কয়েকদিন অধিকাংশ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায় কাজেই চার পাঁচ দিন অতিবাহিত না হলে শিশু কোন বস্তু লক্ষ্য করছে কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না। তবে গেসেল বলেছেন যে জন্মের প্রথম দিনেই শিশুর চোখের পাতাতে নিয়মিত ধারায় সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের গতি স্পষ্টই বোঝা যায় এবং চোখেরও যে একটি ছন্দোময় গতি আছে সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। কফ্কা বলেন যে জন্মমুহূর্ত্ত হইতে শিশু উজ্জ্বল আলোকরশ্মিপাতে চোখ বন্ধ করে কিন্তু তখনও চোখের পেশীসমূহের মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্যবিধান (Co-ordination) হয় না বলে অনেক সময়েই সে দুই চোখের পাতা একসঙ্গে খোলে না। কখনও কখনও দুই চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে একটি বস্তুতেই নিবদ্ধ হয় না সেইজন্য অনেক সময়ে শিশুকে "ট্যারা মনে হয়। ব্রায়ান (Bryan) ৬৬টি শিশুকে পরীক্ষা করে বলেন যে রূপ-রস-গন্ধ ভরা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য সদ্যোজাত শিশু প্রায় দুই ঘণ্টাকাল জেগে থাকে। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে শিশু প্রদীপের আলোক লক্ষ্য করে এবং তার চোখের কাছে কোন উজ্জ্বল বস্তু ঘোরালে সে ঘাড় ফেরাতে চেষ্টা করে। প্রথম মাসেই শিশু আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে পারে কিন্তু অতি উজ্জ্বল রশ্মিপাতে চোখ মিট্‌মিট (blink) করে কিম্বা একেবারেই চোখ বন্ধ করে। শিশু প্রথম বৎসরে উজ্জ্বল রঙ দেখলে খুশি হয় কিন্তু রঙের প্রভেদ বোঝে না। দুই বৎসর বয়স হতে লাল ও হলুদ রঙের পার্থক্য বোঝে এবং ক্রমে অন্যান্য রঙ ও বস্তুর আকার, পরিমাপ, আয়তন ইত্যাদি সম্বন্ধে তার উপলব্ধি হয়। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর কাল শিশুর চোখের পেশীগুলি এমন নমনীয় অবস্থায় থাকে যে ক্রমাগত ভাবে সূক্ষ্ম কাজ করলে তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হতে পারে কিম্বা বারম্বার স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়ে সেগুলি দুর্ব্বল হয়ে যেতে পারে, সেইজন্য শিশুশিক্ষালয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে দৃষ্টিশক্তির হানিকর কোন কাজ করতে দেওয়া অনুচিত। এই সকল কারণেই শিশুশিক্ষাবিদগণ শিশুকে জোর করে হাতের লেখা শেখান, বই পড়তে দেওয়া, সেলাই বা সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে দেওয়ার বিরোধী।

শ্রবণেন্দ্রিয়—জন্মকালে শিশুর শ্রবণশক্তি কতদূর পুষ্ট থাকে এ সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিতভাবে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে ক্যানেষ্ট্রিনির (Canestrini) এবং সারলির (Shirley) গবেষণা উল্লেখযোগ্য। গ্রেসেল, কফ্‌কা, ব্রায়ান প্রভৃতি শিশুবিদগণও ব্যাপকভাবে শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করেছেন। ক্যানেষ্ট্রিনি ৭০টি সদ্যোজাত শিশুর কানের কাছে হাওয়া-বন্দুক (air-gun), বাঁশী, ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা শিশুর শব্দানুভূতির ক্ষমতা যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করেছেন। শব্দ অনুভূত হলে শিশুর নিশ্বাসের গতি প্রথমে হ্রাস পায়, পরে অনিয়মিত ছন্দে চলতে থাকে, রক্ত চলাচলের গতি দ্রুত হয় এবং মস্তিষ্কের ভিতরে দ্রুত স্পন্দনের চিহ্নও পাওয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক মানব মনোযোগ সহকারে কাজ করতে করতে সহসা ভয় পেলে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখায় অনেকটা সেইরূপ শারীরিক ও মানসিক চাঞ্চল্য শিশুর মধ্যেও লক্ষিত হয়। সারলি ২৪ জন সদ্যোজাত শিশুকে পরীক্ষা করেন, এদের মধ্যে ৭ জন শব্দানুভূতির কোনই লক্ষণ প্রকাশ করে নি। তিনি এই তথ্যের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, জন্মের প্রথম দুই তিন দিন শ্রবণেন্দ্রিয় কার্য্যকরী হয় না, কেননা এই সময়ে কানের মধ্যে যে জলীয় পদার্থ থাকে তাতে কানের পর্দ্দা প্রায় আবৃত হয়ে থাকে। এই জলীয় পদার্থ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হলে পর শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয় কার্য্যকরী হয়। দুই এক দিন পরে শিশু শুনতে পায় ঠিকই তবে তখনও তার কাছে শব্দের কোন প্রকৃত অর্থ হয় না বলেই বোধ হয়। প্রথম সপ্তাহে শিশু তার জননী বা ধাত্রীর কণ্ঠস্বর শুনে বেশ নির্দ্দিষ্টভাবেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ক্রন্দনরত শিশুর কাছে মৃদুকণ্ঠে গান গাইলে বা ধীরে ধীরে শিস দিলে সে শান্ত হয়—এও লক্ষ্য করে দেখা গেছে। সহসা কোন শ্রুতিকটু শব্দে বা নূতন কণ্ঠস্বর শুনলে শিশুর রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক ছন্দে যে চাঞ্চল্য ঘটে—এটিও পরীক্ষাসম্মত তথ্য। এইজন্য শিশুশিক্ষালয়ে শিশুরা তাদের পরিচিত ও প্রিয় শিক্ষিকার কাছেই খেলাধুলা করতে ভালবাসে—নিত্যনূতন পরিবর্ত্তন তারা পছন্দ করে না। শিশুশিক্ষিকার কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু সতেজ, মধুর অথচ দৃঢ় হওয়া উচিত—এর ফলে শিশুদের বাচনভঙ্গী ক্রমশঃ সুন্দর হয়ে ওঠে। শিশুকে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দচিত্তে চলাফেরা করবার সুযোগ দিলে সে পাখীর কূজন, পত্রের মর্ম্মর, জলের মৃদু কল্লোলের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও রস গ্রহণে সমর্থ হবে। গীত ও বাদ্যের সুব্যবস্থা থাকলে শিশুর শ্রবণশক্তি প্রখর হবে এবং সুস্বরে কথা বলতে ও গান গাইতে যে অভ্যস্ত হবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

রসনেন্দ্রিয়—নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে ক্যানেষ্টিনি নবজাত শিশুর রসনেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা পরীক্ষা করেন। তিনি শিশুর জিভের উপরে কয়েক বিন্দু মধুর, অম্ল, তিক্ত, লবণাক্ত ও বিশুদ্ধ জল প্রয়োগ করেন—পরে যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সুমিষ্ট জলপানে শিশুর নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিতে কিম্বা মস্তিষ্কের স্পন্দনের মধ্যে কোনই চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি কিন্তু লবণাক্ত জলপানে শিশুর শারীরিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। প্রথমে সে বেশ খুশি হয়েই চুষতে আরম্ভ করে, পরে যেন বিরক্ত হয়ে মুখভঙ্গী করে। অম্ল ও তিক্ত জলেও বেশ সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কিন্তু বিশুদ্ধজলে, মাতৃদুগ্ধে বা গোদুগ্ধে শিশু কোন তারতম্য বোধ করে কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সারলি ১৪ জন শিশুর উপরে উপরোক্ত পরীক্ষাটিই প্রয়োগ করেছিলেন এবং তিনি বলেন যে অম্ল, তিক্ত ও লবণাক্ত জলের আস্বাদ পাওয়ামাত্র তারা মাথা ঘোরাতে আরম্ভ করে, ক্রমে তাদের নাক, মুখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, অবশেষে তারা কাঁদতে সুরু করে। কিন্তু মিষ্ট জলপানে শিশুগুলির কোনই আপত্তি দেখা যায়নি, বেশ খুশি হয়েই তারা চুষে চুষে জলটুকু তৃপ্তির সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। নবজাত শিশুর সূক্ষ্ম রস আস্বাদনের যে ক্ষমতা থাকে না একথাপরীক্ষিত সত্য। কড মাছের তেল, ক্যাষ্টর অয়েল, অলিভ অয়েল সে সমান আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করে থাকে। কমলা লেবুর রস বা সবজির রসের মধ্যেও যে কোন পার্থক্য বুঝতে পারে তাও নয়। সেইজন্য শৈশব হতেই সব রকমের সুলভ সুপাচ্য খাদ্য তাকে দেওয়া হলে শিশু কোনদিনই খাদ্য সম্বন্ধে বাছ-বিচার করতে ও সুযোগ পাবে না এবং পিতামাতাও ভবিষ্যতে অশেষ বিরক্তি ও দায় হতে রক্ষা পাবেন। জন্মের পরমুহূর্ত্ত হতেই শিশুর তৃষ্ণাবোধ থাকে এবং পরিতৃপ্ত না হলে সে সজোরে কাঁদে। শিশুর ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগ বেশ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পায়—তার উদরের পেশীসমূহে আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ হয়। শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করলেই শিশুপরিচর্য্যা আর আয়াসসাধ্য বলে মনে হবে না। নিয়মিতরূপে খাদ্য ও পানীয় না পেলে শিশুর কষ্ট হয় এবং তার পুষ্টি ব্যাহত হয়। শিশু-শিক্ষালয়ে শিশুদের আহার ও পানীয় গ্রহণের সুব্যবস্থা থাকা উচিত এবং যাতে যথাসময়ে তারা জলপান করে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা শিক্ষিকার অবশ্যকর্ত্তব্য।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়—প্রাণিজগতে পশুদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, এবং এই শক্তির সাহায্যেই তারা আত্মরক্ষা করে থাকে। এইজন্য অনেকেই মনে করে থাকেন যে নবজাত শিশুর অন্যান্য আদিম ক্ষমতা অপেক্ষা ঘ্রাণশক্তি বোধহয়

অধিকতর তীক্ষ্ণ। ক্যানেস্ট্রিনি, টেলর জোন্স প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শিশুর ঘ্রাণশক্তি অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা অধিক প্রখর নয়। জন্মের দুই তিন দিনের মধ্যেই শিশু বিভিন্ন উগ্র গন্ধে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং দুই সপ্তাহের পর সে জননীর শরীরের বিশেষ গন্ধ বুঝতে পারে এবং তাঁর কোল হতে অপরিচিত কারো কোলে গেলে অস্বস্তি-বোধ করে। ছয়মাসের পর গন্ধ সম্বন্ধে তার বিচার ক্ষমতা বেশ সুস্পষ্ট হয় এবং দুই বৎসর হতে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের প্রভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে।

স্পর্শেন্দ্রিয়—ত্বকের সাহায্যে মানুষ স্পর্শানুভূতি লাভ করে। স্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি অনুভব করবার জন্য আমাদের শরীরে বিভিন্ন স্নায়ুমণ্ডলী আছে। নবজাত শিশুর স্পর্শানুভূতি কতদূর তীক্ষ্ণ হয় তা জানবার জন্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বহু শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেছেন। এই সকল পরীক্ষার ফলে তাঁরা মনে করেন যে জন্মাবধিই শিশুর স্পর্শানুভূতির কেন্দ্রগুলি কম-বেশীভাবে কার্য্যকরী থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুর স্পর্শবোধ প্রখর হয়, বিশেষ করে ওষ্ঠ, অঙ্গুলি ও নাসিকাগ্রের দ্বারা শিশুর তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়, এইজন্য স্পর্শশক্তির সমূহ উন্নতি করা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা ভালো যে, এইজন্যই ম্যাদাম মন্তেসরী ইন্দ্রিয়বোধ চর্চ্চাকে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন এবং শিশুশিক্ষায় এর অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে শিশুর প্রধান কাজ হলো ঘুমানো—সাধারণতঃ সে দিনে রাতে ১৮ হতে ২০ ঘণ্টা ঘুমায় কিন্তু বয়স্কদের মত সে এককালীন ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা উপভোগ করে না। শিশু কিছুক্ষণ ঘুমায় তারপরে আহার, পানীয় ও পরিচর্য্যার জন্য জাগে। পরিতৃপ্ত হলে পর অঙ্গ সঞ্চালন ও নানরূপ শব্দের দ্বারা তার তৃপ্তি ও তুষ্টি প্রকাশ করে অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ে। শিশুর নিদ্রা সম্বন্ধে ব্যুহলার (Bühler) ব্যাপকভাবে গবেষণা করেছেন এবং তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ "দি ফার্স্ট ইয়ার অফ লাইফ" (The First Year of Life) পাঠ করলে শিশুর দৈহিক বিশেষত্ব ও আচরণ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানা যাবে।

শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসকগণ মনে করেন যে শিশুর শরীর ও মনের পরিচর্য্যা এবং তুষ্টির উপরেই তার ভবিষ্যতের বহু কার্য্যকারণ নির্ভর করে। এইজন্য শিশুর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে জনক-জননীর গভীর জ্ঞান থাকা নিতান্তই আবশ্যক। শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যাবস্ত্র, আহার-বিহার ও মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদির ব্যবস্থা সর্ব্বদাই সুষ্ঠুভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যিনি শিশু-পরিচর্য্যার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি শান্তচিত্তে, নিষ্ঠা ও স্নেহের সঙ্গে শিশুকে লালন

করবেন একথা বলাই বাহুল্য। জননী বা ধাত্রীর মনে যদি অহেতুক উদ্বেগ থাকে, শিশু তার তীক্ষ্ণ অনুভূতির দ্বারা তাঁর ব্যবহারের পরিবর্তন বুঝতে পারে। ফলে, সে অশান্ত ও আক্রোশপরায়ণ হয়ে ওঠে। প্রাণীজন্ম স্বভাবের নিয়মেই হয়ে থাকে বটে কিন্তু জন্মলাভের পরে শিশু এসে পড়ে এক জটিলতর পরিবেশে—সেই নূতন আবেষ্টনীর সঙ্গে যাতে সে সহজেই সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে, এর জন্য আমাদের সাগ্রহ চিত্তে ও উন্মুখ হৃদয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। যে শিশু এই দুর্গম জীবনযাত্রায় পিতামাতার সস্নেহ নির্দ্দেশ ও সাহায্য পায় তার পরম সৌভাগ্য এবং যে শিশু এই সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত—তার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ বিশেষভাবে ব্যবস্থা করবে এমন আশা করা আজকের সমাজব্যবস্থায় অসঙ্গত নয় বলেই মনে করি।

একটি মানুষের জীবন গঠনে দুটি জিনিষের আবশ্যক—প্রথমতঃ প্রয়োজন তার নিজস্ব শক্তি, দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন সেই শক্তি উদ্বোধনের জন্য অনুকূল পরিবেশ। যে শিশুদের আমরা প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলতে চাই, তারা কিরূপ নিজস্ব শক্তি ও সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, প্রথমে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেইজন্য শিশুর পরিপূর্ণ জীবনধারাকে আলোচনা করতে হবে তার দুইদিক থেকে—প্রথমতঃ হলো শিশুর শরীর, দ্বিতীয়তঃ হলো শিশুর মন। শিশুর মৌলিক ক্ষমতাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে, কিভাবে সেগুলি অনুকূল আবেষ্টনীতে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হলো শিক্ষক, পিতামাতা ও সমাজের বিশেষ দায়িত্ব।

অতীতে মনস্তত্ত্ববিদগণ মনে করতেন যে শিশু কেবল তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জ্ঞান আহরণ করে থাকে। কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলে যে কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দ্বারা নয় কিন্তু শরীরের স্নায়ু, পেশী ও গ্রন্থিসমূহের সাহায্যেও শিশুর জীবনপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। মানবদেহের স্নায়ুপ্রণালী ইন্দ্রিয়সমূহ ও অবয়বগুলির কার্য্যপদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। ব্যবহারের দিক দিয়ে বিচার করলে মানবশরীরকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, যথা :—

(১) **সংযোজক অংশ**—স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্ক এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) **সংগ্রাহক অংশ**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সংগ্রাহক অংশ বলা হয়।

(৩) **সংসাধক অংশ**—যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয় বিশেষ কোন উদ্দীপনাহেতু গ্রন্থিরস নিঃসরণ করে ও প্রতিক্রিয়া দেখায়—সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সংসাধকের কাজ করে।

(১) **সংযোজক অংশ**—বহির্জগতের কোন আবেদন যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটির দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন দেহের সংযোজক অংশ কিম্বা স্নায়ুমণ্ডলী সেই আবেদনটি মস্তিষ্কে পৌছিয়ে দেয়। আবার মস্তিষ্ক হতে সেই আবেদনের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার নির্দ্দেশ বহন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারে পৌছিয়ে দেওয়াও দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। মানুষের স্নায়ুসমূহের কার্য্যাবলী আলোচনাকালে মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী ও কার্য্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

আমাদের মস্তিষ্ক চার ভাগে বিভক্ত যথা :—(১) প্রধানমস্তিষ্ক (Cerebrum), (২) মধ্যমস্তিষ্ক (Cerebellum), (৩) সেতুমস্তিষ্ক (Ponsvarolii) এবং (৪) অধঃমস্তিষ্ক (Medulla oblongata)। ভ্রূযুগলের নিকট হতে আরম্ভ করে ঘাড়ের চুল যেখানে শেষ হয়েছে, তার দুই ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত স্থান জুড়ে মাথার খুলির প্রায় $\frac{7}{8}$ অংশ প্রধানমস্তিষ্ক অধিকার করে আছে। প্রধানমস্তিষ্কের মধ্যে ধূসর ও শ্বেত বর্ণের স্নায়ুস্তর আছে। ধূসর বর্ণের অংশটি উচ্চতর চিন্তাকে পরিচালিত করে। মানুষের বুদ্ধি, চৈতন্য, আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও দেহের ঐচ্ছিক পেশীসমূহকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত করা প্রধানমস্তিষ্কের কাজ। আঘাত ও পতনের ফলে বা বিদ্যুৎ সংস্পৃষ্টে মস্তিষ্কের এই অংশটি নষ্ট হয়ে গেলে, ইন্দ্রিয়জাত শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যই নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে প্রধানমস্তিষ্ক আমাদের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

মস্তিষ্কের নিম্নে, প্রধানমস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে, ঘাড়ের ঠিক উপরে মধ্যমস্তিষ্ক অবস্থিত। এই অংশ আকারে মাঝারী কমলালেবুর মত এবং ধূসর ওশ্বেতবর্ণের স্নায়ুস্তরে আচ্ছন্ন। শরীরের পেশীতন্ত্র যে সকল কাজ করে—তার মধ্যে সমতা রক্ষা করা মধ্যমস্তিষ্কের প্রধান কাজ। শরীরের ভারকেন্দ্র রক্ষা করা, স্থিরভাবে চলাফেরার কাজে সহায়তা করাও এই অংশের বিশেষ দায়িত্ব। মস্তিষ্কের এই অংশ অসুস্থ হলে হাত পা কাঁপে এবং বারবার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রধানমস্তিষ্ক ও মধ্যমস্তিষ্কের মধ্যে সেতুমস্তিষ্ক অবস্থিত। আমাদের দেহের স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ডের সাহায্যে সেতুমস্তিষ্কে এসে পৌছায় এবং এখানেই প্রস্থে বিস্তৃত হয়ে মস্তিষ্ককে সজাগ রাখে। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশের মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজই সেতুমস্তিষ্কের দায়িত্ব।

অধঃমস্তিষ্ক প্রকৃতপক্ষে মেরুমজ্জার ঊর্দ্ধভাগ মাত্র। মস্তিষ্কের ঠিক নীচেই এই ভাগ অবস্থিত এবং ক্রমে মেরুমজ্জায় পর্য্যবসিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, নাড়ী ও পেশীসমূহের উপরে অধঃমস্তিষ্কের প্রভাব এত অধিক যে এই অংশটি বিকৃত হলে প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধঃমস্তিষ্ক ক্রমশঃ সরু হয়ে মেরুমজ্জারূপে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বিংশতম মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই

মেরুমজ্জা হতে ৩১টি স্নায়ুগুচ্ছ মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দিক হতে বার হয়েছে। এইগুলিকে স্পাইনাল নার্ভ (Spinal nerve) বলা হয়। প্রত্যেক স্পাইনাল নার্ভের ছুটি করে মূল (root) আছে। একটি মূল মেরুমজ্জার সম্মুখ হতে, অপরটি পশ্চাৎ হতে নির্গত হয়ে আবার পরস্পর মিলিত হয়েছে। এই মূল হতে বহির্গত যে স্নায়ুমণ্ডলী—এগুলিকে স্নায়ুগুচ্ছ বলা হয়। মেরুদণ্ড হতে স্নায়ুগুচ্ছগুলি শতধা বিভক্ত হয়ে শাখা, প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে যায় এবং ইন্দ্রিয়স্থান, পেশীতন্তু, ত্বক প্রভৃতি শরীরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে দেহের দূরতম অংশের সংযোগ স্থাপন করে। শরীরের মধ্যে কেবল উপত্বক, উপাস্থি, নখ ও চুলে স্নায়ুসূত্র নাই, এইজন্যই চুল বা নখ কাটলে যন্ত্রণাবোধ হয় না।

মানবদেহের কর্ম্মক্ষমতার দিক হতে স্নায়ুমণ্ডলীর গুরুত্ব অসীম। বহির্জগতের অসংখ্য শক্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত হতে যে সকল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়ে থাকে সেই সকলের সংবাদ বহন করে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়ার ভার এই স্নায়ুগুলির উপরে। জ্ঞানবহা স্নায়ুসমূহ বহির্জগতের উদ্দীপনার সংবাদ মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। সেইজন্য এই জাতীয় স্নায়ুগুলিকে অন্তর্মুখী (afferent) স্নায়ুবন্ধন বলা হয়। যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্কের নির্দ্দেশ কর্ম্মেন্দ্রিয়ে পৌছিয়ে দিয়ে শরীরের সংসাধক অংশের দ্বারা কাজ করায়, তাদের কর্ম্মবহা ও বহির্মুখী নাড়ী (efferent) বলা হয়। এইগুলি ভিন্ন আর এক শ্রেণীর স্নায়ু আছে তাদের সংবেদনশীল স্নায়ু (Sympathetic nerves) বলে। এই সংবেদনশীল স্নায়ুগুলি পশ্চাদভাগে রক্ষিত সৈন্যের মত কাজ করে। বিপদের সময়ে সক্রিয় হয়ে এগুলি দেহরাজ্যকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করে। একই স্নায়ু সংগ্রাহক ও সংসাধকের কাজে নিয়োজিত হয় না। ছুই প্রকার কাজের জন্য ছুইটি বিভিন্ন স্নায়ুপ্রণালী আছে। শব্দ, গন্ধ, রূপ ও সৌন্দর্য্যানুভূতির জন্য আরও বহুবিধ স্নায়ু আমাদের শরীরে বিদ্যমান। এই স্নায়ুগুলির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেহের সমুদয় যন্ত্র পরিচালিত হয়। আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিচালনার জন্য স্নায়ুগুলিকে সারাদিন কর্ম্মব্যস্ত থাকতে হয়, কেবল রাত্রে নিদ্রার সময়ে তারা বিশ্রামলাভ করে। এই বিশ্রামে ক্লান্তি দূরীভূত হয়ে শরীর ও মন সতেজ হয়ে ওঠে। এইজন্য শিশুর সুনিদ্রার যেন কখনও ব্যাঘাত না ঘটে বা শরীর ও মন অতিরিক্ত ক্লান্ত না হয়ে পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(২) **সংগ্রাহক অংশ**—পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় আমাদের অনুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান আহরণের দ্বার-স্বরূপ। বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করে এরাই স্নায়ুর সাহায্যে মেরুদণ্ডস্থ

স্নায়ুরজ্জুতে পৌঁছে দেয় এবং মেরুদণ্ড হতে নিমেষেই সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। জন্মকালে কোন্ কোন্ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় সুপরিণত থাকে এ সম্বন্ধে এখনও ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে। তবে নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে জন্মমুহূর্ত্তে শিশুর প্রত্যেক সংগ্রাহক অংশ এতদূর সুপুষ্ট থাকে যাতে সে নূতন পরিবেশের সঙ্গে স্বচ্ছন্দেই সামঞ্জস্যবিধান করে নিতে পারে। ক্রমে ব্যবহার ও অভ্যাসের দ্বারা সেগুলির কর্ম্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই শিশুশিক্ষাবিদ্‌গণ ইন্দ্রিয়সঞ্জাত ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে থাকেন।

(৩) **সংসাধক অংশ**—মাংসপেশী ও গ্রন্থিসমূহকে সংসাধক অ্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, কেননা তারাই মানবদেহের কর্ম্মেন্দ্রিয়। মাংসপেশী দুই প্রকার—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। শিরা, ধমনী, পাকস্থলী, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র, প্রজননযন্ত্রের মাংসপেশীসকল অনৈচ্ছিক অর্থাৎ শরীর সুস্থ থাকলে সকল অবস্থাতেই এই অংশগুলি ক্রিয়াশীল থাকে। শত চেষ্টাতেও আমরা এই পেশীগুলির কাজ নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। এতদ্ভিন্ন শরীরের অন্যান্য পেশীসকল ঐচ্ছিক, আমরা ইচ্ছামত সেগুলি চালনা করতে পারি।

দেহের গ্রন্থিসমূহও মানবদেহের সংসাধক অংশ। এই গ্রন্থিগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি গ্রন্থি নলপথে বাহ্যিক রস নিঃসরণ করে বলে তাদের নলযুক্ত গ্রন্থি (duct glands) বলে। লালাস্রাবী গ্রন্থি, ক্ষারস্রাবী গ্রন্থি, স্বেদ গ্রন্থি, প্রজনন গ্রন্থি, প্লীহা, যকৃত, মূত্রাশয় প্রভৃতি নলযুক্ত। অপর গ্রন্থিগুলির বিশেষ কোন নলপথ নাই। ইহারা দেহাভ্যন্তরে রস সঞ্চারিত করে থাকে। এইজন্য এইগুলিকে নলহীন গ্রন্থি (ductless glands) বলা হয়। ইন্দ্রিগ্রন্থি (Thyroid), উপেন্দ্রগ্রন্থি (Para thyroid), মঙ্গলগ্রন্থি (Thymus) দেবক্ষগ্রন্থি (Pineal) সূর্য্যগ্রন্থি (Pituitary), শিবসতীগ্রন্থি (Adrenal), শুক্রগ্রন্থি (Gonads), অগ্নিগ্রন্থি (Pancreas) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থিগুলির অন্তর্মুখী রসসৃষ্টির ক্ষমতা আছে এবং সেই রস রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে দেহ-মন গঠন ও সংরক্ষণের কাজে ব্যাপৃত থাকে। দেহের সমুদয় গ্রন্থিই পরস্পরের সহযোগিতায় দৈহিক ও মানসিক জীবন গঠনে আত্মনিয়োগ করে।

এই অন্তর্মুখী রসনিঃসরণকারী গ্রন্থিসমূহ সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এই সকল গ্রন্থির প্রভাব অতি প্রগাঢ়। সেইজন্য গ্রন্থিগুলির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে শিশুশিক্ষকের প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে শিশুর শিক্ষাবিধানে বিচক্ষণ ব্যবস্থা করা সহজ হয়ে উঠবে।

সূর্য্যগ্রন্থি (Pituitary) পিটুইটারী গ্রন্থি দুটি দেখতে অনেকটা ছোট মটরদানার মত। মাথার খুলির নীচে একটি ফাঁপা নল আছে, তারই উপরে এ দুটি অবস্থিত। এই গ্রন্থির রসক্ষরণের উপরে মানবদেহের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে এইজন্য এদের মূলগ্রন্থি বলা হয়। (৩) কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় পিটুইটারী গ্রন্থির সামনের অংশটি (Posterior) রুগ্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেহের উত্তাপ কমে যায়, হাত পা টলে, শরীর শুকিয়ে যায় এবং পেটের অসুখ চলে। অধিক রস-ক্ষরণ হলে শিশু ক্রমে দৈত্যের ন্যায় অদ্ভুত আকার ধারণ করে, এবং রসের অত্যল্পতায় খর্ব্বাকৃতি বামনে (midget) পরিণত হয়। তবে "বামন"দের দেহ "ক্রেটিন"দের (Cretin) মত রুক্ষ হয় না, বুদ্ধিও সাধারণ লোক হতে কম হয় না। (৪) এই গ্রন্থির পিছনের অংশটি (Anterior) দেহের পেশীগুলির সতেজভাব রক্ষা করে এবং মূত্রাশয়, স্তন্যস্রাবী গ্রন্থি (mammary glands) ও জরায়ুর (uterus) উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ইন্দ্রগ্রন্থি (Thyroid) এই গ্রন্থির দুটি অংশ গলার সম্মুখভাগে আমাদের যে স্বরোৎপাদক যন্ত্র (larynx) রয়েছে তার এবং শ্বাসনালীর (windpipe) দুই পাশে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে অল্প বয়সে থাইরয়েড গ্রন্থি অসুস্থ হলে শিশুর বিকাশ ব্যাহত হয়। শিশুর মাথার চুল উঠে যায় এবং ত্বকের মসৃণতা নষ্ট হয়ে যায়। এক জাতীয় খর্ব্বাকৃতি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। এই রোগকে ক্রেটিন (Cretin) বলে। শিশু যদি বয়সের অনুপাতে অত্যন্ত বিলম্বে কথা বলে বা চলতে সুরু করে, তবে শিক্ষক তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করবেন, কেননা সচরাচর দেখা যায় যে থাইরয়েড গ্রন্থির নিঃসরণের স্বল্পতাহেতু শিশুর বৃদ্ধির হার বিলম্বিত হয়ে পড়ে। থাইরয়েড রসের প্রাবল্যে হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুততর হয়, মনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। চক্ষু তারকা বড় হয়ে কখন কখনও কোটরের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং অনিদ্রার লক্ষণ প্রকাশ পায়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ক্রমে গলগণ্ড (Goitre) রোগ দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আমাদের শরীর ও মনের উপরে অতি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এগুলি অধিক ক্রিয়াশীল হলেও ক্ষতি, স্বল্প হলেও তদ্রূপ। থাইরয়েডের রসক্ষরণের স্বল্পতাজনিত

---

(৩) "The master gland"—Educational Psychology P. 75 Sandiford.

(৪) Human Physiology P. 146. K. Walker.

ব্যাধিগুলি দুশ্চিকিৎস্য নয়। রসক্ষরণের আধিক্যহেতু ব্যাধিতে, আইয়োডিন (Potassium Iodide) ঘটিত ঔষধ সেবনে ব্যাধি নিবারিত হতে পারে।

উপেন্দ্রগ্রন্থি (Parathyroid) এই গ্রন্থি সংখ্যায় চারিটি, ওজনে সর্ব্বশুদ্ধ দুই গ্রেণ (প্রায় ১ রতি) এবং থাইরয়েড গ্রন্থির নিকটেই অবস্থিত। শরীরের মধ্যে ক্যালসিয়ামের (Calcium) মাত্রা ঠিক রাখা এই গ্রন্থি চারিটির প্রধান কাজ। ক্যালসিয়ামের মাত্রা কম হলে দেহের উত্তাপ কমে যায়, হাত পা কাঁপতে থাকে এবং শরীরে শক্তি হ্রাস পায়। এই অবস্থায় দেখা যায় যে ছেলেমেয়েরা কথার অবাধ্য হয়ে ওঠে, অযথা ভয় পায় এবং অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে তাল রেখে কাজকর্ম্ম করতে পারে না। উপেন্দ্রগ্রন্থির রসক্ষরণে দেহের ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয় এবং দন্ত ও অস্থি পুষ্টিলাভ করে।

শিবসতীগ্রন্থি (Adrenal) অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি দুটি মূত্রাশয়ের (Kidney) উপরে অবস্থিত। মানুষের সর্ব্বপ্রকাব জৈব পরিণতির উপরে এই গ্রন্থিদ্বয়ের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। শিশুর দেহে যদি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি অধিক রসক্ষরণ করে তাহলে শিশু ৭।৮ বৎসরেই পূর্ণবয়স্ক মানুষের আকার ধারণ করে এবং তার ফল অত্যন্ত দুঃখময়। উপযুক্ত রসক্ষরণে শরীরে রক্তের চাপ (blood pressure) সুনিয়ন্ত্রিত হয়, কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিপদ আপদ বা যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে অ্যাড্রেনালিন রস শরীরে অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হয়ে দেহে শর্করা বৃদ্ধি করে। ফলে, ফুসফুসের কাজ বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষিপ্রতা দুঃসাহসিকতা ও আত্মরক্ষায় জীব তৎপর হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্র গতিবিধিকালে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং এই তাপমাত্রার সমতা রক্ষিত না হলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অ্যাড্রেনালিন রসের ক্ষমতাবলে ঘর্ম্মগ্রন্থিগুলি খুলে যায় এবং দেহের শ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ ক্রমে দূরীভূত হয়।

মঙ্গল ও দেবক্ষ গ্রন্থি (Thymus & Pineal glands) এই গ্রন্থিগুলির সাহায্যে শিশুর দেহের নিয়মিত বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হয়। শিশু যৌবনে পদার্পণ করামাত্র এগুলি শুষ্ক হয়ে যায়। এগুলির যথাযথ রসক্ষরণ না হলে বালকবালিকাদের মধ্যে নানা অকালপক্ব আচরণ দেখা যায় কিম্বা উপযুক্ত বয়স হলেও যৌবনোদ্গম হয় না।

গ্রন্থিসমূহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে পিতামাতা ও শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। রসস্রাবী গ্রন্থিতত্ত্ব (Endocrinology) অতি জটিল; এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির মতামত সহজে গ্রহণ করা উচিত নয়। এই গ্রন্থিগুলি হতে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম হর্মোন (Hormones), এদের সম্পর্কে

আমাদের জ্ঞান খুব বেশী দিনের নয়। জানা গেছে যে এদের ক্রিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা শাসিত নয় বটে কিন্তু এরা নানা দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে অবিরতভাবে একটি সমন্বয় রক্ষা করে বলে এদের গুরুত্ব এত অধিক। খাদ্যবিজ্ঞানে খাদ্যপ্রাণ (Vitamins) এর আবিষ্কার যেমন যুগান্তকারী, দেহবিজ্ঞানে হর্মোন (Hormones) এর আবিষ্কারও তেমন বিস্ময়কর। অন্তর্মুখী গ্রন্থিগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং তাদের ক্ষরণের পরিমাণও নগণ্য কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ক্ষরিত রসের প্রভাব অসামান্য। এইজন্য শিক্ষাতত্ত্বে দেহবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে চলবে না।

মানবদেহের ভিতরে নিরন্তর যে কর্ম্মপ্রবাহ জীবনের পরিচয় বহন করে তার উপরে গ্রন্থিসমূহের প্রভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হলো, তার দুটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে শিশুর দেহে বা মনে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেলে তৎক্ষণাৎ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে শরীর ও মনের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য দেহের সমুদয় গ্রন্থি একযোগে কাজ করে। যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানেই শিশুর দেহ ও মন দুইই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য ও পানীয়ের পরিবর্ত্তনের ফলে শরীর নিরাময় হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার উপযুক্ত ব্যায়ামাদির দ্বারা রোগশান্তি হয়ে থাকে। সেইজন্য গ্রন্থিসমূহের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পিতামাতা ও শিক্ষকগণের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক কিন্তু সেই সামান্য জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে শিশুর চিকিৎসার ভার নেওয়া যে নিতান্তই ধৃষ্টতা, এ কথা বলাই বাহুল্য।

শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির মধ্যে একটি পরিপূর্ণ ও নিয়মিত ছন্দ আছে। শিশুদের সহজ আচরণ ও বৃদ্ধির ছন্দগুলি পর্য্যবেক্ষণ করে প্রত্যেক বয়সের শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে একটি মান (norm) স্থির করেছেন বৈজ্ঞানিকগণ। মনে রাখতে হবে যে এই মানদণ্ডটি শিক্ষককে নানাভাবে সাহায্য করে মাত্র। প্রত্যেক শিশুকেই যে এই মান অনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে হবে এমন কোন কথা নাই, তবে মান অপেক্ষা শিশুর বৃদ্ধির হার যদি অনেক কম হয় তাহলে জানতে হবে যে অন্যান্য শিশু অপেক্ষা শিশুটির বৃদ্ধি বিলম্বিত হচ্ছে এবং অন্যপক্ষে যদি বৃদ্ধির হার অধিক হয় তাহলে সে যে অস্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলেছে সে কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। জীবনপ্রবাহের ধারাকে প্রয়োজনমত যেমন খুশি কালের বন্ধনে ফেলে ভাগ করা যায় না। জীবনের প্রত্যেক স্তরের যথাযথ পরিণতি হয় তার নিজের নিয়মে, বাইরের পঞ্জিকার বা মনোবিজ্ঞানীর মানদণ্ডের অপেক্ষায় সে বসে থাকে না।

তবে নিয়মিত ছন্দের যে ধারা অভিজ্ঞ মানব মেনে নিয়েছে, তার পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটলে জানতে হবে যে জীবন-প্রবাহে কোথাও কোন অঘটন ঘটেছে, এবং তখনই প্রয়োজন এমন কুশলী বিশেষজ্ঞের, যাঁর সাহায্যে জীবনের ধারাকে আবার নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা যাবে।

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশবৃদ্ধি সম্পর্কে একটি বিশ্ববিশ্রুত গবেষণা করেছেন কেলগ-দম্পতী (Kellog)। "দি এপ অ্যাণ্ড দি চাইল্ড" (The Ape and the Child) গ্রন্থটি পাঠ করলে শিশুর ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্বন্ধে কত যে তথ্য পাওয়া যাবে তার ইয়ত্তা নাই। তাঁদের সন্তান ডনাল্ড (Donald) যখন দশমাস বয়সের, তখন তাঁরা একটি সাড়ে সাত মাসের শিম্পাঞ্জীকে বাড়িতে পালন করতে সুরু করেন। শিম্পাঞ্জীটির নামকরণ হলো "গুয়া"। কেলগদম্পতী নয়মাস ধরে ডনাল্ড ও গুয়ার দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বৃদ্ধি ও বিকাশের হার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এই প্রথম নয় মাস গুয়া ডনাল্ড অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়। মানবশিশু মাত্র ১৯% ওজনে বাড়ে কিন্তু পশুশিশু ৮৯% হারে বৃদ্ধি পায়। এই নয় মাসে ডনাল্ড ১০% লম্বা হয়েছিল, শিম্পাঞ্জী ১৭% লম্বা হয় সেই একই সময়ে। "গুয়ার" বৃদ্ধির হার অধিক হওয়াতে তার পেশীসমূহ দ্রুতগতিতে পরিণতি লাভ করে। সে এক বৎসর এক মাস পূর্ণ হতেই চামচ দিয়ে খাবার খেতে পারতো, এবং স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে নানারূপ কৌতুকপ্রদ খেলাধূলাও করতো। এই সব কোন বিষয়েই ডনাল্ড তখনও সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হতে পারে নি। নয়মাস পরে দেখা গেল যে "গুয়া" তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ডনাল্ডের দেহের ও মনের বিকাশগতি তখনও ক্রমোন্নতির পথে।

ম্যাকগ্র (Myrtle McGraw) দুটি যমজ শিশুকে জন্ম হতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পালন করেন। একটিকে তিনি নানাভাবে কলাকৌশল শিক্ষা দেন, অন্যটিকে কোন অভ্যাসে আবদ্ধ করেন নি। প্রথম শিশুটি দুই বৎসর বয়সেই নানারূপ কৌশল আয়ত্ত করে সকলকে তার নৈপুণ্যে মুগ্ধ করে দিতো এমনকি, রোলার স্কেটস্ (Roller Skates) পায়ে দিয়ে রীতিমত দৌড়ে বেড়াতো। দুই বৎসর পূর্ণ হলে দুটি শিশুকেই একটি বিশেষ কৌশল শেখানো হলো। প্রথমটি সামান্য আগে কৌশলটি আয়ত্ত করলো বটে কিন্তু দ্বিতীয়টিও প্রায় সমান ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই কৌশলটি শিখে ফেললো। দেখা গেল যে প্রথমটি দুই বৎসর ধরে নানা অভ্যাসের ফলেও বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারে নি।

এই সকল নানা গবেষণার ফলাফল দেখে বেশ সুস্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রত্যেক শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত

বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে। শরীর ও মন সুস্থ থাকলে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুঅভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী জীবনের পথে এগিয়ে দেওয়া সহজ। জীবনের অতি প্রাক্কালে তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজে বা শিক্ষার ভারে তাকে জর্জ্জরিত করে তুলে কোনই সুফল পাওয়া যায় না। শিশুজীবনের মৌলিক ক্ষমতাগুলির সঙ্গে যদি প্রত্যেক পিতামাতা ও শিক্ষকের পরিচয় ঘটে তবেই শিশুর শক্তি ও সময়ের অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হবে। নিজস্ব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সুসঙ্গত ও সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে যাতে শিশুর দেহ ও মনের সুষম বিকাশ ঘটতে পারে তারই আয়োজন করবার দিন আজ এসেছে এবং তারই জন্য আজ পিতামাতা, শিক্ষক, চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিককে একযোগে শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করে তার দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষাবিধির প্রবর্ত্তন করতে হবে।

গ্রন্থসূচী :—

Norman L. Munn—Psychology.

Margaret Drummond—The Dawn of Mind.

Charlotte Bühler—The First Year of Life.

Arnold L. Gesell—Infant Behaviour.

Evelyn Dewey—Behaviour Development in Infants.

C. Skinner & P. L. Harriman—Child Psychology.

Martha May Reynolds—Children from Seed to Saplings.

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুর মানসিক সম্পদ

শিশুর মানসিক সম্পদ

যে পূর্ণতম জীবনযাপনের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকগণ শিশুকে প্রস্তুত করতে চান, সেই জীবনের ভিত্তি হলো তার জন্মলব্ধ অনর্জ্জিত ক্ষমতাগুলি। মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক সহজাত ক্ষমতাগুলিকে মনস্তত্ত্ববিদগণতার মৌলিক মূলধন বলে স্বীকার করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য এই ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা:—(১) দৈহিক অনর্জ্জিত ক্ষমতা এবং (২) মানসিক অনর্জ্জিত ক্ষমতা। শিশুর দৈহিক ক্ষমতা ও বিকাশবৃদ্ধি সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে; এখন তার মানসিক শক্তির মূলধন কি তাই আমাদের বিবেচনার বিষয়। কেননা, প্রত্যেক শিশুর শক্তি, বুদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্ভাব্যতা অনুসারে তার যথাযথ বিকাশসাধন করাই হলো ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কোন্ কোন্ সহজাত প্রবৃত্তির কখন উন্মেষ হয় এবং কি ভাবেই বা সেগুলি বিকশিত হয়—কি ভাবে তাদের পরিবর্দ্ধন, পরিমার্জ্জন, দমন বা সংস্কার সম্ভব, এই সকল তথ্য পিতামাতা ও শিক্ষকের রীতিমত জানা থাকলে শিশুর জীবনকে সংযত, সুন্দর ও সুসংহত করে তোলা তাঁদের পক্ষে সহজ হবে।

যে দুইটি বিশেষ মূলধন নিয়ে নবজাত জীবশিশু তার দুর্গম জীবনযাত্রা সুরু করে, তার একটি হলো সংরক্ষণ প্রয়াস (Mneme) এবং অন্যটি হলো জীবন-প্রয়াস (Horme)। সংরক্ষণ-প্রয়াস ফলে শিশু অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে বর্ত্তমান কালের ব্যবহারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং বর্ত্তমানকালের অভিজ্ঞতার দ্বারা তার ভাবী আচরণাদি কিরূপ হবে, তা স্থির করে থাকে। জীবন-প্রয়াসের দ্বারা শিশু কর্ম্মোদ্যত হয় এবং জ্ঞাতসারেই হোক, কি অজ্ঞাতসারেই হোক সে জীবনধারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে এই দুইটি প্রয়াসের প্রভাব অমোঘ। তারা সম্পূর্ণ অন্ধভাবেই সংরক্ষণ ও জীবন-প্রয়াসের সাহায্যে প্রাণধারণ করে, যথা:—নবজাত সর্পশিশু নেউল দেখলেই প্রাণভয়ে পলায়ন করে। এতেই বোঝা যায় যে, জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই যখন অর্জ্জিত হয় নি, তখনও তারা যেন কতকগুলি বিশিষ্ট ক্ষমতার সাহায্যেই জীবন-পরিক্রমা সুরু করেছে। এই সকল স্বয়ংসিদ্ধ আচরণগুলিকেই মনস্তত্ত্ববিদগণ সহজাত প্রবৃত্তি (Instincts) নামে অভিহিত করেন।

মানবশিশুও যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি থাকে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের ফলেই তার চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয়। ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হতে আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং, জন্মের পর সে অনেকদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র তার অনর্জ্জিত ক্ষমতাগুলির উপরেই নির্ভর করে আত্মরক্ষা

করে। ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বাভ্যাসের সাহায্য না নিয়ে, চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার না করে যে কাজগুলি সে এতদিন করেছে সেগুলি এখন বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এইভাবেই তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়ে ওঠে। মানবেতর প্রাণীরা বুদ্ধির সাহায্যে তাদের আচরণ সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। এইজন্যই তাদের প্রত্যেক কর্ম্মপ্রেরণার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় স্থির নির্দ্দিষ্ট ধারাবাহিক গতিতে। মানবশিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির পরিচয় দেয় এবং নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বিচিত্র আচরণের দ্বারা আত্মসত্তা প্রকাশ করে।

এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষানিরপেক্ষ এবং বংশানুবর্ত্তনে প্রাপ্ত। শিশু পিতামাতার নিকট হতে যে স্নায়ুপ্রণালী উত্তরাধিকারসূত্রে পায় সেগুলি পূর্ব্বপুরুষদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এক নির্দ্দিষ্ট আকারে গঠিত হয়েছে, এবং নির্দ্দিষ্ট উত্তেজনার নির্দ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে স্নায়ুপথগুলি এমন একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে যে বংশপরম্পরায় তাদের স্বরূপ আর পরিবর্ত্তিত হয় না। স্নায়ুপ্রণালীর এই স্বাভাবিক ও স্বক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়াগুলিকেই সহজ প্রবৃত্তি বলা যায়।

সহজাত প্রবৃত্তিগুলি সংখ্যায় কত, মানুষের আচরণের মধ্যে কোন্‌গুলি সম্পূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তিসম্ভূত এ সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিকগণের মধ্যে বহু মত প্রচলিত। যেমন, ট্যান্‌স্‌লি (Tansley) বলেন সহজাত প্রবৃত্তি মুখ্যতঃ তিনটি মাত্র—আত্ম প্রবৃত্তি (Ego-instinct), দল প্রবৃত্তি (Herd-instinct) এবং যৌন প্রবৃত্তি (Sex-instinct)। ট্যান্‌স্‌লির মতে মানুষের সমস্ত আচরণ এই তিনটি সহজ প্রবৃত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মনোবিকলন-বাদিগণ (Psycho-analysts) কেবল দুটিমাত্র সহজ প্রবৃত্তি স্বীকার করেন যথা—আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা।

থর্নডাইক (Thorndike) প্রভৃতি ব্যবহারবাদিগণ সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চক্ষে দেখেছেন। তাঁরা বলেন খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা হলো মানুষের একটি বিশেষ আচরণ। এই বিশেষ আচরণের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করা, খাদ্য মুখে দেওয়া, গলাধঃকরণ করা, সঞ্চয় করা, আবাসপ্রিয়তা (domesticity) প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্রোধ, ভয়, যোধন ইচ্ছাগুলিকে গোষ্ঠিভূত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, অন্য মানুষের ব্যবহারের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়াগত আচরণগুলিও আত্মরক্ষার আর একটি উপায়। যেমন, পিতামাতার প্রতি সমুচিত ব্যবহার, দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি, মনোযোগলাভের চেষ্টা, প্রশংসা, ঘৃণা, প্রভুত্ব করবার বা বশ্যতা স্বীকারের প্রবৃত্তি, আত্মপ্রদর্শন, লজ্জা, আত্মবোধমূলক ব্যবহার

(Self-consciousness), স্ত্রী পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, লোভ, ঈর্ষা, দয়া, অনুকরণ, নিজস্ববোধ, যন্ত্রণা দেওয়ার প্রবৃত্তি এই দলে পড়ে।

তৃতীয়তঃ কতকগুলি সাধারণ ও সামান্য শারীরিক গতি ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারাও মানুষ আত্মরক্ষা করে, যেমন—কথা বলা, পর্য্যবেক্ষণ করা, হাত দিয়ে ধরা, ঔৎসুক্য প্রকাশ করা, খেলা ইত্যাদি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া।

কোন কোন বিজ্ঞানী আবার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ দেহগত যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে মনে করেছেন! তাঁরা বলেন যে একমাত্র জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই এই ক্ষমতাগুলির প্রয়োজন। এই দলের মধ্যে আছেন জেমস, স্যাণ্ডিফোর্ড ও ওয়াট্‌সন (Wm. James, Sandiford, Watson)। এঁরা অত্যন্ত গোঁড়া ব্যবহারবাদী। এঁদের মতে সহজাত প্রবৃত্তি বলে জীবের কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। জন্মকালে শিশুর কতকগুলি কার্য্যক্ষমতা থাকে মাত্র, যার সাহায্যে, সে শৈশবে তার প্রাণধারণের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে পারে। এই কার্য্যক্ষমতাগুলিকে ইংরাজিতে রিফ্লেক্স্ (reflex) বলা হয়েছে। যেমন, হয়তো গভীর চিন্তায় মগ্ন, এমন সময়ে হাতে চায়ের গরম পেয়ালার স্পর্শেই অধ্যাপক মহাশয় হাতটি সরিয়ে নিলেন। এটি তাঁর রিফ্লেক্স্ (reflex) বা প্রত্যাবর্ত্তক প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ পিঠ চুলকে উঠলো, কি গায়ে মাছি বসলে সরিয়ে দেওয়া সবই এই পর্য্যায়ে পড়ে। চক্ষুর নিমিষই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও ক্ষণস্থায়ী প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতা।

পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মানুষের বহু আচরণ, বহু ক্ষমতা বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা রঞ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই, এই ক্ষমতাগুলির কোন্ অংশ সহজাত এবং কোন্ অংশ শিক্ষার দ্বারা প্রভাবান্বিত তা সঠিক বলা যায় না। এইজন্যই ওয়াট্‌সন মানবশিশুর জন্মগত বিশিষ্ট ক্ষমতাগুলিকে সহজাত বলে স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন, "নানা ঘটনা পর্য্যালোচনা করলে আমাদের মানতেই হবে যে, শিশুদের মধ্যে এই ধরনের ব্যবহারাদি গড়ে ওঠে পিতা-মাতার প্রভাবের দ্বারা কিম্বা যে পরিবেশে সে বড় হয় তারই প্রভাব বশে। এইরূপ আচরণ সহজাত প্রবৃত্তিসম্ভূত নয়। পরবর্তী জীবনে যে ব্যবহারাদি প্রকাশ পাবে সেগুলি অতি শৈশবেই আমাদের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে।" (১)

(১) "We are forced to believe, from the study of facts, that all these forms of behaviour are built in by the parents and by the environment in which the parent allows the child to grow up. There are no instincts. We build in at an early age everything that is later to appear." Psychological Care of Infant and Child, P. 23. J. B. Watson.

তাঁর মতসিদ্ধ প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতাগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :—

১। হাঁচি
২। হিক্কা
৩। ক্রন্দন
৪। লিঙ্গোদ্রেক
৫। মূত্রত্যাগ
৬। মলত্যাগ
৭। দৃষ্টি সংগঠন
৮। মস্তক সঞ্চালন
৯। মৃদু হাসি
১০। সাহায্য পেয়ে মাথা সোজা রাখবার ক্ষমতা
১১। আঁকড়বার ক্ষমতা
১২। বাহু সঞ্চালন
১৩। পদ সঞ্চালন
১৪। দেহকাণ্ডের সঞ্চালন
১৫। আহার ক্ষমতা
১৬। হামাগুড়ি দেওয়ার ক্ষমতা
১৭। দাঁড়ান ও হাঁটার ক্ষমতা
১৮। কণ্ঠধ্বনির ক্ষমতা
১৯। চোখের পাতা ফেলার ক্ষমতা।

ওয়াট্সন বলেন সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আর কিছুই নয় কেবল উপযুক্ত উদ্দীপনাহেতু কতকগুলি সুস্পষ্ট প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতার প্রকাশ মাত্র। (২) এই মত সকলে গ্রহণ করেন নি, কেননা প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতা ও সহজাত প্রকৃতির মধ্যে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতাগুলি কেবলমাত্র বাহ্য উদ্দীপকের সাহায্যেই উত্তেজিত হয়ে থাকে। সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ক্ষেত্রে বাহ্য উদ্দীপক (External Stimulus) থাকতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে একটি অস্বস্তিজনক অনুভূতিও থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, দেহযন্ত্রের যে কোন একটি অংশ উত্তেজিত হলে প্রত্যাবর্ত্তক কাজগুলি দেখা যায় কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সমগ্র দেহের, অন্ততঃপক্ষে তার একটি বৃহৎ অংশের সম্বন্ধ দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ প্রত্যাবর্ত্তক প্রক্রিয়াগুলি সরল ও মৌলিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরিবর্ত্তন ঘটে কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়াগুলি জটিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিবর্ত্তনীয়।

চতুর্থতঃ, দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশের কল্যাণের জন্য প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়াগুলি প্রয়োজনীয় কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উপরে সমগ্র জীবদেহের মঙ্গল নির্ভর করে। (৩)

---

(২) "They are a combination of explicit congenital responses unfolding serially under appropriate stimulation." Psychology from the Standpoint of a Behaviourist P. 231. J. B. Watson.

(৩) "Winking the eye or jerking away the hand to protect only the eye and hand, while taking food benefits not the mouth but the whole body and running saves not merely the legs but the whole animal from danger." Fundamentals of Child Study P. 34—Kirkpatrick.

পণ্ডিতগণের নানা বিরুদ্ধ মত থাকা সত্ত্বেও সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীরভাবে গবেষণা করেছেন ম্যাকডুগাল (William McDougall)। তিনি বলেন যে, একটি বিশিষ্ট ঘটনাক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ করবার যে সবিশেষ ক্ষমতা প্রাণীদিগের মধ্যে দেখা যায়, তার মূল উৎস সহজাত প্রবৃত্তিগুলিতেই নিহিত আছে। তাই তিনি সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—"যে স্বাভাবিক ক্ষমতার দ্বারা জীব কোন বিশেষ বস্তুকে লক্ষ্য করে, তার উপস্থিতিতে একটি বিশেষ প্রকার আনুভূতিক উত্তেজনা বোধ করে এবং সেই বিশেষ বস্তু সম্পর্কে বিশেষ ধরনের ব্যবহার করতে প্রেরণা পায়, সেই স্বাভাবিক ক্ষমতাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে।" (৪)

ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তিগুলি সংখ্যায় চৌদ্দটি এবং বিশেষ উদ্দীপনার ফলে বিশেষ বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তি সাড়া দেয়। এই প্রবৃত্তিগুলির দুটি দিক আছে—একটি অনুভূতির দিক এবং অন্যটি প্রতিক্রিয়ার দিক। কোন বিশেষ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হলে আমাদের মনে প্রথমে একটি বিশেষ অনুভূতি জেগে ওঠে, এবং পরে সেই অনুভূতিসঞ্জাত যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতেই আমরা কর্ম্মোদ্যত হয়ে থাকি। অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে চেতনা, আবেগ ও ইচ্ছা (Cognition, Emotion and Conation) এই তিনেরই চিহ্ন বর্ত্তমান।

সহজাত প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কি তাও জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীর মতে:—

(১) এগুলি শিক্ষার ফল নয় যেমন, মাছকে কেউ সাঁতার দিতে শেখায় না, কিম্বা পাখীকে কেউ বাসা বাঁধতে শেখায় না।

(২) প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর দৈহিক গঠনের উপরে নির্ভর করে। হাঁসের পায়ের গঠন ও সারসের পায়ের গঠনে অনেক পার্থক্য আছে, তাই তাদের আচরণেও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। গঠনজনিত বিভিন্নতা সম্পূর্ণ জন্মগত।

(৩) সহজাত প্রবৃত্তিগুলি কেবল জন্মগত নয়, বংশানুক্রমিকও বটে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে একই প্রথায় মৌমাছি চাক বাঁধে, উই ঢিপি তৈরী করে, বাবুই পাখী বাসা বাঁধে।

---

(৪) "An innate disposition which determines the organism to perceive any object of a certain class, and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which finds expression in a specific mode of behaviour to the object". An Outline of Psychology P 110. McDougall.

(৪) এগুলি গোষ্ঠীর (species) সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। বংশানুক্রমের ধারায় একই প্রকার দৈহিক গঠন থাকে বলে, গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি-জনিত প্রক্রিয়াগুলি একই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা :—বাবুই পাখীরা সকলেই একই ধরনের বাসা বাঁধে।

(৫) সহজাত প্রবৃত্তিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিবর্ত্তনীয়। একই ধরনের অবস্থায় জীবের মধ্যে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এগুলি শিক্ষাসাপেক্ষ নয় যেমন, মাকড়সা যে জাল বোনে তার রীতি বা পদ্ধতির মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

(৬) এগুলি মূলতঃ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত নয়। ছানা কেড়ে নিলে মাদী কুকুর হিংস্রভাবে কামড়ে দেয়। এর জন্য সে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না বা কোন দ্বিধা-বিলম্বও করে না।

(৭) সহজাত প্রবৃত্তিগুলি বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না বটে, কিন্তু এগুলির দ্বারাই জীবের আত্মরক্ষা, আত্মবিস্তৃতি ও বংশরক্ষার কাজগুলি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। সজারুর কাঁটা বা কচ্ছপের খোলের ব্যবহার কিম্বা বহুরূপীর রঙ বদলানো প্রভৃতি সহজাত প্রক্রিয়াগুলি প্রাণীর আত্মরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। সংগ্রহ ও সঞ্চয় করবার যে আদিম প্রবৃত্তি প্রাণীদিগের মধ্যে দেখা যায়, তার মূলে আছে আত্মবিস্তৃতির ইচ্ছা। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে স্বভাবজ আকর্ষণ, নীড় বাঁধবার যে ইচ্ছা এবং সন্তানের প্রতি যে স্নেহ মমতা, এও বংশরক্ষার জন্যই সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত।

(৮) প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তি যথানিয়মে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয় এবং তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেটি লোপ পায় যথা :—স্তন্যপানের প্রবৃত্তি।

(৯) প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে একটি করে অনুভূতির নিবিড় যোগ আছে। যেমন, সবৎসা গাভীর কাছে গেলেই সে শিং দিয়ে ঢুঁ মারতে আসে।

এই লক্ষণগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে জৈব প্রয়োজন সাধনে সহজাত প্রবৃত্তিগুলি নিতান্তই প্রয়োজনায়। জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করবার জন্য প্রত্যেক প্রাণীই অবিরতভাবে সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

এখন দেখা যাক, ম্যাকডুগাল কোন্ কোন্ প্রবৃত্তিকে সহজাত বলে স্বীকার করেছেন—

(১) **বাৎসল্য প্রবৃত্তি (Parental)**—সকল সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বাৎসল্য বা অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তিকে ম্যাকডুগাল শ্রেষ্ঠতম সহজাত প্রবৃত্তি বলে গণ্য

করেছেন। প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে প্রেম, তার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে এই প্রবৃত্তির উপর। লালন-পালন, ভরণ-পোষণ, আশ্রয়দান, সেবা-যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ, মায়ামমতা, স্নেহ-ভালবাসা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও কষ্টস্বীকার, সহানুভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম সুকুমার চিত্তবৃত্তির চর্চ্চা ও বিকাশের মূলে আছে এই সহজাত প্রবৃত্তিটি।

(২) **যুযুৎসা প্রবৃত্তি (Combat)**—এই প্রবৃত্তিটির মূলেও আছে বাৎসল্য। সন্তানের বিপদাশঙ্কায় কোন্ পিতামাতা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? শাবককে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুরগীর আপ্রাণ চীৎকার এবং গাভীর রোষকষায়িত দৃষ্টিকে কে না ভয় করে? কোনও একটি কর্ম্মপ্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হলেই এই প্রবৃত্তিটি জেগে ওঠে। প্রথমতঃ, প্রাণীমাত্রেই সমাগত বাধাটিকে অপসারিত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে সফল না হলে, বাধা-সৃষ্টিকারীকে আক্রমণ করে ধ্বংস ও নিঃশেষিত করবার জন্য যুদ্ধপরায়ণ হয়। শিশু যখন নিজের অধিকার দাবী করে, কিম্বা পরাজয়ে অভিভূত না হয়ে নূতন উদ্যমে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করে তখনই বুঝতে হবে যে, সেই শিশুর জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার আশা আছে।

(৩) **কৌতূহল প্রবৃত্তি (Curiosity)**—নূতন পরিবেশকে জানবার ও বুঝবার প্রচেষ্টার মূলে আছে কৌতূহল প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই শিশু অবিরত ধারায় পিতামাতা, শিক্ষক ও আত্মীয়স্বজনকে প্রশ্ন করে। মানবের সকল অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার মূলে আছে এই প্রবৃত্তিটি। কৌতূহল প্রবৃত্তিটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করেই আজ মানবজাতি তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে। যেখানে এই প্রবৃত্তিটি সৎকাজে লাগে না, সেখানে নানা অনর্থেরও সৃষ্টি হয়।

(৪) **খাদ্যসংগ্রহ প্রবৃত্তি (Food-Seeking)**—জীবনপ্রয়াসের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি হলো খাদ্যসংগ্রহের প্রবৃত্তি। প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই আদিম প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ও তাড়নায় সময় বিশেষে মানুষ পশুর পর্য্যায়ে নেমে আসে। এ সময়ে বাৎসল্য প্রভৃতি অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিগুলি সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়। খাদ্যসংগ্রহ প্রবৃত্তি, শিক্ষার দোষে অনেক সময়ে, এমনই বিকৃত হয়ে ওঠে যে শিশু লোভী ও অসংযমী হয়ে পড়ে এবং এতে চরিত্র ও স্বাস্থ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়।

( ) **ঘৃণা প্রবৃত্তি (Repulsion)**—সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ঘৃণা প্রবৃত্তিটি খুব সহজেই বোঝা যায়। কোন বিশ্রী বা বিস্বাদ জিনিস মুখে গেলেই শিশু মুখ থেকে সেটি বার করে দিতে চায়। ক্রমে এই প্রবৃত্তিটির আরও নানা

অভিব্যক্তি আমরা দেখি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা, নিষ্ঠুরতা, পাপ, দুর্নীতির প্রতি আমাদের যে ঘৃণা, তা এই প্রবৃত্তির দ্বারাই প্রণোদিত।

(৬) **পলায়ন প্রবৃত্তি (Escape)**—এই প্রবৃত্তিটি নানাবিধ কারণেই উদ্দীপিত হয়। আকস্মিক শব্দ, গোলমাল, আর্ত্তনাদ, শাস্তি ও বেদনার আশঙ্কা, রহস্যময় পরিবেশ ইত্যাদি হতে পলায়নেচ্ছা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সকলেরই মনে এই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। পলায়নের সঙ্গে কোন না কোন প্রকারের ভয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লজ্জা প্রকাশও পলায়ন প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি।

(৭) **সংঘ প্রবৃত্তি (Gregariousness)**—প্রাণীমাত্রেই সমজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে দল বেঁধে থাকবার চেষ্টা করে। অতি শিশু অবস্থাতেই এই প্রবৃত্তিটির বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়। মুরগীর বাচ্চাগুলি একসঙ্গে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। মানবশিশুর মধ্যেও এই প্রবৃত্তির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। সে একাকী থাকলে নিরাপত্তাবোধের অভাব প্রকাশ করে। সংঘপ্রিয়তা ১০ হতে ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। সেইজন্য এই প্রবৃত্তিটিকে যথাযথভাবে উৎসাহ দিলে ফল ভালোই হয়। প্রথমে শিশু সামাজিক হতে শেখে, পরে সভা, সমিতি, সংঘ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সে তৎপর হয়ে ওঠে।

(৮) **আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি (Self assertion—)**নিকৃষ্টের কাছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য প্রায় সকলেই আগ্রহশীল। রূপ, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির আস্ফালন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিটির উৎকর্ষ সাধন করলে জগতে নানা ভালো কাজ হতে পারে, নতুবা নানারূপ নীচ অভিব্যক্তিতে মানবজীবন কলুষিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

(৯) **আত্মবিলোপ প্রবৃত্তি (Submission)**—আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির বিপরীত প্রবৃত্তিটি হলো আত্মবিলোপসাধন। স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নিকট নিকৃষ্ট প্রাণী সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। দীনতা, বশ্যতা, দাসত্ব, আনুগত্য 'শ্রদ্ধা ও ভক্তি—এগুলি আত্মবিলোপ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া। শিশুর মধ্যে এই প্রবৃত্তিটি যেন বেশী বৃদ্ধি না পেতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষক সর্ব্বদাই সতর্ক থাকবেন।

(১০) **যৌন প্রবৃত্তি (Sex)**—ফ্রয়েড ও তাঁর শিষ্য মণ্ডলী এই প্রবৃত্তিটিকে জীবনের আদি প্রবৃত্তি বলে গণ্য করেন। ফ্রয়েডের সঙ্গে অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদগণ সম্পূর্ণ একমত না হলেও তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, জীবজগতে এই প্রবৃত্তিটির প্রভাব ও প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী এবং ব্যাপক। খাদ্যসংগ্রহ প্রবৃত্তির মত এটিও একটি আদি, অতি প্রবল ও শক্তিশালী সহজাত প্রবৃত্তি। আজন্ম

সকল জীবেরই মধ্যে যৌনবোধ থাকে, এবং তাকে উপেক্ষা করা কোনমতে সমীচীন নয়। উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্তভাবে ছেলেমেয়েদের এই বিষয়ে শিক্ষা দিলে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

(১১) **সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Acquisitiveness)**—আহার ও গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ প্রচেষ্টা একটি আদিম ও অকৃত্রিম প্রবৃত্তি। প্রাণীমাত্রেই শুধু সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হয় না, ক্রমে সঞ্চয় ও সংরক্ষণের চেষ্টাও করে থাকে। অর্থ, বিত্ত, যশ, মান, পুস্তকাগার, যাদুঘর, পশুশালা, প্রদর্শনী প্রভৃতির জন্য মানুষের যে আয়োজন ও প্রচেষ্টা তার মূলে আছে সংগ্রহ প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির অসংযত বিকাশে কৃপণতা, চৌর্য্যপ্রবণতা ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিটির পরিবর্দ্ধনের ফলে জ্ঞানানুশীলন, কলানুরাগ প্রভৃতির জন্য যে অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, পরিশ্রম, বিচার ও বিবেচনার প্রয়োজন তা সমস্তই ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করে।

(১২) **সৃজনীবৃত্তি (Creative instinct)**—মূলতঃ নীড়রচনার প্রেরণাতে প্রাণীমাত্রেই সচেষ্ট হয়ে ওঠে, এবং শিশুর সৃজনাত্মক খেলাধূলার থেকে সুরু করে মানবের সর্ব্ব প্রকার শিল্পকলা, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য—এক কথায়, মানব সভ্যতার সর্ব্বৈব সাধনা ও সিদ্ধি এই সহজ প্রবৃত্তিটির সর্ব্বতোমুখী বিকাশের উপরে নির্ভর করে।

(১৩) **আর্ত্ত-প্রবৃত্তি (Appeal)**—যখন যুযুৎসা ও যুদ্ধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না, কিম্বা জীবের নিকট পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে, তখনই এই বৃত্তিটি কার্য্যকরী হয়। অনুকম্পা, দয়া ও সহানুভূতি ভিক্ষা করে প্রাণী তখন নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে।

(১৪) **হাস্য প্রবৃত্তি (Laughter)**—এটি যে একটি সহজাত প্রবৃত্তি সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। কোন্ উদ্দীপনায় এই প্রবৃত্তিটি সাড়া দেয়, এ সম্বন্ধেও বহু মতবাদ আছে। ম্যাকডুগাল বলেন অসহনীয় কষ্ট বা ক্রোধের সঞ্চয় হলে মানুষ হঠাৎ হেসে ওঠে কেননা জীবনের তিক্ততা হতে রক্ষা পাওয়ার একটি স্বাভাবিক উপায় না থাকলে মানুষের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে পড়ে। হাস্য প্রবৃত্তি এই অসহনীয় অবস্থা থেকে সকলকেই রক্ষা করে।

মানুষের স্বভাবের অভিব্যক্তির আর একটি পথ হলো তার আবেগ ও অনুভূতি সকল। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় আবেগ অনুভূতিকে প্রক্ষোভ (Emotion) বলে। ম্যাকডুগালের মতে জীবনের মৌলিক অনুভূতিগুলি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রকাশ পায় এবং তারাই সহজাত প্রবৃত্তি-সমূহের প্রকৃতি ও গতি নির্দ্দেশ করে দেয়।

রস বলেছেন, "ম্যাকডুগালের যুক্তির প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি একটি নির্দ্দিষ্ট প্রক্ষোভকে একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তির কেন্দ্রীয়, প্রয়োজনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন।" (৫)

জীবনের মৌলিক প্রক্ষোভগুলি সহজাত প্রবৃত্তি হতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিভিন্ন তা বিচার করতে হলে প্রথমতঃ দেখা যায় যে ভাবের আবেগে মানুষের সমগ্র শরীরেই একটা পরিবর্ত্তন ঘটে। ক্রুদ্ধ, ভীত বা বিষণ্ণ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করলে সহজেই তার মনের ভাবটি বোঝা যায়। ক্রোধে আমরা "লাল" হই, দুঃখে, শোকে "বিমর্ষ" হই, ভয়ে "আড়ষ্ট ও বিবর্ণ" হয়ে পড়ি। ফলে আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন ঘটে, গ্রন্থিমূলে রস নিঃসরণের তারতম্য ঘটে, এবং রক্ত চলাচল ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি ও অবস্থা ক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। আমাদের হাব ভাবে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। থাউলেস বলেন যে প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়ার তিন রকমের দৈহিক অভিব্যক্তি দেখা যায়, (ক) প্রক্ষোভের সঙ্গে সংলিপ্ত ব্যবহার—যেমন, বেগে আঘাত করা বা ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। (খ) অভিব্যক্তির পেশীগত প্রকাশ যথা কাঁপা, মুখ বিকৃতি করা, ভ্রূকুঞ্চিত করা, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি অর্থাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করা বা চীৎকার করা এবং (গ) রক্ত সঞ্চালন ও অন্ত্রসমূহের ক্রিয়ার পরিবর্তন যথা ভয়ে বিবর্ণ হওয়া এবং মলমূত্রাদি ত্যাগ করা।" (৬)

দ্বিতীয়তঃ, জীবনের সর্ব্বাবস্থায় ভাবের সংঘাতে মানুষ বিচলিত হয়েথাকে। আমরণ মানুষ তার ব্যবহারে এই প্রক্ষোভগুলির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

তৃতীয়তঃ, প্রক্ষোভগুলি অতি সহজেই উদ্দীপিত হয় এবং মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। সহজাত প্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়াগুলি যেমন সুশৃঙ্খল ও সুসম্বন্ধ, প্রক্ষোভগুলি তেমন নয়।

চতুর্থতঃ, প্রক্ষোভগুলি একবার উত্তেজিত হলে মানুষের বিচার ওবিবেচনার ক্ষমতা কিছুক্ষণের জন্য যেন লুপ্ত হয়ে যায়। ভাবাতিশয্যে অনেক সময়ে মানুষ

---

(৫) "Perhaps the most distinctive feature of McDougall's argument is his insistence on a specific emotion being the central, essential, unchanging aspect of every instinct." Educational Psychology P. 63 Ross.

(৬) "There are three kinds of bodily responses in an emotional reaction. These are (1) the behaviour associated with the emotion such as striking in anger, running away in fear etc. (2) Other responses in the muscular system particularly in the facial muscles such as trembling, sneering, scowling etc, with vocal responses (snarling, screaming etc) and (3) changes in the blood supply and viscera such as pallor and excretion in fear" General and Social Psychology, P. 83. Thouless.

এমন সব কাজ করে বসে যা সুস্থির চিত্তে ভেবে দেখলে নিছক পাগলামী বলেই মনে হয়।

"প্রক্ষোভগুলির প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ শৃঙ্খলাহীন। উদ্দীপিত হলে তারা সমস্ত দেহকে অভিভূত করে ফেলে। প্রধানতঃ দেহের গ্রন্থিসমূহ, আন্ত্রিকক্রিয়া ও স্নায়ুসংযোগগুলি বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি বা জাতির আত্মরক্ষার সঙ্গে এই প্রক্ষোভগুলির গভীর সংযোগ আছে।" (৭)

ম্যাকডুগাল বলেন যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলেই একটি করে প্রক্ষোভের উৎস আছে যেমন :—পলায়ন প্রবৃত্তির মূলে আছে ভয়ের প্রক্ষোভ, কিম্বা ঘৃণার মূলে আছে বিরক্তি। চৌদ্দটি প্রবৃত্তির মূলে যে চৌদ্দটি প্রক্ষোভের প্রভাব আছে সেগুলির তালিকা দেওয়া গেল।

১।	পলায়ন প্রবৃত্তি	...	ভয়
২।	যুযুৎসা প্রবৃত্তি	...	ক্রোধ
৩।	ঘৃণা প্রবৃত্তি	...	বিরক্তি
৪।	অপত্য প্রবৃত্তি	...	স্নেহ
৫।	আর্ত্ত প্রবৃত্তি	...	দুঃখ
৬।	যৌন প্রবৃত্তি	...	কাম
৭।	কৌতূহল প্রবৃত্তি	...	বিস্ময়
৮।	আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি	...	গর্ব্ব
৯।	আত্মবিলোপ প্রবৃত্তি	...	হীনমন্যতা
১০।	সংঘ প্রবৃত্তি	...	একাকিত্ব বোধ
১১।	খাদ্য সংগ্রহ প্রবৃত্তি	...	ক্ষুধা
১২।	সংগ্রহ প্রবৃত্তি	...	স্বাধিকার বোধ
১৩।	গঠন প্রবৃত্তি	...	সৃজনী স্পৃহা
১৪।	হাস্য প্রবৃত্তি	...	আনন্দ, আমোদ

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতের বহু অমিল আছে। প্রত্যেকেই আপনার চিন্তা ও গবেষণার কষ্টিপাথরে এ সকলের সত্যাসত্য যাচাই করে নিজের নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন

(৭) "Emotions are innate responses essentially chaotic in their nature involving the whole body in their expression, but particularly th glandular and visceral systems and their nervous connections, and having intimate relationships with the preservation of the individual or the species." Educational Psychology P 129. Sandiford.

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়। এই গ্রন্থে সেই সকলের কূট বিশ্লেষণ ও আলোচনার অবতারণা করা উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষায় সহজাত প্রবৃত্তি প্রয়োগ কি ভাবে হতে পারে, সেই বিষয়ে বিচার করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিসকল তার পরিবেশের স্বল্প পরিসরের মধ্যে নিরন্তর বাধা পেয়ে নিগৃহীত ও নির্য্যাতিত হয়। গৃহের নানাবিধ বিধি ও নিষেধের শৃঙ্খলা, পরিবেশজনিত নানাপ্রকার বাধা ও বিপত্তি, শিশুর চারিপাশে অষ্ট-প্রহর যেন সজাগ প্রহরীর মত বেত্রদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই কারণেই শিশুর সহজ প্রবৃত্তির প্রবাহগুলি সর্ব্বদা চারিদিকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন শিশুচিত্তে যে বিক্ষোভের আবর্ত্ত সৃষ্ট হয় তাতে তার অন্তরতম দেশটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং সময়ে অসময়ে এই বিষ উদগীরণ করে শিশু তার শিক্ষক ও পিতামাতাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই বুঝতে পারেন যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজে বাধা পেয়েছে বলেই শিশুর ধূমায়িত মন বিক্ষোভে অভিভূত ও আলোড়িত হয়ে পড়েছে। এই সময়ে খেলা, গান, গল্প, শিল্পকলা, সাহিত্য ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে যদি তার ক্ষুব্ধ ইচ্ছাগুলি উদগতি লাভ করতে পারে, তবেই তারা আবার অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে মনের চেতন দেশে সানন্দে ভেসে বেড়াবার ক্ষমতা পায়। তখন শিশুর প্রবৃত্তি-প্রবাহ ব্যক্তিকেন্দ্রের কন্দর ছাপিয়ে উঠে তার সমাজকেন্দ্রিক চেতনাকে ব্যাপ্তি ও মহিমায় পূর্ণ করে তোলে।

সহজাত প্রবৃত্তিগুলি জন্মগত বটে কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তারা পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে না, কুসুমকোরকের ন্যায় সেগুলি ক্রমে ক্রমে ফুটে ওঠে। বয়স অনুসারে, মানবশিশু প্রবৃত্তিবিকাশের ক্রমান্বয় সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। পরম যত্নে ও পরম স্নেহের সহিত তার সহজাত ক্ষমতাগুলিকে ফুটিয়ে তোলা বিরাট দায়িত্ব এবং এগুলির অকালবোধন হলে শিশুর সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে জোর করে শিশুর সুপ্ত ক্ষমতাগুলিকে বিকশিত ও উন্মেষিত করতে চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াতে শিশুর মনে শিক্ষণীয় বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে বিভীষিকা ও ঘৃণা জন্মায়।

সুকুমার শিশুচিত্তের প্রবৃত্তিগুলি কি ভাবে এবং কখন সুপরিণত হয় সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। যেমন, ছয় সাত বৎসরের বালককে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে তার কাছে সেটা হবে নীরস ও নিরর্থক। সে যন্ত্রচালিতবৎ পাঠ মুখস্থ করবে শিক্ষকের শাসনের ভয়ে। কিন্তু চৌদ্দ, পনেরো বৎসর বয়সের কিশোর কিশোরীদের কাছে শরীরতত্ত্ব অত্যন্ত কৌতূহলের

বিষয়। এই সময়ে যদি তাদের কাছে শরীরতত্ত্বের অবতারণা করা যায়, মনে হয় তারা অসীম আগ্রহের সঙ্গেই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হবে।

অভ্যাসের দ্বারা সহজপ্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত ও সুপরিণত হয়। এইজন্য যে অভ্যাসের ফলে জীবনযুদ্ধে শিশু জয়ী হতে পারবে, সেগুলি যাতে বারম্বার অভ্যাসের সুযোগ পায় এ বিষয়ে সজাগ হতে হবে। ভুলভ্রান্তি বা আমাদের অসুবিধা হবে বলেই আমরা শিশুকে তার প্রতি কর্মোদ্যম হতে নিরস্ত করতে চেষ্টা করি। কিন্তু গৃহস্থালীর ও বিদ্যালয়ের কাজে কর্মে যদি তাকে সাদর আহ্বান জানাই, তাহলে সে ক্রমশঃ নানা কাজে দক্ষতা লাভ করে সত্বর স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

আমাদের প্রবৃত্তিগুলি নির্দ্দিষ্ট উদ্দীপনায় নির্দ্দিষ্ট সাড়া দেয়। এইজন্য, শিক্ষাকালে শিশুদের সর্ব্বদাই উপযুক্ত প্রেরণা ও ইঙ্গিত দিলে তারা ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে অভ্যস্ত হবে। যে যে ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিগুলির অকালবোধন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই সেই ক্ষেত্রে যথাযথ প্রেরণার সাহায্যে তাদের সংযত, পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশুর মধ্যে কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি এমন উগ্রভাবে বিকশিত হচ্ছে যে সে সমাজগত নীতি মানতে বা কল্যাণময় কাজে কোনমতেই মন দিতে পারছে না। এই সময়ে তার আদিম প্রবৃত্তির স্রোতটির মোড় ঘুরিয়ে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই উপায়টিকে বলা হয় প্রবৃত্তিগুলির উদ্গতি বা উৎকর্ষণ (Sublimation)। শিক্ষাব্যবহারে প্রবৃত্তির উৎকর্ষণের স্থান অতি উচ্চে। অবাঞ্ছিত মনে করে প্রবৃত্তিগুলির গলা টিপে মেরে ফেলা যায় না, এবং তার চেষ্টা করাও উচিত নয়। বস্তুতঃ বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, ভালো-মন্দের চিরন্তনী মাপকাঠিই বা কি? অহিংসা ভালো বলে যুযুৎসা জীবন থেকে বাদ দিলে চলবে না। যৌন প্রবৃত্তি জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে বলে, তাকে সম্পূর্ণরূপ উৎখাত করা চলে না। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির স্রোতটিকে সমাজ কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করে তাকে পূর্ণতা দান করাই উৎকর্ষণের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিগত জীবন-প্রেরণাতে মানুষ যা আকাঙ্খা করে, অনেক ক্ষেত্রেই তাতে সমাজের কল্যাণ ব্যাহত হয়, কিন্তু সেই জীবন-প্রেরণা যদি বুদ্ধি ও সহানুভূতি-যোগে জনহিতৈষণার নিমিত্ত প্রয়োগ করা যায়, তাহলে প্রাণবেগ প্রতিরুদ্ধ হয় না, কেবল তার গতি-স্রোতটিকে অন্য খাতে প্রবাহিত করা হয়। ফলে, মানবমনে প্রবৃত্তিগুলির অবদমনজনিত গোপন বিদ্রোহ জেগে ওঠে না, অথবা ব্যর্থতাজনিত অসহায়তাও প্রকাশ পায় না।

সমাজকল্যাণ পরিপন্থী প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষণের জন্য শিক্ষাবিদগণ নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে থাকেন। যখন প্রবৃত্তিগুলির তীব্রতায় শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে তখন পরিবেশ ও প্রেরণার আমূল পরিবর্ত্তন করতে পারলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে প্রত্যর্থী আকর্ষণের দ্বারা (Counter attraction) শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হীন আনন্দের আকর্ষণ হতে রক্ষা করে শিশুকে উচ্চতর আনন্দের সন্ধান দেওয়াই এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তির স্থান কি এ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। শিশুর ক্রমবিকাশের সহিত সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দেওয়াই হলো প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতি। শিশু কোন্ বয়সে কি ভাবে জ্ঞান আহরণ করে, কি ভাবে কাজ করে, কোন্ কাজ তার পছন্দ হয়, কিসে তার আনন্দ হয়, কোন্ ব্যবহারে তার দুঃখ হয়, কিসে সে ভয় পায় এ সকলই শিক্ষক শিক্ষিকাকে জানতে হবে। এই সকলের উপরে নির্ভর করে যে শিক্ষা গড়ে ওঠে তাই হয় যথার্থ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা। শিক্ষণপদ্ধতির পুঁথিগত জ্ঞান অপেক্ষা শিশু সম্বন্ধে জ্ঞান এই স্থলে অধিকতর প্রয়োজন। বহু শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করেই এইরূপ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। সেইজন্য ব্যক্তিগত চেষ্টায় শিক্ষাবিদগণ শিশু সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিরীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা শিশুর প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কি ভাবে সদ্ব্যবহার করা যায় এ সম্বন্ধেও তাঁরা সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। শিশুর জীবনবিকাশ পথে কি ভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা এই সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করবেন তাই এখন বিবেচনার বিষয়।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে সহজ প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ এক সঙ্গে হয় না। যেমন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই আহার করবার প্রবৃত্তি দেখা দেয়, তারপর কৌতূহল প্রবৃত্তি, অনুকরণ ও খেলার প্রবৃত্তি ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়। অপর দিকে সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি যথা, সংঘ প্রবৃত্তি, গঠন প্রবৃত্তি ইত্যাদির উন্মেষ আরও বিলম্বে হয়। সেইজন্য শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে কোন্ বয়সে কি কি সহজ প্রবৃত্তি প্রবল তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে বয়সে যে প্রবৃত্তি সকল সবল ও সতেজ থাকে, সেই বয়সে সেই প্রবৃত্তিগুলিকে ভিত্তি করে তাদের সুঅভ্যাস গড়ে তোলা সহজ। তাই মনীষী রুশো বলেছেন, "শিশুর প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে তার শিক্ষার ব্যবস্থা কর।" শিশুর প্রকৃতি ভবিষ্যতে কি ভাবে গড়ে উঠবে, তা তার সহজ প্রবৃত্তিগুলি নির্দ্দেশ করে এবং তার স্বাভাবিক কর্ম্মস্রোতেরও পথ নিরূপণ করে দেয়। সুতরাং, শিশুর শিক্ষা এই স্বাভাবিক

পথে পরিচালিত না হলে, প্রবৃত্তিগুলি তার বিকাশের পথে সাহায্য না করে বরঞ্চ নানা বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

মানুষের জীবনে সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি একই সময়ে কাজে আসে না এবং সকলগুলির বিকাশের জন্য চেষ্টাও করতে হয় না। শিশুকে শিক্ষাদান কালে যে সকল সহজ প্রবৃত্তি বিশেষ সাহায্যে আসে সেগুলি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যেমন—

অনুকরণ প্রবৃত্তি—শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। বলতে গেলে, প্রথমে কেবল অনুকরণ প্রবৃত্তির সাহায্যেই তার শিক্ষা এগিয়ে চলে। তিন বৎসর পর্য্যন্ত সে প্রবৃত্তিমূলক (Instinctive) অনুকরণের দ্বারা যা দেখে তাই যন্ত্রের ন্যায় অনুকরণ করে। এই সময়ে তার ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট সবল হয় না বলে সে ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে না। সুতরাং, এই সময়ে শিশুর মাতা বা শিক্ষিকা তার কাছে সুস্পষ্টস্বরে ছোট ছোট শব্দ উচ্চারণ করে কথা বলবেন, এতে শিশু বিশুদ্ধভাবে কথা বলতে শিখবে। সুমিষ্ট স্বরে গান করে শিশুর মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ জাগিয়ে তুলতে পারেন। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে শিশুর অন্তরে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ স্থায়ী করতে পারেন।

তিন বৎসর বয়সে শিশুর মধ্যে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রবল হয়, এবং তখন থেকে সে অভিনয়ের আকারেই অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। সে অন্যের কথা শুনে বা কাজ দেখে অভিনয় করে। পিতা বা গুরুমহাশয় সেজে অন্য শিশুদের শাসন করবার ভাণ করে, মেয়েরা মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করে সন্তান পালনের অভিনয় করে। এই অভিনয়ের ইচ্ছা দমন না করে এরই সাহায্যে শিশুকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়। শিশু যাতে অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজের অভিনয় না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে ইচ্ছাশক্তির সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যায়। তখন শিশু চেষ্টা করে অন্যের কাজ অনুকরণ করে। এই সময়ে অনুকরণ ক্ষমতার সাহায্যেই সে সুন্দর ভাবে লিখতে পারে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে বই পড়তে পারে, উদাহরণের সাহায্যে অঙ্ক কষতে পারে, অনুকরণ করে হস্তশিল্প, কারুশিল্প, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কাজে দক্ষতা দেখাতে পারে। সুতরাং এই বয়সে প্রধানতঃ স্বৈচ্ছিক অনুকরণের সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা দিলে তা আনন্দময় ও স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যে বিষয়ে আমরা শিশুকে স্বেচ্ছায় অনুকরণ করতে প্রেরণা দিতে চাই সেই বিষয়টি শিশুর কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। বিষয়টির মধ্যে একেবারে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য দেখতে না পেলে শিশু স্বেচ্ছায় অনুকরণ

চায় না। কোন বিষয়ে কৌতূহল জাগাতে পারলেও শিশু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অনুকরণ করে।

দশ বারো বৎসর হতে শিশুর ভাববৃত্তিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে এবং তার বিচারশক্তিও সবল হয়। এই বয়স হতে যৌবনোন্মুখ অবস্থা (adolescence) পর্য্যন্ত সে আবেগের সহিত আদর্শের অনুকরণ করে এবং বিশেষ বিশেষ আদর্শের দ্বারা তার চরিত্র প্রভাবান্বিত হয়। যৌবনোন্মুখ কালে ছেলেমেয়েদের সামনে যত ভালো আদর্শ ধরা যায় তাদের জীবন ও চরিত্র ততই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়। এই বয়সের পরেও তারা যে আদর্শের অনুকরণ করে না তা নয়, কিন্তু বিচারশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ায় তারা আদর্শকেও বিচার করে দেখে। এই অভ্যাসটি সুলক্ষণ, কেননা অন্ধভাবে অনুকরণ করলে তাদের কখনও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে না।

কৌতূহল প্রবৃত্তি—এই প্রবৃত্তিটি শিশুবয়সে অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই বিচিত্র জগতে সে নূতন আগন্তুক, তার সমস্ত পরিবেশটি বুঝে নিয়ে সে কায়েমী হয়ে বসতে চায়। তাই সে সর্ব্বদা "এটা কি, ওটা কি" প্রশ্ন করতে থাকে। এইরূপ প্রশ্নে বিরক্তিবোধ না করে, শিশুকে উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং তার বিকাশ অনুযায়ী উত্তর দিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়তা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কৌতূহলকে জ্ঞানের প্রসূতি বলে। কৌতূহল না জন্মালে কোন বিষয়ে আগ্রহ জন্মায় না, এবং আগ্রহ না হলে শিশুর শিক্ষাও অগ্রসর হয় না। কৌতূহল উদ্রেক করবার একটি বিশেষ উপায় হলো নূতনত্ব। পাঠদান কালেই হোক, কি খেলাধূলার সময়েই হোক প্রত্যেক বিষয়ের নূতন দিকটি বিচিত্র ও বিশিষ্টময় করে শিশুর সামনে তুলে ধরলে তার কৌতূহল অব্যাহত থাকবে।

কোন কোন শিশু একটার পর একটা প্রশ্ন করে যায় কিন্তু কৌতূহল তৃপ্ত করতে বা জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টা করে না। এইরূপ অসঙ্গত ব্যবহারকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করে সুপথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। এক বিষয়ে কৌতূহল সম্পূর্ণ চরিতার্থ না করে তাকে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে না দেওয়াই উচিত। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের চেষ্টায় কৌতূহলের বিষয়টি অনুসন্ধান করে জানতে প্রেরণা দেওয়া ভালো। সব সময়ে তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ইঙ্গিতের দ্বারা সমস্যাটি সমাধান করতে সাহায্য করা হলো প্রকৃত শিক্ষা।

ক্রীড়া প্রবৃত্তি—শিশুদের স্বাভাবিক চঞ্চলতা খেলার সাহায্যেই আত্মপ্রকাশ করে। হাঁটতে শেখবার আগে তারা হাত পা নেড়ে খেলা করে। হাঁটতে শিখলেই দৌড়াদৌড়ি ও লাফালাফি করে। তাদের এই স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি

শরীর ও মনের বিকাশ সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করে। রুশো, ফ্রোবেল বা মন্তেসরীর উপদেশ অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হলে শিশুদের খেলার সাহায্যেই শিক্ষা দিতে হবে। ফ্রোবেল ও মন্তেসরী নানাবিধ খেলার উদ্ভাবন করে শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করে দেখিয়েছেন যে কেবল লাফালাফি, ছুটাছুটি করে কোন বিশেষ শিক্ষালাভ হয় না। খেলা বা শিশুর স্বাভাবিক চাঞ্চল্যকে নিয়মিত করে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুললে শিক্ষা কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। সেইজন্য তাঁরা শব্দগঠন (word building), কাগজ কেটে খেলনা তৈরী করা, বস্তুর সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সমস্যা পূরণ, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীতসহ নৃত্য, ঐতিহাসিক অভিনয়, গল্পের অভিনয় এবং জীবন সংক্রান্ত নানা কার্য্যের দ্বারা শিক্ষাকে শিশুর স্বভাবোচিত করে তুলতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

আত্মবোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মাবমাননা প্রবৃত্তি—শিশু স্বভাবতঃই স্বার্থপর। নিজের সুখ সুবিধা ও আরামের দিকে তার দৃষ্টি প্রখর। মায়ের উপরে তার একার দাবী, অন্যের অধিকার সে সহ্য করতে পারে না। নিজের জিনিসটি অন্যকে দিতে চায় না, অন্য শিশু কোন মতে অধিকার করলে কেঁদে কেটে সে অনর্থ করে। শিক্ষিকা শিশুর এই আত্মবোধ দমন করতেও পারেন না, অবহেলাও করতে পারেন না। আত্মবোধ তার স্বভাব; কাজেই এই স্বভাবকে স্বীকার করে শিক্ষার দ্বারা তাকে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করতে হবে। আত্মবোধ প্রবৃত্তিকে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালনা করতে পারলে শিশু অনেক কঠিন কাজও করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। আত্মপ্রতিষ্ঠা হতেই আত্মবিশ্বাস জন্মায় এবং তারই ফলে সে নানা দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত হবে এবং ক্রমে ক্রমে সফলতা লাভ করবে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রভাবেই শিশু আর একটি শিশুর সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় এবং প্রতিযোগিতার দ্বারাই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হতে পারে। এই একই প্রবৃত্তি হতে আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধও জেগে ওঠে। শিশু যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তবে সে সহজে অন্যের সাহায্য-প্রার্থী হবে না এবং আত্মমর্য্যাদা হানিকর কোন কাজও করবে না।

আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা যেমন শিশুর প্রভূত উন্নতি হতে পারে তেমনি নানা অপকারও হতে পারে। এই প্রবৃত্তির আতিশয্যে আত্মাভিমান এমনই বৃদ্ধি পায় যে শিশু অহঙ্কারে অন্যকে তুচ্ছ করে বা গুরুজনের অবাধ্য হয়। প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি সীমা লঙ্ঘন করে হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ ধারণ করতে পারে। এই অবস্থা হতে শিশুকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষিকার

সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা চাই। তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে শিশুদের ক্ষমতানুযায়ী নির্ব্বাচন করে এমন দল গড়ে তুলবেন যাতে তারা এক অন্যকে অতি সহজেই অতিক্রম করে যেতে না পারে। এই দলের মধ্যে যে প্রকৃত পক্ষে শ্রেষ্ঠ, শিশু তার কাছে সহজেই নত হয় এবং তার নেতৃত্বে কাজ করতে রাজী হয়। এই প্রবৃত্তিটিকে আত্মাবমাননা বলা হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করতে যেমন উৎসাহ দেওয়া উচিত, তেমনি আত্মাবমাননার দ্বারা অন্যের নেতৃত্বে কাজ করতে শিক্ষা দেওয়াও উচিত। তবে আত্মাবমাননা প্রবৃত্তির আতিশয্য হলে শিশুর বিশেষ অনিষ্ট হয়। সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। এই দুই প্রবৃত্তির মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করা অতীব বিচক্ষণতার কার্য্য।

পলায়ন প্রবৃত্তি—পলায়ন প্রবৃত্তির মূলে আছে ভয়। নিজের কোন অনিষ্ট হবে এই আশঙ্কা থেকেই ভয়ের উদ্রেক হয়। অত অল্প বয়সে শিশুর মধ্যে ভয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে এ সম্বন্ধে পিতামাতাকে বিশেষভাবে সজাগ হতে হবে। হঠাৎ কোন শব্দে, বিছানা ধরে টানলে, উপর থেকে নীচে ছুড়লে নবজাত শিশু ভয় পায়। শিক্ষিকা ও পিতামাতা লক্ষ্য রাখবেন যাতে শিশু অযথা ভয় না পায়। নিম্নলিখিত কারণে ভয়ের উদ্রেক হতে পারে :—

(১) হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হলে শিশু সহজে ভয় পায়।

(২) কোন বস্তু সম্পর্কে কষ্টজনক অভিজ্ঞতা হলে সেই বস্তু দর্শনে শিশু ভয় পায়।

(৩) কোন নূতন অস্বাভাবিক জিনিষ দেখলে বা শব্দ শুনলে শিশু ভয় পায়।

(৪) প্রিয় বস্তু হারিয়ে যাওয়ার, প্রিয় ব্যক্তি চলে যাওয়ার আশঙ্কায় শিশু ভয় পায়।

(.) ভয়োদ্দীপক ইঙ্গিতে শিশুর ভয় জাগে।

(৬) সর্ব্বদা আশ্রয় পেলে শিশু ভীরু হয়।

ভয়োদ্রেক হলে স্নায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় ও চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকলে শিশুর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং ভয়ের প্রভাবে সে মিথ্যা ছলনা, কপটতা প্রভৃতির আশ্রয় নেয়, অবশেষে তার নৈতিক অবনতি হয়। অতিরিক্ত ভয়ের ফলে গুরুতর পীড়ারও সৃষ্টি হতে পারে।

ভয়ের সাহায্যে শিশুকে শাসন করা সহজ বলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা শিশুকে নানারূপ ভয় দেখাই। এই পদ্ধতি কখনই স্থায়ী হয় না তাই

কোন লাভও হয় না। তবে একথাও ঠিক যে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ভয়কে আমরা কখনই সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করতে পারি না সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এর প্রয়োজনও আছে। তাই ভয়কে নির্ম্মূল করবার অসম্ভব প্রয়াস না করে তাকে নিয়ন্ত্রিত ও মার্জ্জিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পিতামাতা ও শিক্ষকের ভালোবাসা হারাবার ভয়, কোন প্রিয় বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি শিশুর মনে থাকলে অপকারের পরিবর্ত্তে উপকারই হয়ে থাকে।

অহেতুক ভয় যাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হতে পারে তার জন্য মনস্তত্ত্ব-বিদগণ কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সেগুলি নীচে দেওয়া হলো :—

(১) ভয়ের কারণগুলি দূর করে ফেলতে হবে।

(২) শিশুর শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু ভয়োদ্রেক হলে চিকিৎসা করাতে হবে।

(৩) কোন জিনিষ বা প্রাণী দেখে অকারণে ভয় পেলে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলে ভয় দূরীভূত হয়।

(৪) ভয়োদ্দীপক ইঙ্গিত করা উচিত নয়।

(৫) সাহসী লোকের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(৬) প্রয়োজনাতিরিক্ত আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। শারীরিক বিপদের সম্মুখে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া ভালো।

(৭) অন্যকে সেবা, অন্যকে রক্ষা করতে শিক্ষা দিলে, কুসংস্কার দূর করলে শিশু ভয়কে উপেক্ষা করতে শিখবে।

যোধন প্রবৃত্তি—শারীরিক কোন ক্ষতির আশঙ্কা হলে কোন কোন শিশু যেমন পলায়ন করে, তেমনি অনেক শিশু আবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে। সুস্থ, সবল শিশুমাত্রেই অন্য শিশুর সহিত মারামারি করতে বা কৃত্রিম যুদ্ধ করতে ভালবাসে। এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, প্রতিযোগিতায় উৎসাহ পায়, শারীরিক শক্তি অর্জ্জনে ইচ্ছা জন্মে, অন্যের উপরে কর্তৃত্ব করবার আগ্রহ হয় এবং জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে শেখে। এই প্রবৃত্তির ফলেই সে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং পরিণত বয়সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করতে এগিয়ে আসে।

এই প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধনের জন্য অভিভাবকগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে শিশু দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার না করে, অন্যায় প্রতিযোগিতার সুযোগ না পায় এবং অন্যের অনিষ্ট না করে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর যোধন

প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠার কারণ হলো যে সে তার শারীরিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র খুঁজে পায় না। সেইজন্য নানা দলগত খেলা, সাহসের খেলা, প্রতিযোগিতামূলক খেলার প্রবর্ত্তন করে শিশুর অতিরিক্ত শক্তিকে ব্যবহার করতে সুযোগ দেওয়া হলো এই প্রবৃত্তি সংযমের প্রকৃষ্ট উপায়।

সংগ্রহ প্রবৃত্তি—স্বাধিকার বোধ হতেই সংগ্রহ প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। "আমার মা", "আমার জামা", "আমার পুতুল" প্রভৃতি কথা তার মুখে সর্ব্বদাই শোনা যায়। তারপরে নানা জিনিষ নিজের বলে সে সংগ্রহ করতে সুরু করে। কতকগুলি জিনিষ তার সম্পূর্ণ নিজের বলে ঘোষণা করে দিলে সে সেগুলিকে বিশেষরূপে যত্ন করে। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই তার জামা, কাপড়, পুতুল, খেলনা, বইপত্র স্বতন্ত্র করে দেওয়া ভালো। দুই তিনজন ছেলেমেয়েকে খুব একটা চিত্তাকর্ষক খেলনা দিলেও তারা সেটার বিশেষ যত্ন করে না কিন্তু সেই জিনিষটি নিজস্ব করে দিলে যত্ন বৃদ্ধি পায় ও রক্ষা করবার ইচ্ছাও প্রবল হয়। এইভাবে শিশুর দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে।

নিজস্ব করে জিনিষ পেতে হলে যে কষ্ট করতে হয়, পরিশ্রম করে জিনিষ সংগ্রহ করতে হয়, এ শিক্ষা শিশুকে দিতে হবে। কৌতূহল প্রবৃত্তি, খেলার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলে তাকে প্রকৃতি হতে ফুল, লতা, পাতা, কীট, পতঙ্গ সংগ্রহে উৎসাহ দিলে তার নিজস্ব করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে সংগ্রহ প্রবৃত্তি সবল হয়ে উঠবে। এই প্রবৃত্তি পুষ্ট হলে সৃজনীস্পৃহা ও গঠন প্রবৃত্তিও বিকাশলাভ করে। সত্য করে, সংগ্রহ প্রবৃত্তি হতে গঠন প্রবৃত্তি অনেক উচ্চ স্তরের, সেইজন্য সংগ্রহ করবার ইচ্ছা হাতে সর্ব্বদাই গঠন-মূলক হতে পারে এইজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে।

অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের যেমন ব্যক্তিগত মালিক হওয়ার ইচ্ছাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত অন্যদিকে দলগত মালিক হওয়ার ইচ্ছাকেও সজাগ করতে হবে। তাদের যেমন স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব কতকগুলি জিনিষ দেওয়া হবে তেমনি সকলের ব্যবহারের জন্য, সকলের মঙ্গলের জন্যও তাদের হাতে নানা জিনিষের ভার দেওয়া উচিত। যথা, দলগত খেলার জিনিষ, ফুলবাগান ইত্যাদি তারা মিলিতভাবে যত্ন ও রক্ষা করতে শিখবে। শ্রেণীতে কোন জিনিষ রেখে সকলকে একত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অন্যের অধিকার মেনে চলা একটি বিশেষ সামাজিক শিক্ষা, স্বাধিকার-বোধ এই শিক্ষাকে যেন কোনক্রমেই অতিক্রম না করতে পারে এইজন্য সযত্নে শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে তোলা উচিত।

সংঘ প্রবৃত্তি—শিশুমাত্রেরই দলবদ্ধ হওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। খুব ছোট শিশুকেও কোন ঘরে একা রাখলে সে কাঁদতে সুরু করে। চার পাঁচ বৎসর বয়স হতেই তার সংঘ প্রবৃত্তি সজাগ হয়। ক্রমে এই প্রবৃত্তি আরও প্রবল হয়ে মানুষকে সমাজ গড়ে তুলতে প্রেরণা দেয়। এই প্রবৃত্তি যাতে সবল হয়ে ওঠে সেইজন্য নাচ, গান, খেলা, অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে সহযোগিতামূলক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন।

প্রথমে শিশুদের দলবদ্ধ হওয়ার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। খেলবার উদ্দেশ্যে তারা এক জায়গায় একত্র হয় বটে, কিন্তু সামান্য কারণে বিবাদ হলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আট নয় বৎসর হতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা কাজের জন্য সংঘ গড়ে তোলা যায়। ক্রমে তারা বুঝতে পারবে যে যৌথভাবে দায়িত্ব গ্রহণ না করলে অনেক কাজই সুসম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষকের উপদেশবাণীতে যে সকল গুণ শিশু সহজে আয়ত্ত করতে পারে না, অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা পরস্পরকে দেখে সেগুলি শিখে ফেলে। এ ছাড়া শৈশব হতেই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখলেই তারা ভবিষ্যতে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে পশ্চাদপদ হবে না।

শিশুকে শিক্ষাদানকালে তার সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি যাতে যথার্থভাবে উদ্বোধিত হতে পারে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। যেক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধন বা পরিমার্জ্জন প্রয়োজন সেক্ষেত্রে শিক্ষিকা কিভাবে শিশুকে উদগতির পথে নিয়ে যাবেন সে বিষয়েও বিশদ বর্ণনা দেওয়া গেল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষক শিক্ষিকার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শিশু তার প্রবৃত্তিগুলিকে যথাযথভাবে লালন, দমন বা সংযত করতে পারছে না। এই ক্ষেত্রে তার গৃহ পরিবেশ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে পিতামাতা শিশুর আচরণাদির ক্রম-অভিব্যক্তি বুঝতে না পেরে তাকে অতিরিক্ত শাসন করেন, এতে ফল হয় বিপরীত। শিশুর স্বভাব হয়ে ওঠে উত্তেজিত ও আক্রোশপরায়ণ।

মনের ইচ্ছাগুলি কৃত্রিম উপায়ে অবদমিত হয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে তার থেকে শিশুকে মুক্তি দিতে হবে। এইজন্য শিশুর অতৃপ্ত বাসনাগুলি যাতে উপযুক্ত উপায়ে তৃপ্ত হতে পারে সেইরূপ পথের সন্ধান তাকে দেওয়া চাই। পরিণতবয়স্ক মানব, জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে তার আবেগ অনুভূতিগুলিকে সংযত ও উন্নততর সংস্কারের পথে ক্রমাগত পরিচালিত করবার উপায় খুঁজে পেয়েছে। পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা, গান, বাজনা, গল্প, শিক্ষাসাধনা ও শিল্প-কলা চর্চ্চার

মাধ্যমে সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের অদম্য নাগপাশ হতে সে কিছুটা মুক্ত হতে পারে। ক্ষুদ্র অসহায় শিশু এরূপ মুক্তির সন্ধান তো পায় না, তার সম্ভাবনাও জানে না। ভাষায় সে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, অপরের মনোভাবের সঙ্গে আপন মনের সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায় কিভাবে, তাও সে বুঝতে পারে না। তার প্রতিরুদ্ধ প্রবৃত্তিসকল তাকে পাগল করে তোলে। আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিশু সফল হতে না পেরে আত্মহারা হয়ে নানা অসামাজিক কাজ করে। তার মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি-সকল সুপ্ত হয়ে থাকে তারা এই সময়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তখন ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে সৃষ্টিধর্ম্মী প্রবৃত্তিগুলি ক্ষণকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে যায়। শিশু তখন চারিপাশে যা কিছু পায় ভেঙ্গে চূরে ফেলে, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মারপিঠ করে, পশুপাখীকে পীড়ন করে। চরিতার্থতার পথে বাধা পেয়ে শিশু সাময়িকভাবে অসামাজিক হয়ে ওঠে।

শিশুচিত্তের এই আবেগ উচ্ছ্বাসময় সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে তাকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো খেলা। পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাকে এই উপায়টিকে অবহেলা করলে চলবেনা। শিশুজীবনে খেলাধূলার স্বভাবসিদ্ধ প্রাধান্য দেখে ক্রীড়াপ্রবণতা একটি সহজাত প্রবৃত্তি কিনা, সে সম্বন্ধে শিক্ষাবিদগণ বহু গবেষণা করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে নানা অনৈক্য আছে বটে, কিন্তু খেলার মাধ্যমেই যে শিশুর আবেগ অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে প্রকৃষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে—এ সম্বন্ধে কোন শিক্ষাবিদেরই আজ সন্দেহ নাই। নিজের খেয়াল ও খুশিমত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর সাহায্যে, কিম্বা কোন সাহায্য না নিয়েই তার নিজের ইচ্ছায় সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায় শিশু যখন খেলা করে তাতেই তার প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ হয় যে কোন কাজই যখন শিশু স্বকীয় অন্তর্নিহিত কামনা ও ইচ্ছার প্রেরণায় ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসাহের সঙ্গে নিজের আনন্দ ও আত্মপ্রসাদের নিমিত্ত করে থাকে তাকেই স্বাধীনখেলা বলে থাকেন মনস্তত্ত্ববিদগণ।

প্রস্তুতিবাদ—খেলা সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, যে-সকল শিক্ষাবিদ খেলাকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি মনে করেন, কারল্ গ্রস (Karl Groos) তাঁদের অন্যতম। তিনি বলেন যে, ভাবীকালের জীবন-সংগ্রামের জন্য শিশু খেলাচ্ছলে নিজেকে প্রস্তুত করে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সময় যে জীব যত বেশী অপরিণত অবস্থায় থাকে, সে জীব তত বেশী খেলাধূলার সাহায্যে স্বকীয় পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় সাধন করে নেয়। যেমন, মুরগীর বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়েই মায়ের সঙ্গে

খুঁটে খুঁটে খাবার খায়, কিন্তু বিড়াল বা কুকুরের ছানা জন্মাবার বহুদিন পর্য্যন্ত খেলাধূলার মাধ্যমে শিকার-সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়। দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে যে জীবের বুদ্ধি বা মেধার অনুক্রম যত বেশী, সেই জীবই তত বেশী চঞ্চল ও লীলা-প্রবণ। কেননা, বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যহই নিত্যনূতন উপায় উদ্ভাবন করে সে অপরিণত অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় এসে পৌছায়।

উন্নত জীব এইভাবে সর্ব্বদাই নিত্যনূতন খেলার উপায় উদ্ভাবন করে কেন? কার্‌ল্ গ্রুস বলেন যে, জৈবিক প্রয়োজনেই উচ্চস্তরের জীব খেলাধূলায় মত্ত হয়। প্রাণিজগতে নিম্নস্তরের জীবগুলি জীবনযুদ্ধের উপযুক্ত আয়ুধ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, তাদের এবিষয়ে শিক্ষানবিশী করবার প্রয়োজন হয় না। তাদের স্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন তাদের ব্যবহার এবং নিতান্তই নির্দ্দিষ্ট ধরনের হয়ে ওঠে তাদের জীবনবিকাশ। তাই তাদের জীবনে বিবিধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না, খেলাধূলার নানাপ্রকার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু উন্নত জীব পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জীবনযাত্রাপথে একটা ব্যবস্থামূলক সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়। সেই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য যদি সে রক্ষা করতে পারে তবেই সে বাঁচে, নতুবা ক্রমশঃ অবদমিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইজন্যই উচ্চস্তরের মধ্যে প্রবৃত্তিগত লীলাপ্রবণ চঞ্চলতা সুস্পষ্ট; নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে তা নয়।

পুনরাবৃত্তিবাদ—প্রস্তুতিবাদ মতধারার তীব্র সমালোচনা করে স্ট্যান্‌লী হল্ (Stanley Hall) বলেন যে, খেলার প্রাথমিক ও আদি বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করা হয়েছে জীবন-প্রস্তুতিবাদে। খেলার প্রেরণার উৎস অতীতে নিহিত (Recapitulatory Theory), ভবিষ্যতে নয়। অর্থাৎ, খেলা মানবজাতির অতীতের স্মারক, ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস নয়। মানুষের অতীত জীবনের ইতিহাসে আমরা নগ্ন বর্ব্বরতার বহু দৃষ্টান্ত পাই, এবং অতীত যুগের যুদ্ধবিগ্রহে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতার কাহিনীগুলি মানুষ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতে পারে না। তাই ক্রীড়া কৌতুকের মাধ্যমে শিশু সেই অতীত জীবনাভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়। স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে খেলাধূলার ভিতর দিয়ে অতীত বর্ব্বর যুগের ক্রিয়াকলাপের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনই বা কি এবং তার লক্ষ্যই বা কি? এর উত্তরে সট্যান্‌লী হল্ বলেন যে অতীতের বর্ব্বরতার পুনরাবৃত্তি করে শিশুগণ তাদের আদিম আচরণগুলিকে উৎকর্ষণের পথে চালনা করে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে প্রকৃত বর্ব্বর আচরণ হতে বিরত থাকতে পারে তারই জন্য শিশু এমনতর অভিনয় করে।

ক্রীড়াতত্ত্ব সম্পর্কে এই দুই বৈজ্ঞানিকের মত আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী হলেও, মূলতঃ কিন্তু তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই মতবাদ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। খেলাচ্ছলে ভবিষ্যতের জীবন পদ্ধতির মহড়া দিয়ে এক দিক থেকে মানবশিশু যেমন জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়, অন্যপক্ষে তেমন আবার অতীত যুগের বর্ব্বর কর্ম্মপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে উৎকর্ষণের দ্বারা অসামাজিক আচরণগুলিকে মূলেই বিনষ্ট করে। প্রফেসর নান্ (Nunn) বলেন যে, খেলার মধ্যে শিশুর যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখা যায়, তার প্রেরণা রয়েছে মানবজীবনের সংরক্ষণপ্রয়াসের (Mneme) মধ্যে, এবং জীবনপ্রয়াসের (Horme) বশেই শিশু তার পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবহারগুলি শুদ্ধতর করে উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। (৮) লাফালাফি, দাপাদাপি বা হট্টগোলে শরীরের উৎসাহ ও শক্তি ক্ষয় করে মানবশিশু যখন সংযত হতে শেখে, তখন দেখা যায় স্ট্যান্‌লী হল্ কর্ত্তৃক বর্ণিত পুনরাবৃত্তি ও উৎকর্ষণপ্রবণতা ধীরে ধীরে তাকে জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শারীরিক শক্তি অপেক্ষা যখন শিশু বুদ্ধি ও কল্পনা প্রভৃতির পরিচয় দেয় তখন কার্‌ল্ গ্রুসের জীবন-প্রস্তুতিবাদ সিদ্ধান্তের দ্বারা তার লীলাপ্রবণতার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাবাদ—ম্যকডুগাল (McDougall) বলেন যে, জীবমাত্রেরই কর্ম্মপ্রবণতার ভিতরে আমরা যে সকল আবেগ অনুভূতির পরিচয় পাই সেগুলি এক একটি বিশিষ্ট এবং মূলতঃ সহজ প্রবৃত্তির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়। তাঁর মতে খেলাধূলার মূল প্রেরণা হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রবৃত্তি (Rivalry)। এই প্রবৃত্তিটি ঠিক যোধন বা যুযুৎসা প্রবৃত্তি নয়, কেননা যোধন প্রবৃত্তিবশে আমরা শত্রুকে বধ করতে চাই, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বি-প্রবৃত্তির ফলে আমরা বিপক্ষকে কেবল পরাভূত করে জয়ী হতে চাই। ম্যাকডুগালের এই মত সর্ব্বদা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, শিশুর খেলার মধ্যে কোন তাৎপর্য্যগত ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার প্রচেষ্টা আমরা খুঁজে পাই না। কোন একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে শিশু খেলে না এবং এক ধরনের খেলাতেও কেউ সারাক্ষণ মেতে থাকে না। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, খেলায় উচ্ছ্বসিত শিশুর ব্যবহারে যে সকল কর্ম্মপ্রবণতার সৃষ্টি হয় তাতে সর্ব্বদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয় না। তাই

---

(৮) "The atavistic factors are the mnemic basis from which the child's forward-directed horme proceeds while the cathartic action of the play is the sublimation of the energies associated with them." Education: Its Data and Principles. Nunn. Pp 83-84

মনে হয় যে, নিছক খেলার আনন্দেই শিশুরা খেলা করে, তার পশ্চাতে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই।

পরিবাহবাদ—(**Surplus Energy Theory**) নিছক আনন্দলাভের জন্যই জীবশিশুর খেলার স্ফূর্তি হয় বটে, কিন্তু অফুরন্ত উল্লাস অভিব্যক্তির অবিরত শক্তি সামর্থ্য আসে কোথা থেকে? এ প্রশ্নও মনে জাগে। তদুত্তরে শিলার (Schiller) ও হার্ব্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বলেন যে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি ও বিকাশলাভ করে জীবদেহে স্বভাবতঃই অতিরিক্ত শক্তি সামর্থ্য (Surplus energy) সঞ্চিত হয় এবং সেই অতিরিক্ত শক্তি সামর্থ্য খেলার হয়রাণিতে ক্ষয় পায়। ইঞ্জিনের "বয়লার" এ যেমন বাষ্পাধিক্য হলে "সেফটি ভ্যালভ" দিয়ে তা' বার করে দিতে হয়, নতুবা বয়লারটি ফেটে যেতে পারে, তেমনি অতিরিক্ত জীবনীশক্তি শিশুর শরীরে ও মনের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে ক্রীড়ার সাহায্যে এই প্রাচুর্য্য যাতে ক্ষয় পেয়ে শরীর ও মনের সমতা রক্ষিত হয় তারই ব্যবস্থা করেছেন প্রকৃতিমাতা। কিন্তু "বয়লারের" বাষ্প পরিবাহের তুলনাটি শিশুর খেলাধূলাজনিত শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাটে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে—কেননা শিশু লাফালাফি করে শক্তি ব্যয় করে বটে কিন্তু এই সঙ্গে তার যে অঙ্গ চালনা হয়, তদ্দ্বারা সে অধিকতর দক্ষতা অর্জ্জন করে থাকে। সুতরাং খেলাধূলায় শক্তির অপচয় হয় বলে আমাদের যে ধারণাটি বদ্ধমূল আছে তা সত্য নয় কেননা, পরোক্ষে এতদ্দ্বারা শিশু নিয়তই নবতর শক্তিলাভ করে দেহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

আচরণবাদ—উডওয়ার্থ (Woodworth) প্রমুখ আচরণবাদী পণ্ডিতগণ শিশুর খেলার মধ্যে জৈব প্রয়োজনের কোন যোগাযোগ লক্ষ্য করেন না। তাঁরা বলেন, খেলার দ্বারা শিশু জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয় না এবং অতীত সংগ্রামের পুনরাবৃত্তিও করে না। উপযুক্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হলে শিশু যে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাকেই আমরা খেলা বলি। খেলনাগুলি শিশুচিত্তে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তাতেই শিশু খেলতে সুরু করে।

আনন্দাভিযানবাদ—(**Recreation**) সারাদিন একঘেঁয়ে জীবন হতে অব্যাহতিলাভের জন্য জীবমাত্রেই নানা উপায় উদ্ভাবন করে থাকে। এই উপায়গুলির মধ্যে একটি হলো খেলা। সেইজন্য শিশুর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে খেলাও একটি বিশিষ্ট আনন্দময় কাজ। এই জাতীয় ক্রীড়াকে চিত্তবিনোদনকারী ক্রীড়া বলা যেতে পারে।

সমানুভূতিবাদ—খেলা সম্বন্ধে লীপ্‌স (Lipps) যে মত প্রকাশ করেছেন, তাকে সমানুভূতিবাদ বা Theory of Empathy বলা যেতে পারে। কোন জিনিষের সঙ্গে একাত্মবোধ করাকেই সমানুভূতি বলা হয়। ছেলেমেয়েরা কি অসীম আগ্রহে ও গভীর মনোযোগের সহিত ঘুড়ি উড়ায়, উদাহরণস্বরূপ তারই উল্লেখ করেছেন তিনি। আকাশে বিচরণের ক্ষমতা মানব শিশুর নাই, কাজেই আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে সে নিজে বাহাদুরীর গৌরব ও আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। প্রকৃতির বা মানুষের বিরুদ্ধ শক্তিকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতায় যে আত্মপ্রসাদ সে লাভ করে তাতেই শিশু খেলার আনন্দ পায়। (৯)

ক্ষমতালিপ্সাবাদ—অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুরা পিতামাতা ও পূর্ণবয়স্ক আত্মীয়স্বজনের কাজকর্ম্ম অনুকরণ করে। এই অনুকরণের ধরনটি ঠিক ভাবীকালের প্রস্তুতির জন্য নয়, কিন্তু শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে বড়দের তালে তাল রেখে চলার চেষ্টা করে থাকে। নানা প্রচেষ্টায় নিরন্তর বাধা পায় বলে, খেলার ভিতর দিয়ে সে বড়দের কাজকর্ম্মের অনুকরণ করে। এই আচরণকে বারট্র্যাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) বলেন "Will to power" অর্থাৎ ক্ষমতা লিপ্সা।

অনুকর্ষী পুনরাবৃত্তিবাদ—ফ্রয়েড বলেন যে, সাধারণতঃ আমরা মনে করে থাকি যে নিছক আনন্দের জন্যই শিশু খেলে। কিন্তু দুঃখতাপের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্যও অনেক শিশু খেলায় প্রবৃত্ত হয়। একবার আমাদের শিশুনিকেতনে দেখা যায় যে, একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে তার পুতুলটিকে বার বার বালি চাপা দিচ্ছে এবং বার বার বের করে বালি ঝেড়ে ফেলে তাকে আদর করছে। সন্ধান করে জানা গেল যে ছেলেটির মা কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। শিশুটি মাতৃবিয়োগের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তার অতি প্রিয় খেলনাটি ইচ্ছা করেই দূরে সরিয়ে ফেলে প্রিয়জনবিরহজনিত যাতনা সহ্য করতে চেষ্টা করছিল। তার মা আবার ফিরে আসুন, এই ইচ্ছাটি তার মনে পূর্ণমাত্রায় থাকায় পুতুলটির গায়ের বালি ঝেড়ে ফেলে আবার পরম আদরে সেটিকে কোলে তুলে নিচ্ছিল। দুঃখময় অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির দ্বারা মনের স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাকে অনুকর্ষী পুনরাবৃত্তিবাদ বা Repetition Compulsion বলা হয়।

---

(৯) সমরসেট মম্ এর "ঘুড়ি" গল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।
"The Kite"—Sometset Maugham.

বিশোধকবাদ—(Catharsis) খেলা সম্বন্ধে আর একটি বিশিষ্ট মত এই যে, খেলা হলো চিত্ত-বিশোধক। এই মতানুসারে খেলার একটি ভাব-বিরেচক প্রভাব আছে। যেমন, বিয়োগান্ত নাট্যাভিনয় দর্শন ও উপভোগ কালে আমাদের নিরুদ্ধ মানসিক ভাবাবেগ মুক্তি লাভের সুযোগ পায়। করুণরস আমাদের চিত্তের অবদমিত, অনিষ্টকারী ভাবাবেগগুলিকে প্রকাশ করবার সুবিধা দিয়ে অন্তর ও মনকে পরিশুদ্ধ করে। এতে আমাদের হৃদয়ের গুরুভার লাঘব হয়। শুধু কেবল করুণরসই নয়—ব্যঙ্গকৌতুক, রঙ্গরস, হাস্যরসের দ্বারাও এই পরিমার্জ্জক ও পরিশোধক কাজটি হয়। আমাদের জীবনে নিয়তই যে সব ভাবের দ্বন্দ্ব ও অবদমন ঘটে, যে সব কাজ করতে আমরা দ্বিধা বা ইতস্ততঃ বোধ করি, সে সবই আমরা গল্পের, খেলার বা নাট্যভূমিকার নায়কনায়িকার জীবনের, কাজের ও অনুভূতির মাধ্যমে চরিতার্থ করবার সুযোগ লাভ করি, তাদের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, তাদের হাস্যকর কিম্বা দুঃখময় ব্যবহারে এবং সেগুলির পরিণতির দ্বারা আমরা পরোক্ষে স্বীয় চিত্তের তৃপ্তি সাধন করি।

কল্পনাবিলাসবাদ—(Make believe) ক্রীড়াতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কালে কল্পনাবিলাস সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করলে আমাদের প্রাসঙ্গিক বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বয়স্ক লোকের কাছে রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে কল্পনারাজ্যের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে, কিন্তু শিশুর কাছে এই পার্থক্য মোটেও সুস্পষ্ট নয়। জীবনের বহু বিচিত্র ও জটিল অভিজ্ঞতার মধ্যেই ধীরে ধীরে সে কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্য বুঝতে পারে। বাস্তব রাজ্যের বাইরে, কল্পলোকে অবাধ বিচরণের শিশুসুলভ ক্ষমতাটি শিশুমনের অলস বিলাস মাত্র নয়, এটি তার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এই কল্পনার সাহায্যেই সে হয় স্রষ্টা, শিল্পী ও কবি। শিশুর কল্পনাবিলাসকে অনেকে পলায়ন প্রবৃত্তিপ্রসূত বলে থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শিশুর কল্পনাক্ষমতা তার আত্মবিস্তারের সহায়ক।

শিশুর মৌলিক মানসিক সম্পদগুলির সম্পর্কে আলোচনাকালে ক্রীড়াতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন বিশদ আলোচনার অবতারণা নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মতের হেরফের থাকলেও আজ পৃথিবীর সকল দেশে, শিশুশিক্ষা নিয়ে যেখানেই গবেষণা চলেছে, সেখানেই একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেন যে শিশু তার নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় খেলার মাধ্যমে। যে সব পরিস্থিতির মধ্যে সে নূতন তথ্যের সন্ধান পায়, সেই পরিস্থিতিকে চিনতে, বুঝতে ও ব্যক্ত করতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে তার নিজের স্থান কি তারও যথাযথ একটা বিচার ও ব্যবস্থা করতে শেখে। সতত পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতার ফলে শিশুকে তার জীবনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনবরতই ধ্যান ধারণা পরিবর্ত্তন

করতে হয় এবং খেলার সাহায্যেই সে বাস্তব জীবনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যসূত্র খুঁজে নিতে চেষ্টা করে।

শিশুজীবনে খেলা ও কাজের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না। শিশুর খেলার মধ্যে একটা খুব বড় উদ্দেশ্য নিহিত আছে একথা পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাকে ভুলে গেলে চলবে না। পরিণত মানব যেমন তার কাজ কর্ম্মের জন্য নানা উপকরণ চায়, শিশুকেও তেমনি তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম জুগিয়ে দিতে হবে। বস্তু সম্বন্ধে শিশুর কোন পরিষ্কার জ্ঞান নাই, বিমূর্ত্ত বস্তু সে ধারণা করতে পারে না অথচ নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে তার অপরিসীম কৌতূহল। এই পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো শিশুশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ হতে উপকরণ সংগ্রহ করে তার হাতে তুলে দেওয়া পিতামাতা ও শিক্ষকের বিশিষ্ট দায়িত্ব। খেলনাগুলি যাতে বয়সোপযোগী হয়, যাতে সেগুলির দ্বারা শিশুমন সক্রিয় হয়ে ওঠে, যাতে তার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিচার, স্মৃতি, কল্পনা ও সৃজনীশক্তির উন্মেষ হয়ে সে অখণ্ড মননশীলতা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা নিতান্তই প্রয়োজন।

সুবিস্তৃত জগতে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিশুজীবনের বিকাশব্যঞ্জনা কেবল রহস্যজনক নয়, রীতিমত সমস্যাসঙ্কুল, একথা শিক্ষকসমাজে আজ অবিদিত নয়। তাই আজ শিশুমনের বিকাশগতি লক্ষ্য করে তার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলেছে শিশুনিকেতনগুলিতে। এইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র যাতে ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে শিশুসমীক্ষার গবেষণাগারে পরিণত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে পিতামাতা ও শিক্ষকশিক্ষিকাগণ অশেষ উপকার লাভ করবেন এবং তাঁদের সাহায্যে শিশুরা শিক্ষাদীপ্ত জীবনগতিপথে সাফল্য লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থসূচী :—

W. McDougall—Social Psychology.

T. P. Nunn—Education: Its Data and First Principles.

J. B. Watson—Psychological Care of Infant and Child.

J. Drever—Instincts of Man.

C. W. Valentine—The Psychology of Early Childhood.

G. F. Stout—Manual of Psychology.

প্রতিভা গুপ্ত—সমাজ ও শিশুশিক্ষা

তৃতীয় অধ্যায়—অবাধ খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ

———

১ মাস

১½ মাস

২ মাস

৩ মাস
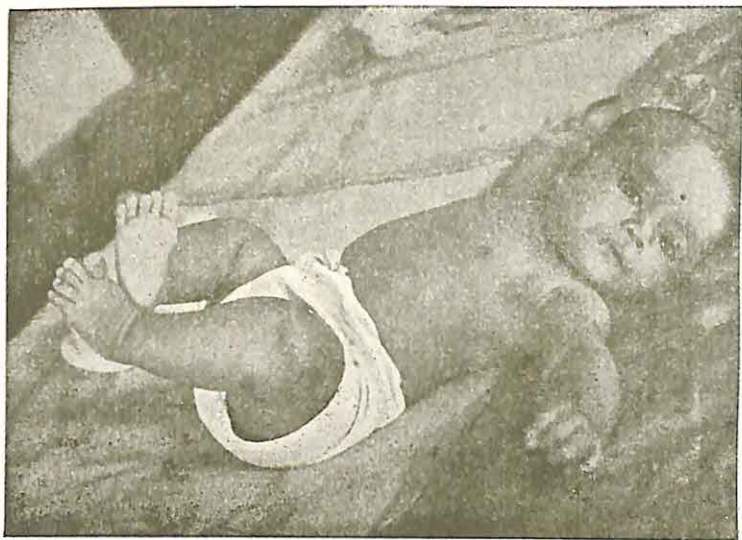
৩ মাস

৪ মাস

৫ মাস

৬ মাস

৬ মাস

৭ মাস

৮ মাস

৯ মাস

১০ মাস

১০ মাস

১১ মাস

১১ মাস

১২ মাস

১৪ মাস
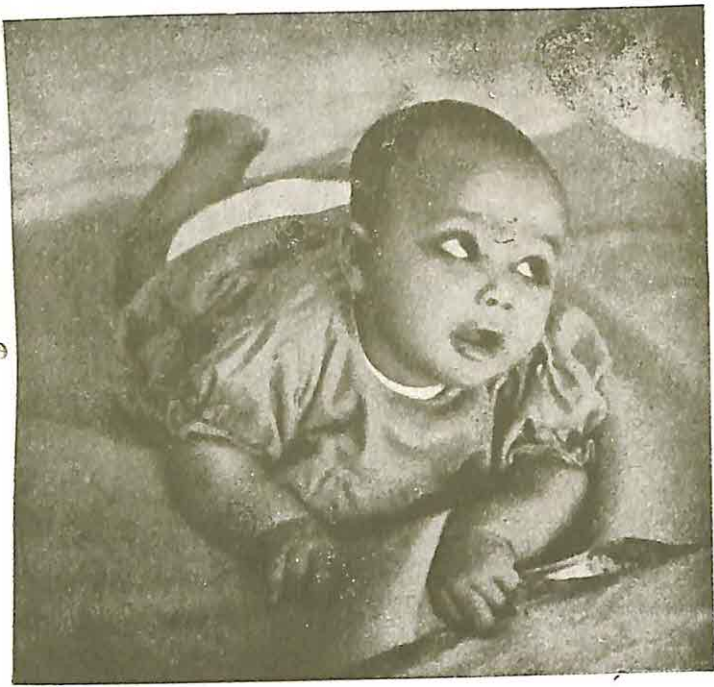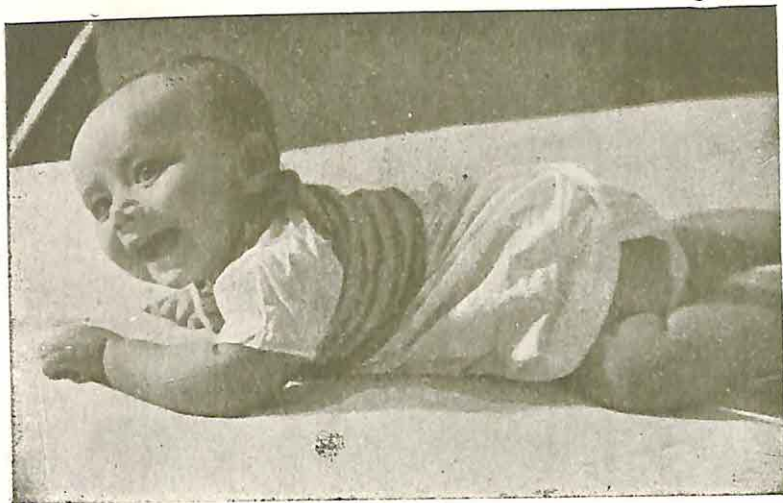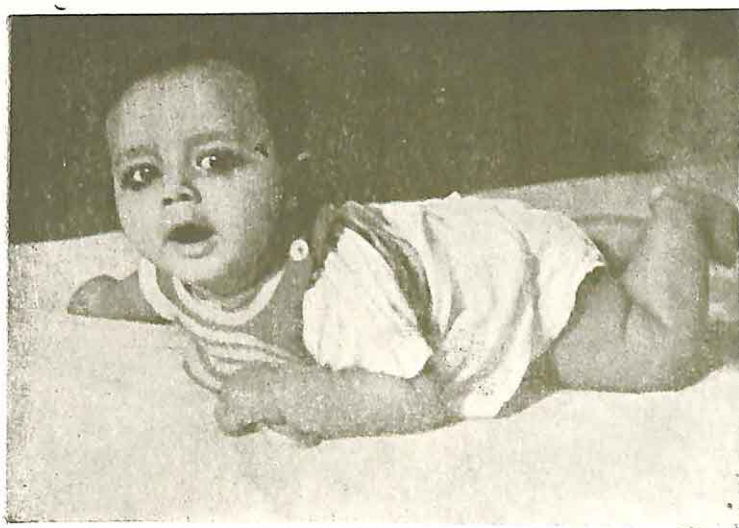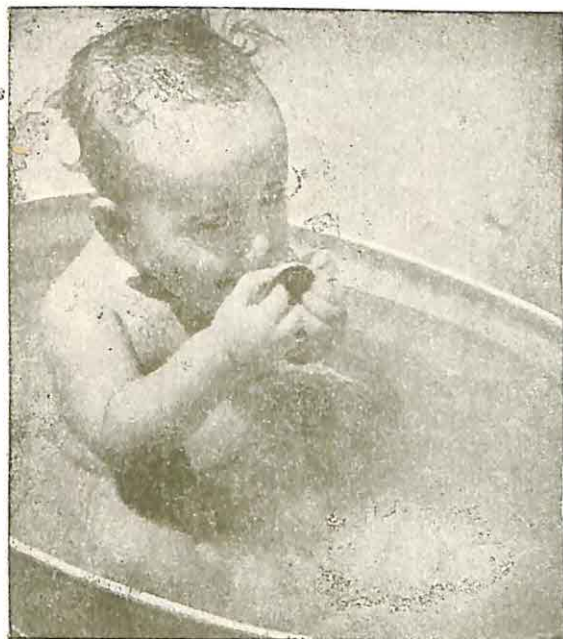
১৫ মাস
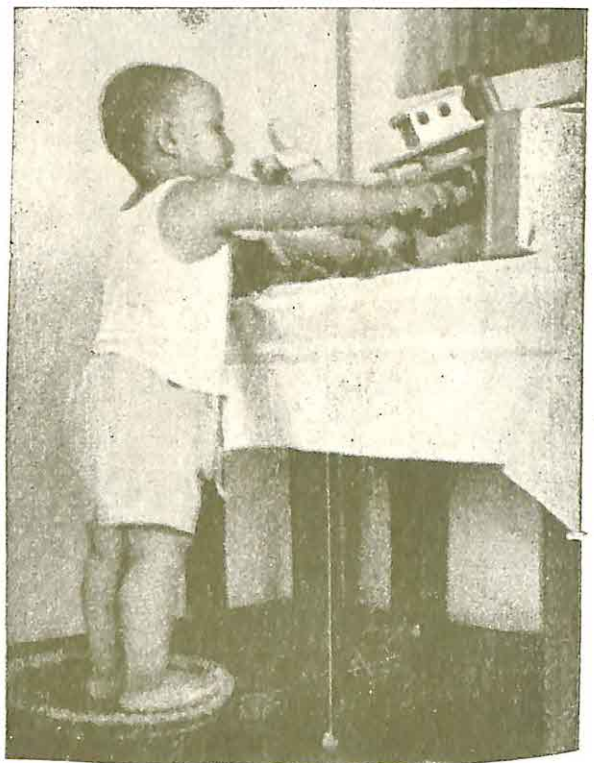
১৭ মাস

১৮ মাস

২৪ মাস

৩০ মাস

তন্মনস্কতা ও মনোযোগ
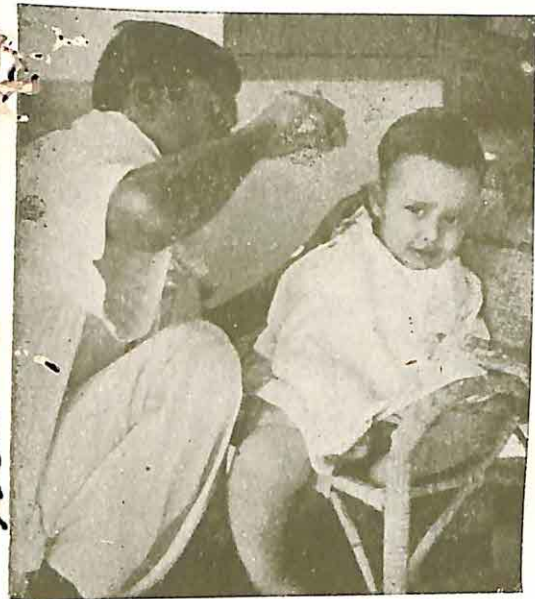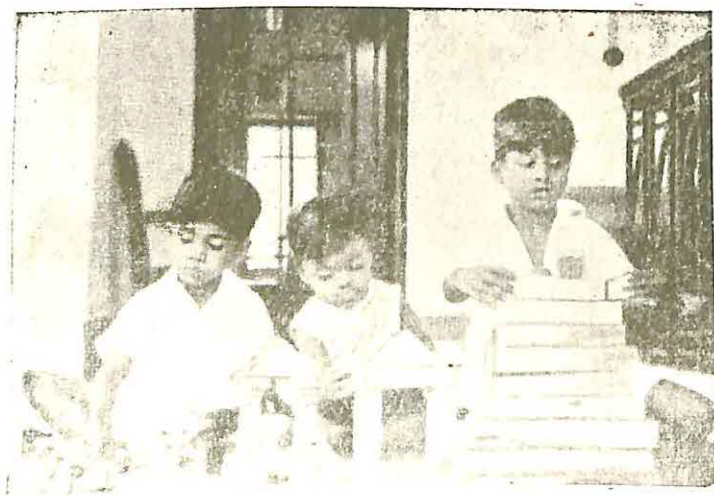
খেলা ও সামাজিকতা

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাণপ্রবাহে শিশুর জীবন-পরিচয়

প্রাণপ্রবাহে শিশুর জীবন-পরিচয়

কবি বলেছেন, "প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাহাকে চলিতেই হইবে।" এই প্রাণ-প্রবাহের গতি, স্বভাবের নিয়মে অবিরত ধারায় চলে, কোথাও রুদ্ধ হয়ে যায় না। প্রকৃতির নিয়মেই শিশুর জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটে থাকে; তবে কেন মানবশিশুর দেহ মনের গভীরতম দেশটিকে নিয়ে আমাদের এত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য? এ প্রশ্ন মনে জাগা অসম্ভব নয়।

নবীন বিস্ময়ে ও সতেজ কৌতূহলে শিশু বহিঃসংসারের সঙ্গে পরিচয়সাধন করতে আসে, সহজে ও অকৃত্রিম বিশ্বাসভরে। এই সময়ে তার গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি ও চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে থাকে, এবং ক্রমে সে তার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ পরিবেশে, স্বচ্ছন্দমনে ও অবাধে বিচরণ করতে চায়। শিশুর এই বিশ্বাসনিষ্ঠ, সরল, সুন্দর জীবন ও বয়স্কের জটিল এবং দুর্গম জীবনযাত্রার মধ্যে আছে এক বিরাট ব্যবধান। স্বভাব ও নিয়মের সেই সীমারেখা দুটি সহজে মিলিয়ে দেওয়া হলো পিতামাতা ও শিক্ষকের বিরাট দায়িত্ব, তাই আজ শিশুকে জানতে ও বুঝতে আমাদের আগ্রহ এত অসীম ও গভীর।

আজ সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন যে শিশুর জগৎ ও পূর্ণবয়স্কের জগৎ এক নয়। শিশু তার নিজস্ব জগতে যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় সেগুলির সঙ্গে তাকে বারবার সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে হয়, কেননা সে নিজের সত্তায় স্বতঃপ্রতিষ্ঠ হতে চায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশুর এই আপ্রাণ চেষ্টাকে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি সহানুভূতির চক্ষে দেখেন না এবং তখনই হয় সংঘাত ও জটিলতার সৃষ্টি। শিশুকে আমরা ভালোবাসি বটে, কিন্তু তার জীবন-প্রচেষ্টার যে প্রবাহ—তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলবার আমাদের সময় কোথায়? পরিপূর্ণ মানবজীবনের উদ্দাম, চঞ্চল ও অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে শিশুর জীবন তো তাল ও ছন্দ বজায় রাখতে পারে না। জীবনের সঙ্গে ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপন করবার জন্য শিশুর জীবনীশক্তির যে নিত্য নূতন প্রকাশ, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অবসর পূর্ণবয়স্কের কোথায়? শিশু যে কেমন করে আমাদের অলক্ষ্যে, নিঃশব্দ চরণে, নূতন জীবনীশক্তিতে তার জীবনপথে অবিশ্রাম ছন্দে অগ্রসর হয়ে চলেছে একথা আজ আমাদের জানতেই হবে নতুবা তার প্রাণপ্রবাহের গতিকে সহজ পথে চালনা করা কোনমতেই সম্ভব হবে না।

শিশুকে কি ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে, এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই। একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলে হয়তো শিশুপর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মাতে পারে এবং এই তথ্যগুলি জানা থাকলে জননী নিজের শিশুর বিকাশ বৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য ও প্রেরণা পাবেন।

বয়স……পিতার……মাতার……

উপজীবিকা

স্বাস্থ্য

শিক্ষা

শিশুটি কোন্ (ক্রমিক) গর্ভস্থ সন্তান

অপরাপর ভ্রাতাভগ্নীর বয়স ও স্বাস্থ্য

জন্মের তারিখ

১ম দিন ভোর পাঁচটার সময়ে খোকা জন্মেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১৫ দিন আগেই খোকার জন্ম হলো। ওজন ৫½ পাউণ্ড। হাত পা রোগা, লম্বা ১৭ ইঞ্চি। কয়েক মিনিট পরেই বেশ জোরে কেঁদেছে। আধ ঘণ্টা পরে হেঁচেছে। ৬-৩০ মিঃ সময়ে মুখে স্তন দেওয়াতে বেশ জোরে টেনেছে। একবার ডান চোখ খুলে দেখেছে। একটু ট্যারা বলে মনে হলো। দুই একবার হাই তুলেছে। বেলা ১২টার সময়ে দুটি চোখই এক সঙ্গে খুলেছে। মনে হয় চোখের পেশীগুলি এখনও এক সঙ্গে কাজ করছে না। মাথা তুলেছে। একবার নিজের বুড়ো আঙ্গুল চুষেছে। বেলা তিনটের সময়ে বাবার আঙ্গুলটা বেশ জোরে ধরেছে। খুব জোরে কেঁদেছে। পরে, অল্প দোলা দিতেই ঘুমিয়ে পড়ে। বেলা পাঁচটার সময় জেগে উঠে পায়ের পাতা ঘোরাচ্ছিল। আঙ্গুলগুলি একবার খোলে, একবার বন্ধ হয়। বাতাসের জন্য একবার বেশ জোরে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। খোকা চমকে ওঠে। সন্ধ্যা ৬টার পরে ঘরে আলো জ্বালা হয়, খোকা চোখ মিট্ মিট্ করে। মুখে স্তন দেওয়াতে আরও জোরে টানে, তারপরে ঘুমিয়ে পড়ে। জাগলে পর একটু জল দেওয়া হয়, বেশ চুষে চুষে খায়।

২য় দিন—সারা দিনই প্রায় ঘুমায়। বেলা ৬৷৩০ সময়, একবার স্তন্যপানের চেষ্টা করে। পরে, জল ও 'গ্ল্যুকোজ্' (Glucose) বেশ তৃপ্ত হয়ে খায়। বাবা গালে সুড়্সুড়ি দিলে, ঠোঁটটা নড়ে ওঠে, এবং মাথা ঘুরায়। পায়ের পাতা নাড়ায়। সন্ধ্যা ৭টার সময়, লক্ষ্য করে দেখা গেল যে, নখ দিয়ে গাল আঁচ্ড়ে ফেলেছে।
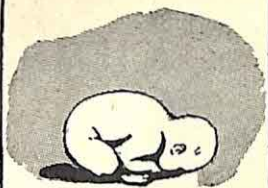
জন্ম মুহূর্তে
০ মাস
থুত্‌নি তোলে
১ মাস
বুক তোলে
২ মাস
ধরবার প্রচেষ্টা
৩ মাস
সাহায্য পেলে বসে
৪ মাস
বসে জিনিষ
ধরতে পারে
৫ মাস
পেশী সমূহের সংহতি
ফলে ঝোলানো জিনিষ
ধরতে পারে
৬ মাস
জন্ম হতে
সাত মাস পর্য্যন্ত
শিশুর শারীরিক
বিকাশ
একা বসতে পারে
৭ মাস
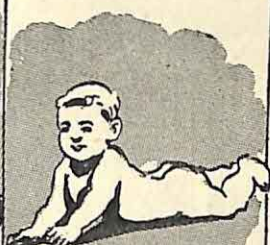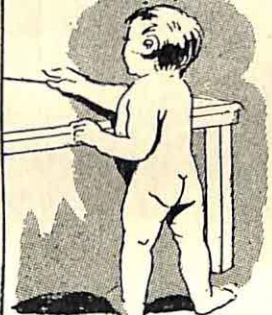
সাত মাস হতে
পনেরো মাস
পর্য্যন্ত শিশুর
শারীরিক বিকাশ

৩য় দিন—আজ বেশ সজোরে স্তন টেনেছে এবং দুধ খেয়েছে। স্নানের জন্যে হাঁটুর ওপর উপুড় করে শোয়ানোতে, কোন জিনিষ আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় হাত-পা নেড়েছে। বাবা নিজের হাতটা কাছে এগিয়ে দিতেই, বাবার আঙ্গুল বেশ চেপে ধরে। খাওয়ার আগে কেঁদেছে। ঝুম্‌ঝুমি বাজাতে, অবাক হয়ে চেয়ে দেখে এবং কান্না থামায়।

৪র্থ দিন—আজ চোখের কাছে একটা রঙ্গীন বল ঘোরানো হয়। বেশ নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করেছে। খাওয়ার আগে মার কাছে নিয়ে যাওয়াতে একটা খুশির শব্দ করে।

৫ম দিন—ঘুম থেকে উঠে, মুখ দিয়ে শব্দ করে, হাত পা নাড়ে, তারপর সজোরে কেঁদে ওঠে। খেতে পেলে শান্ত হয়।

৬ষ্ঠ দিন—প্রায় সারাদিনই ঘুমিয়েছে। আজ রাতে ৮ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। হাতের মুঠি প্রায় খুলে গেছে।

৭ম দিন—চোখের সামনে রঙ্গীন বল ধরাতে, দেখা গেল যে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেছে নিবিষ্ট হয়ে। সরিয়ে নিতে, মনে হলো বলটি খুঁজছে।

৮ম দিন—ঘুম থেকে ওঠবার সময় মুখ চোখ কুঁচ্‌কে ওঠে। মনে হয় যেন মায়ের মুখ চেনবার চেষ্টা করছে। বারান্দায় শুইয়ে দেওয়া হয়, একটা কাক খুব জোরে বিশ্রী শব্দ করে 'কা' 'কা' করে ডেকে ওঠে। খোকা জোরে কেঁদে ওঠে। স্নানের আর খাওয়ার পর তৃপ্তিসূচক শব্দ করে।

৯ম দিন—স্নানের সময় পেটের কাছে হাল্‌কা করে সুড়্‌সুড়ি দিতে বেশ হাসে। স্নানের পর খাওয়ার সময় খাওয়ার জন্য আগ্রহপূর্ণ শব্দ করে।

১০মদিন—স্নানের পর 'ক্লাউট্' পরাবার সময়, পেটের চামড়ায় 'সেফ্‌টিপিন্' এর খোঁচা লাগে, খোকা কেঁদে ওঠে। মুখ চেনবার চেষ্টা দেখা যায়। বালিশের ওপর মাথা ঘুরিয়ে আরাম খোঁজে।

[জননীর পক্ষে এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিশুর জন্ম কথা লিখে রাখা সম্ভব নয়। তিনি কত সংক্ষেপে শিশুর জন্ম বিবরণী লিখতে পারেন তারই একটি উদাহরণ দেওয়া হলোঃ—

জন্ম—২৬শে অগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের একমাস আগেই বাবুয়া জন্মেছে। দেখতে সে রোগা, ছোট্ট, হাত পা কাঠি, কাঠি। ১৭ ইঞ্চি লম্বা, ওজন ৪½ পাউণ্ড।]

প্রথম শিশুটি সম্বন্ধে যে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, দেখা যাক মনস্তত্ত্ববিদগণের পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে এই শিশুটির কার্য্যকলাপের কোন সামঞ্জস্য আছে কি না।

স্তন্যপানের বা চুষবার প্রবৃত্তি জন্ম থেকেই বর্ত্তমান দেখা গেল। জন্মের পর ১২ ঘণ্টা পরেই শিশুটি বেশ আগ্রহের সঙ্গে স্তন্যপানের চেষ্টা করেছে। দুই একবার চোখের দৃষ্টি ট্যারা মনে হলেও, ক্রমশঃ দুই চোখ এক সঙ্গে খুলেছে, এবং চোখের পেশীসমূহ ক্রমশঃ সংহত হয়ে আসছে এমনও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আঁকড়ে ধরবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা যে জন্ম মুহূর্ত্ত থেকেই বিদ্যমান তাও এই শিশুর বেলায় দেখা গেছে। গালে সুড়সুড়ি দিলে ঠোঁট কেঁপে উঠেছে, এবং সেফটিপিনের আঘাতে কেঁদেছে—এতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে শিশু স্পর্শবোধ নিয়েই জন্মায়। কাকের শব্দ শুনে কেঁদে ওঠায় বোঝা গেল যে শিশুর শ্রবণশক্তিও প্রায় জন্ম হতেই কার্য্যকরী থাকে। জন্মকালে হাঁচি, হাইতোলা ইত্যাদি প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতাও বেশ পরিস্ফুট। তৃপ্ত হলে শিশু আরামসূচক শব্দ করে হাসে, তারও প্রমাণ এই শিশুটি জন্মের ১০ দিনের মধ্যেই দিয়েছে কাজেই শিশুবিদগণ যে সমস্ত ক্ষমতাকে মানুষের জন্মলব্ধ ক্ষমতা বলেন, সেগুলি সবই আমরা এই শিশুটির মধ্যে লক্ষ্য করলাম। এইভাবে নিয়মিত ও ধারাবাহিকরূপে শিশুর আজন্ম কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হলে শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে অনেক বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই রকম তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যই বা কি—এতে লাভই বা কি? প্রথমতঃ, শিশুর দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধির সঙ্গে মনের বিকাশ কি ভাবে হয়ে থাকে, এ তথ্য জানবার জন্য আজ মনস্তাত্ত্বিকগণ বিশেষভাবে উৎসুক হয়েছেন। মনের গহনে কখন কোন্ ভাবের খেলা উপস্থিত হয় সে কথা সঠিক জানতে পারলে শিক্ষামনস্তত্ত্বের গোড়ার কথাটাই ধরা যাবে। তখন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি নিজের মনের কামনা-বাসনা, আবেগ অনুভূতির দ্বারা শিশুর সুকুমার মনটিকে রঞ্জিত ও ভারাক্রান্ত করার ব্যর্থ ও ক্ষতিকর প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবেন এবং শিশুকে তার বয়স ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে চিনতে ও বিচার করতে শিখে তার জীবন প্রচেষ্টাকে অধিকতর সাহায্য করতে সমর্থ হবেন।

দ্বিতীয়তঃ, মনস্তাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন মতবাদের কুহেলিকায় আজ মনোজগতের নানা দিক কুয়াসাগ্রস্ত। কোন মনোবিদ বলেন যে, মানুষ জন্ম হতেই কতকগুলি অনর্জ্জিত মৌলিক মানসিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কেউ

বা বলেন, জন্মকালে প্রাণীর কতকগুলি প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতা থাকে মাত্র। সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা, আবেগ-অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে কত যে মতের হের-ফের আছে তার ইয়ত্তা নাই। জন্ম হতে যদি শত শত শিশুর জন্মবৃত্তান্ত মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হতে থাকে, তাহলে অচিরেই মানুষের মানসিক ও শারীরিক সহজাত মৌলিক শক্তি সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকবে না। আজ যে সকল মতামত দ্বিধা ও সন্দেহে জর্জ্জরিত, সেগুলি একদিন সত্যের সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মিপাতে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ, মানুষের প্রত্যেক অন্তর্নিহিত শক্তি কখন, কি ভাবে উন্মেষিত ও বিকশিত হয়, তা অতি শৈশবেই পৃথক পৃথকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এই ক্ষমতাগুলির বিকাশধারা জানা থাকলে শিশুর বয়স ও ক্ষমতানুসারে তাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে—নতুবা পূর্ণ-বয়স্কের নিজস্ব শিক্ষা, অভ্যাস, আচার-আচরণের দ্বারা শিশুর চিন্তা, কল্পনা ও গ্রহণশক্তি সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

চতুর্থতঃ যদি কোন শিশু শারীরিক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়, তাহলে ব্যাধির প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যথা, থাইরয়েড গ্রন্থি রীতিমত কাজ না করলে শিশু ক্রেটিন (Cretin) নামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে জড়-বুদ্ধি হয়ে পড়ে। রোগের লক্ষণ ধরা পড়া মাত্র চিকিৎসার গুণে উপকার পাওয়া যায়। এই রোগ খুব শিশু বয়সে হয়, কাজেই শিশুকে রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করলে রোগ সহজেই ধরা পড়ে। এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু দেখতে এত সুন্দর এবং ব্যবহারাদিতেও তারা এমন সহজ ও অমায়িক যে আত্মীয় স্বজন সকলেই তাকে দেখে খুসী হন। পিতামাতাও তাকে শিক্ষার জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠান এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত লেখাপড়া করবে, এমন আশা করেন। কিন্তু পরে, তার উত্তরোত্তর অবনতি দেখে প্রথমে ক্রুদ্ধ, পরে হতাশ হয়ে ওঠেন। অথচ শিশুটির যে প্রথম হতেই বুদ্ধি অল্প ছিল একথা তাঁদের জানা থাকলে হয়তো তার শিক্ষার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করতেন এবং নিজেরাও হতাশাজনিত মনোপীড়ায় কষ্ট পেতেন না। বিংশ শতাব্দীতে মানসিক ক্ষমতা ও বুদ্ধি পরিমাপের যে যুগান্তকারী উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে তদ্দ্বারা বহু দুঃখজনক অবস্থার প্রতিকার করা যেতে পারে।

অনেক শিশু জন্ম হতেই স্নায়ুবিকারগ্রস্ত থাকে, এবং তাদের বহু যত্নে ও ধীর বিচক্ষণতার সঙ্গে লালন পালন করতে হয়। শৈশবেই যদি এই লক্ষণগুলি ধরা পড়ে, তাহলে তাদের মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতানুযায়ী

শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। আমরা যাদের সমস্যাকীর্ণ (Problem child) শিশু বলে একধারে সরিয়ে ফেলে রেখেছি এবং যাদের সমাজ-শত্রু বলেই বিবেচনা করি, তারাই হয়তো উপযুক্ত-সুযোগ ও শিক্ষা পেলে দেশের বরণীয় নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

ফ্রয়েড্, অ্যাড্‌লার প্রমুখ বহু মনঃসমীক্ষক মনে করেন যে মানবজীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েড্ বলেন যে, "চার পাঁচ বৎসর বয়সেই ক্ষুদ্র মানবশিশু প্রকৃষ্ট পরিণতি লাভ করে।" (১) অ্যাড্‌লার বলেন যে, "জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই নবজাত শিশুর জীবন প্রস্তুতি সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে।" (২)

ফ্রয়েড ও তাঁর শিষ্যগণ বহুবিধ উদাহরণ সংগ্রহ করে পরীক্ষাসিদ্ধ তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, শৈশবে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে শিশুর মনে এমন সব জটিল সমস্যা সঞ্চিত হয়ে থাকে যার সুসঙ্গত মীমাংসা না হলে পরিণত বয়সে সে নানারূপ দুরাচার করে থাকে। প্রাথমিক প্রতিবিধান দ্বারা যেমন শারীরিক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়, তেমনি মনের ব্যাধিরও আশু প্রতিকার নির্ভর করে প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার উপরে। অতি শৈশবেই যদি শিশুর আচরণের বৈষম্যগুলি লক্ষ্য করে সুষ্ঠু পরিবেশে তাকে রীতিমত পরিচর্য্যা করা যায়, তবে সুফল যে অবশ্যই পাওয়া যাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মানুষের আত্মবিকাশ জন্ম হতেই সুরু হয়। সেইজন্য শৈশব হতেই সন্তানের নিজস্ব সত্তা ও ব্যক্তিত্ব পিতামাতাকে বিশেষভাবেই জানতে হবে। বাড়ীর একটি শিশুকে জানলেই সব শিশুকে জানা হয় না। একটি শিশুর পক্ষে যে নীতি কার্য্যকরী হয়েছে অপর শিশুটির পক্ষে তা সমভাবে ফলদায়ক নাও হতে পারে। এই জন্যই আজকাল শিক্ষাবিদগণ শিশুশিক্ষায়তনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, কেননা এখানেই প্রত্যেক শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ লক্ষ্য করে তাকে মানুষ করে তোলা সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীতে শিশুশিক্ষার আর একটি নূতন দিক দেখা দিয়েছে। পূর্ব্বে "অপরাধ-প্রবণ" (delinquent) শিশুদের সমাজের বিস্ফোটকরূপে গণ্য করা হতো। আজ অপরাধপ্রবণতাকে শিশুর ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটি

(১) "The little human being is frequently a finished product in his fourth or fifth year". Introductory Lectures on Psycho-analysis P 298; 1922 Freud.

(২) "One can determine how a child stands in relation to life a few months after its birth". Understanding Human Nature. P42. Adler. Translated by W. B. Wolfe.

শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা

বলে আর বিচার করা হয় না, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় দোষ-গুণ বিচার করে শিশুকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা এখন সব দেশেই সুরু হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, শিশুদের অপরাধপ্রবণতার মূলে বিশেষ কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, যে-সব শিশু সুন্দর ও স্বাভাবিক গৃহপরিবেশে বৃদ্ধিলাভ করে না, তাদের মধ্যে রুক্ষতা, নিষ্ঠুরতা ও চৌর্য্যপ্রবণতা দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, পিতামাতা ও অভিভাবকের অজ্ঞতাহেতু ছেলেমেয়েরা তাদের প্রত্যেক কাজেই বাধা পায়; প্রকৃত নিয়মশৃঙ্খলা ও সহানুভূতিপূর্ণ শাসনের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য হয়ে পড়ে। ডাঃ সিরিল বার্ট ২০০ জন অপরাধপ্রবণ বালক-বালিকাকে বিশেষভাবে পরীক্ষাধীন রেখে লক্ষ্য করেন যে, বিশৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচার গৃহ-পরিবেশে এই সকল সুকুমারমতি শিশুরা নিতান্তই স্নেহহীন, ছন্নছাড়া জীবনযাপনের ফলে ক্রমে ক্রমে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়েছে। (৩)

ইংলণ্ডের বাথ সহরের শিশুশিক্ষা নির্দ্দেশ কেন্দ্রের (Bath Child Guidance Clinic) অধ্যক্ষ বলেছেন যে কেবলমাত্র অপ্রিয় গৃহপরিবেশের জন্যই যে শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপরাধী শিশুর ঊর্দ্ধতন তিন চার পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই নানা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাবাস করেছে। এই ক্ষেত্রে, অপরাধ-প্রবণতা কতদূর অপ্রিয় গৃহপরিবেশের উপর নির্ভর করে এবং কতদূর সেটি জন্মগত, তাও বিশেষভাবে বিবেচনা-সাপেক্ষ এবং এই সম্পর্কে যে সকল গবেষণার কাজ চলেছে তার ফলে, বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে অপরাধপ্রবণ পিতামাতার শিশুগুলিকে জন্মাবধি রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ না করলে এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

শিশুজীবনের প্রথম দুই বৎসর কাল, সাধারণতঃ আমরা শিক্ষাক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচনা করি না। শিশু যতদিন পর্য্যন্ত না পরিষ্কার কথা বলতে শেখে ততদিন পর্য্যন্ত তাকে কিছুই শেখাবার নাই, এমনতর বিধানই আমরা একরকম মেনে নিয়েছি। কিন্তু বর্ত্তমানকালের খ্যাতনামা মনস্তাত্ত্বিকগণ নিঃসংশয়েই বলেন যে, মানুষের সমগ্র জীবনের মধ্যে তার প্রথম পাঁচ বৎসর কালই তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নিরূপণ করে দেয়। এই ৬০ মাস কালের শিক্ষার উপরেই গড়ে ওঠে তার অনাগত ৬০ বৎসরের

(৩) The Young Delinquent. Cyril Burt. P. 65

জীবন ব্যাপৃতি। তাঁরা আরও বলেন যে, জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের পর শিশুর শিক্ষা কেবল শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলির সম্প্রসারণ মাত্র। অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলির পূর্ণ পরিণতি ঘটে। এই সব নানা কারণে জীবনের প্রথম দুই বৎসর কাল শিশুর ব্যবহার বৈচিত্র্য, দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

১ হতে ৩ মাস—প্রাণিজগতে মানবশিশুর ন্যায় আর কোন জীব এত অসহায় নয়। বলতে গেলে, একটি মাস পূর্ণ না হলে তার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা তাও বলা যায় না। নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজের জীবনধারাকে মানিয়ে নিতে তার প্রায় মাসখানেক সময় লাগে। এক মাস পূর্ণ হওয়ার পরেও দেখা যায় যে সে সামান্যতম কারণেই প্রতিক্রিয়া দেখায়। দেহে ও মনে যতদিন না পর্য্যন্ত নবজাত শিশু বেশ নিরাপদবোধ করে, ততদিন পর্য্যন্ত তার মধ্যে একটা সদা-চকিতভাব বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখা যায়। এই এক মাস কাল তার অধিকাংশ সময় ঘুমিয়েই কাটে, কাজেই তার নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থার সীমা খুঁজে নিতে হয় প্রত্যেক জননীকে। কেননা, প্রত্যেক শিশুর ঘুমের পরিমাণ বা সময় এক নয়। কোন্ সময়ে শিশু ঘুমায় এবং কখনই বা জেগে থাকে তা জানা থাকলে শিশুকে পরিচর্য্যা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তবে একথাও জেনে রাখা ভাল যে সুবিধার জন্য একটা নিয়ম বেঁধে নিতে হয় বটে, কিন্তু কোন শিশুই নিয়মশৃঙ্খলার বাধ্যবাধকতা মেনে জীবনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে ভালবাসে না। প্রত্যেকদিনই তার নূতন একটি শক্তির উন্মেষ ঘটে, এবং সেই নবশক্তির সাহায্যে শিশু জগতের আর একটি অজানা রাজ্য জয় করতে চেষ্টা করে। শিশুর এই নবজাত শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করে উত্তরোত্তর সেটিকে সক্রিয় ও বলবতী করে তোলা প্রত্যেক পূর্ণবয়স্কের দায়িত্ব।

প্রথম তিন মাস শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা লক্ষ্য করলে বেশ একটা সুস্পষ্ট সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। শিশু বেশীর ভাগ সময় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে বটে, কিন্তু, মাথাটি একদিকে হেলিয়ে শোয়। যেদিকে মাথাটি হেলায় সেইদিকে হাত দুটিও ঘুরিয়ে রাখে। প্রায় এইভাবেই মাতৃজঠরে শুয়ে থেকে তার শোওয়ার অভ্যাসটি এই ধরনেই গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ঘুমাতে ঘুমাতে শিশু চমকে উঠে এবং তার মাথা সোজা হয়ে যায়। এই সময়ে শিশু হাত পা ঘোরায় এবং চার মাসের পর একেবারে চিৎ হয়ে শুতে পারে। নূতন পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় সাধনের জন্য সুস্থ শিশুর ইন্দ্রিয়গ্রাম জন্ম হতেই সতেজ থাকে কিন্তু তার মুখের ও চোখের ক্ষমতাই সর্ব্বাপেক্ষা সবল হয়। ঠোঁটের চারিপাশে অতি মৃদু স্পর্শের আঘাত সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে

পারে, এবং খাওয়ার জন্য সে হাঁ করে জিভ দিয়ে চাটবার চেষ্টা করে। ক্ষুধা বোধ করলে সে মাথাটি ঘোরায়—মনে হয় যেন সে খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত। শিশুর এই ক্ষমতাটি প্রত্যাবর্ত্তক কি স্বেচ্ছাকৃত—এ সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে বটে কিন্তু ক্ষমতাটি যে সুস্পষ্ট সে সম্বন্ধে কোন মনস্তাত্ত্বিকই দ্বিমত প্রকাশ করেন না। শিশু যখন ঘাড় ফিরিয়ে শুয়ে থাকে, তখন সে মাথা ঘুরিয়ে কোন জিনিস দেখে না, কিন্তু চোখের সামনে কোন জিনিস তুলে ধরলে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে। তিন মাসের পর হতে, মাথা ঘুরিয়েও সে দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করে।

এক মাসের শিশুর কাছে কোন শব্দ করলে, সে যে মন দিয়ে শব্দ শোনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেখা গেছে যে শিশু হাত পা নেড়ে খেলা করছে, এমন সময়ে ঘণ্টা বাজানো হলে সে তৎক্ষণাৎ অঙ্গ সঞ্চালন থামিয়ে মনোযোগ দিয়ে ঘণ্টা-ধ্বনি শোনবার চেষ্টা করছে। ক্রমে দেখা যায় যে বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও সে দেখাচ্ছে। জননীর পদধ্বনিতে সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং তাঁর সান্নিধ্যের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। শব্দের সঙ্গে শিশুর ধ্বনিজ্ঞানও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই প্রথম তিন মাস শিশু যে সকল ধ্বনির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে থাকে, সেই সকল ধ্বনিছন্দ তিন প্রকার ঃ—

(১) ক্ষুধাজনিত ক্রন্দন,
(২) বেদনাজনিত ক্রন্দন এবং
(৩) তৃপ্তি ও আরামসূচক আনন্দধ্বনি।

নবজাত শিশুর কোনই সামাজিক বোধ থাকে না। ক্রমে সে নিজের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে অন্যের উপরে নির্ভর করতে শেখে। এই নির্ভরশীলতা হতেই ক্রমে সমাজচেতনা জাগ্রত হয়। প্রথম তিন মাসে শিশু তার পিতা ও মাতার হাসি মুখটি চেনে, তাঁদের সান্নিধ্যে খুশি হয় এবং কোলের উত্তাপে বেশ আরাম বোধ করে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। এই স্পর্শবোধ ও নিরাপত্তাবোধ শিশুর পক্ষে প্রথম **সমাজ সচেতনার লক্ষণ**।

প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ (১) শিশুর নাম—বাবুয়া (অমিতানন্দ দাস)

জন্ম—২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৭

এক মাস—পাশ ফিরতে পারে ; উপুড় করে দিলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে।
সাড়ে তিন মাস—একটু একটু মাথা খাড়া করতে পারে।
চার মাস—মাথা ও ঘাড় সোজা রাখে।

জন্ম থেকেই বাবুয়ার স্বভাবটি বেশ হাসি খুশি। সে বেশী কাঁদে না। যখন জেগে থাকে, বেশ হাত পা নেড়ে খেলে, হাসে, আর বড় বড় চোখে তাকায়। দুই মাস বয়সে সে মানুষের সঙ্গ বেশ বুঝতে শিখেছে। বাবার কোল ভারি

পছন্দ। মন দিয়ে ছড়া শোনে। মা ও দিদিমার সঙ্গেও বেশ "আই উই" বলে গল্প করতে সুরু করেছে। রঙ্গীন কাপড় বা পশমের গোলা টাঙ্গিয়ে দিলে খুশি হয়ে খেলা করতে থাকে।

তিন মাস বয়সে তার দৃষ্টি গেল চারিদিকে—ছবি, পর্দ্দা, মশারী ছোট-খাট জিনিস, গাছপালা, ফুল, কাক—সকলের সঙ্গে কথা বলতে চায়। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার স্বরে শব্দ করে। ঘাড় উঁচু করে কোলে চড়তে চায়। শুইয়ে দিলে রাগ হয়ে যায়। দিদি, পিসি, এদের সঙ্গে ভাব।

চার মাস বয়সে সে ছোটদের ভারি পছন্দ করে বিশেষতঃ রণু, তোতো ও জোজোদের (মাসতুতো দাদারা, একই বাড়ীতে থাকে)। চেনা, অচেনা বোধ হয়েছে, কিন্তু নেহাৎ অপছন্দ না হলে অচেনা লোকের কাছেও যায়।

বাবুয়া এক মাস আগে জন্মেছিল বলে সে অত্যন্ত রোগা এবং ছোট ছিল। তখন তার ওজন ছিল মাত্র ৪½ পাউণ্ড, কিন্তু তার স্বাস্থ্য কোনও দিনই খারাপ ছিল না। প্রথম প্রথম তার একমাত্র রোগ ছিল মায়ের দুধ অতিরিক্ত খেয়ে ফেলা এবং তার দরুণ বায়ু ও পেটব্যথা কিম্বা ঘুমের ব্যাঘাত হতো। কিন্তু তার স্ফূর্ত্তি দেখে ও নিয়মিত ওজন বাড়া দেখে মনে হতো যে সে ভালই আছে। জন্মের সময় ওজন ছিল ৪½ পাঃ, দুই সপ্তাহে হয় ৫ পাঃ ১০ আউন্স—ছয় সপ্তাহে হয় ৭ পাঃ ১০ আউন্স। লম্বা জন্মের সময় ছিল ১৮ ইঞ্চি।

প্রথম দুই মাস বাবুয়া আই, উই, আউ, ওই শব্দ করতো। তিন মাসে আগ্‌ল্, আইয়া, আইবা, আদ্দা শব্দ করে কথা বলতো।

প্রথম তিন মাস বাবুয়া ৬।৭ বার মায়ের দুধ খেতো। ৩ মাস হতে ৫।৬ বার মায়ের দুধ, ১ বার ৩ আউন্স কমলার রস, ৩ আউন্স জল ও মধু মিশিয়ে খেতে দেওয়া হতো।

পর্য্যবেক্ষণ (২) শিশুর নাম—টুকু (কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

জন্ম ২০শে এপ্রিল ১৯৫১

দৃষ্টিশক্তি—চতুর্থ দিন থেকেই টুকু রঙ্গীন বলের দিকে দেখেছে। পঞ্চম দিনে দিদিমা রাতে জানালার কাছে ছোট বাতিটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। লক্ষ্য করে দেখা গেল যে টুকু বাতির দিকে বেশ একদৃষ্টে দেখছে। নবম দিনেও ঠিক এই একই ঘটনা ঘটে। বাইশ দিনের দিন লক্ষ্য করা হয় যে মা ঘুরে ঘুরে কাপড় জামা গুছাচ্ছেন—টুকু চোখ ঘুরিয়ে মাকে দেখছে। দুই মাস বয়সে একদিন দেখলাম যে টুকুর বাবা বাঁ পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছেন—টুকু মাথা ঘুরিয়ে দেখলো—টুকুর বাবা টুকুর মাথার দিক দিয়ে

ডান দিকে গেলেন—টুকু আবার ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে বাবাকে দেখলো। আড়াই মাস বয়সে খাওয়ার সময় হওয়াতে মা ঘরে ঢুকলেন—টুকু মাকে দেখে বেশ একটা খুশির শব্দ করলো অর্থাৎ টুকু এবার লোক চিনতে সুরু করেছে।

স্পর্শশক্তি—নবম দিনে স্নানের সময়ে পেটের কাছে হালকা করে সুড়্সুড়ি দিতে মুখে বেশ হাসির ভাব ফুটে ওঠে। দশম দিন ক্লাউট পরাবার সময় 'সেফটিপিন' পেটের চামড়ায় লাগে, টুকু একটু কেঁদে ওঠে। পনেরো দিনের দিন দুধ খাওয়াবার জন্য মা কোলে নিলে বেশ একটা আরাম-সূচক শব্দ করে। তেইশ দিনের দিন মা কোলে নিলে গ্ গ্ শব্দ করে। দেড় মাস বয়সে টুকুকে তেল মাখাবার সময়ে লক্ষ্য করা হয় যে সে মালিশ করা বেশ পছন্দ করছে। তিন মাস বয়সে ফলের রস খাওয়াবার আগে চামচ মুখে ঠেকাতেই আগ্রহভরে হাঁ করে।

শ্রবণশক্তি—অষ্টম দিনে টুকুকে বারান্দায় শোওয়ানো হয়। একটা কাক খুব জোরে বিশ্রী শব্দ করে 'কা' 'কা' করে ডেকে ওঠে। টুকু খুব জোরে কেঁদে ওঠে। একমাস এক সপ্তাহ যখন টুকুর বয়স তখন দেখা গেল যে মা ও ঠাকুরমা কথা বলছেন টুকু বেশ নিবিষ্ট চিত্তে তাঁদের কথা শুনছে। টুকুর সঙ্গে এই সময়ে কথা বললে "উই", "আই" শব্দ করে। দুই মাস বয়সে বাবার পায়ের শব্দ শুনেই মাথা ঘুরিয়ে তাঁকে দেখতে চেষ্টা করে; একদিন টুকুর বাবা, "কে রে, কে রে" বলে দু তিন বার আদর করেন—টুকু মাথা ঘুরিয়ে বাবার দিকে দেখে হাসে।

স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গ সঞ্চালন—জন্মের প্রথম সপ্তাহেই টুকু হাত পা নাড়তে সুরু করে। ষষ্ঠ দিনে হাতের মুঠি খুলে যায়। দুই মাস বয়সে টুকু বিছানার চাদর টেনে গুটিয়ে ফেলে। হাত দুটি প্রায়ই মুখের কাছে নেয়। আঙ্গুলের গাঁঠগুলি চোষে। এইরূপ অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তা মনে হয় না। তবে এই নড়াচড়ার মধ্যে শিশুর শরীরের ব্যায়াম হয় বলেই মনে হয়। দুই মাস দশ দিন যখন টুকুর বয়স, একদিন সে হাত পা নেড়ে খেলছিল, হঠাৎ একটা গেলাস সজোরে মাটিতে পড়ে যায়, টুকু চমকে খেলা বন্ধ করে যে দিক দিয়ে শব্দ এসেছে সেদিকে দেখে। ক্রমে দেখা যায় যে টুকুর নানা অনুভূতির সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়—যথা স্নানের আগে তেল মালিশ করবার সময়ে টুকু খুব বেশী হাত পা নাড়ে।

এ ছাড়া আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল—যতই টুকুর বয়স বাড়ছে ততই তার অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে একটা জীবন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া

যাচ্ছে। তীব্র আলোতে টুকু মাথা ঘুরিয়ে নেয়। সন্ধ্যাবেলায় বাতি জ্বালতেই প্রথমে চোখটা বন্ধ করে নেয়। এটা লক্ষ্য করে টুকুর মাথার পিছন দিকে বাতিটা সরিয়ে নেওয়া হলো। দুধ খাওয়া হয়ে গেলে মাথা সরিয়ে নিতেও দেখা গেল দিন পনেরোর মধ্যেই। স্নানের সময়ে উপুড় করে দিলে হাত পা ছুড়ে যেন কিছু ধরতে চেষ্টা করে।

ক্রমে দেখা গেল যে অঙ্গ সঞ্চালন এখন আর উদ্দেশ্যবিহীন নয়। ক্ষিধের আগে হাতের মুঠি মুখে দিয়ে চুষতে সুরু করেছে টুকু—বয়স তার দুই মাস বারোদিন। মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিতে আবার হাতটা মুখে তুলে চুষতে লাগলো। খাওয়ার পরে তৃপ্ত হলে আর হাত চুষতে দেখি নি। সাড়ে তিন মাস বয়সে টুকুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত অঙ্গ সঞ্চালন, দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি ও প্রত্যাবর্ত্তক (reflex) ক্ষমতার মধ্যে বেশ একটি সংহতি লক্ষ্য করা গেল। টুকুর সামনে একটা ঝুমঝুমি বাজানো হলো। টুকু হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। ঝুমঝুমিটা সরিয়ে নিতে টুকু এদিকে ওদিকে সেটা খুঁজতে লাগল। দেখতে না পেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কান্নার ভাব দেখালো। আবার ঝুমঝুমিটা বাজাতে এদিক ওদিকে দেখতে লাগল পরে সেটি পেয়ে খুশি হলো। তবে এখনও ঝুমঝুমি ধরবার জন্য হাতটা এগিয়ে দিলেও ঠিক জায়গায় হাত পৌঁছায় না।

আনুভূতিক বিকাশ—প্রথম কয়েক সপ্তাহ শিশুর সর্ব্বাঙ্গেই তার অনুভূতি-জনিত প্রক্রিয়াগুলি প্রকাশ পায়। তার অনুভূতির প্রাথমিক লক্ষণগুলি হলো—বিরক্তি ও খুশির ভাব। এই বিরক্তির ভাব থেকেই আসে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা, রাগ, কান্না, চমকে ওঠা ইত্যাদি; খুশির ভাব থেকে আসে তৃপ্তি, খেলা ইত্যাদি। তৃতীয় দিনে টুকু খাওয়ার আগে কেঁদেছিল। পঞ্চম দিনেও সজোরে কেঁদে ওঠে, পরে খাওয়া পেলে শান্ত হয়। অষ্টম দিনে খাওয়ার পরে তৃপ্তিসূচক শব্দ করে। নবম দিনে পেটের কাছে হালকা সুড়্সুড়ি দিতে বেশ শব্দ করে। টুকু একা থাকতে পছন্দ করে না—একমাস বয়সে ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁদতে সুরু করে, মা ঘরে এলেই চুপ করে। এ অভ্যাসটা এখন থেকে লক্ষ্য করা গেল। স্নানের সময় হঠাৎ উপুড় করলে কেমন যেন অসহায় বোধ করে, কিছু একটা ধরতে চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম কাঁদলে চোখের জল পড়তো না—আঠারো দিনের দিন প্রথম চোখে জল দেখা গেল। বিছানা ভিজে থাকলে টুকু বিরক্তি প্রকাশ করে কাঁদে, দশ দিনের দিন।

চতুর্থ দিনেই মনে হয় টুকু খুশির ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু অষ্টম দিনে খাওয়ার পর বেশ স্পষ্টই মনে হয় টুকু গলা দিয়ে তৃপ্তিসূচক শব্দ করেছে। ষোলো দিনের পর হতে খাওয়ার পরে বেশ স্পষ্টই খুশির ভাব দেখায়।

এক মাস পূর্ণ হতে লক্ষ্য করা গেল যে খাওয়ার জন্য মা কোলে নিতেই টুকু গলা দিয়ে আগ্রহপূর্ণ একটি মজার শব্দ করে। এই সময়ে মুখটি বেশ প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

এক মাসের পর থেকে টুকু লোকজনের যাওয়া আসা লক্ষ্য করতে থাকে ঘরে একলা থাকতে পছন্দ করে না। খাটের কাছে রঙ্গীন পশমের বল টাঙ্গিয়ে দেওয়াতে টুকু খুশি হয়ে বলটা দেখে এবং যতক্ষণ জেগে থাকে টুকু কতরকম যে খুশির শব্দ করে তার ইয়ত্তা নাই। বিকেলবেলা বাবা বাড়ী ফিরে টুকুর কাছে গেলে ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এও লক্ষ্য করা গেল।

প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতা—প্রথম দিনেই টুকু ওর বাবার আঙ্গুল আঁকড়ে ধরে। বাবা অবশ্য নিজের আঙ্গুল টুকুর হাতের মধ্যে রেখেছিলেন। স্নানের সময়েও কিছু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। জন্মের আধ ঘণ্টার মধ্যে টুকু হাঁচে। এর পরে অনেক বারই টুকুকে হাঁচতে দেখি। জন্মের দ্বিতীয় দিন টুকু পায়ের পাতা নাড়ায়। তিন মাস হতে সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই টুকু বেশ ঘাড় ঘোরাতে পারে, মাথাও খাড়া রাখতে পারে। প্রথম দিনেই চোখে আলো লাগায় চোখ মিট্ মিট্ করে। পরে পঞ্চম দিনের মধ্যেই দেখা যায় যে সে বাতির আলো লক্ষ্য করছে। ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা প্রায় প্রথম দিনেই দেখি ; তার পরে সজোরে গেলাস পড়ে যাওয়ায় টুকু যখন চমকে ওঠে তখন দুই মাস দশ দিন তার বয়স। স্তন্যপান করবার ক্ষমতা প্রথম দিন হতে লক্ষ্য করা হয়। তবে চুষে খাওয়ার ক্ষমতাটি প্রত্যাবর্ত্তক কি সহজাত সংস্কার এ সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিকগণের মতভেদ আছে। মল-মূত্র ত্যাগের ক্ষমতা তো প্রথম হইতেই লক্ষ্য করা হয়।

খেলা—টুকু কবে থেকে খেলতে সুরু করে তা বেশ ভাল করে লক্ষ্য করা হয়। প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়াগুলি বাদ দিলে দেখা যায় যে জাগ্রত অবস্থায় শিশু অবিরতভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করে। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অঙ্গ চালনাই শিশুর প্রাথমিক ক্রীড়া বলে মনে হয়। দুই মাস যখন টুকুর বয়স একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোনা গেল ঘর থেকে বেশ নানারকম শব্দ আসছে। লক্ষ্য করে দেখি টুকু হাত পা নেড়ে সজোরে "আই" "উই" করে নিজে নিজেই খেলছে। টুকুর ঘুমের পর খাওয়া হয়েছে, কাজেই বেশ পরিতৃপ্তির খেলা বলেই মনে হলো। তিন মাস বয়সে টুকু বিছানার চাদর টেনে মুখের ওপর এনে ফেলে। মা চাদর সরিয়ে দেন, আবার মুখের ওপরে ঢেকে দেন—এইভাবে খেলা চললো কিছুক্ষণ। টুকু খুব খুশি হলো।

অনুকরণ—তিন মাস বয়সে মার মুখে মাম্‌মা, বাব্‌বা শুনে টুকু কখন কখনও "মা" "বা" শব্দটি উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে।

ভয় ও রাগ—অষ্টম দিনে কাকের শব্দ শুনে টুকু কেঁদে ওঠে এবং একবার গেলাস পড়ে যাওয়ায় চমকে ওঠে, এগুলি ভয়ের লক্ষণ হতে পারে। খাওয়ার দেরী হলে বা বিছানা ভিজে থাকলে টুকুকে কেঁদে লাল হয়ে যেতে দেখেছি।

হাসি—পরিতৃপ্ত হলে টুকুর মুখে যে প্রসন্নতা ফুটে ওঠে সেটি প্রায় হাসিরই সামিল। দুই মাস বয়স হতে মায়ের হাসি মুখটি দেখলে টুকুর মুখে বেশ পরিষ্কার হাসি দেখা যায়। আত্মীয় স্বজনের আদরে তার মাড়ি পর্য্যন্ত দেখা যায়। তিন মাস বয়সে একবার সামনে আয়না ধরা হয়—অবাক হয়ে দেখে, তার পরে প্রসন্ন হাসিতে মুখটি ভরে যায়।

৪ হতে ৬ মাস—চার মাস পূর্ণ হলে শিশুকে আর সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় অপরিণত বলে মনে করা হয় না। দেখা যায় যে, গৃহের পরিবেশের সঙ্গে সে ক্রমেই পরিচিত হচ্ছে এবং গৃহের নিয়ম শৃঙ্খলার সূত্রে তার জীবনও যেন গাঁথা হয়ে গেছে। এতদিনে, তার নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায় এবং পূর্ণবয়স্কদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিশুর সুসঙ্গত প্রচেষ্টাগুলি সহজেই বুঝতে পারা যায়। তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই সংহত হয়ে আসে এবং ক্রমে বুদ্ধিপূর্ণ ব্যবহারেরও পরিচয় পাওয়া যায়। চার মাস বয়স হতে শিশু বেশ হাত পা মেলে দিয়ে সোজা ও চিৎ হয়ে শুতে পারে। স্নায়ুমণ্ডলীর সংহতি সাধনের ফলে শিশু মাথা ঘুরিয়ে তার পরিবেশটিকে লক্ষ্য করতে সুরু করে। হাত ও পায়ের শক্তি সামর্থ্য বেশ সুস্পষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়, এবং হাত দুটি ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে এক এক পা করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। বালিশের সাহায্যে বসিয়ে দিলে বেশ খুশি হয়ে বসে এবং মাথা তুলে রাখবার জন্য আর সাহায্য করতে হয় না কেননা এতদিনে শিশুর মেরুদণ্ড বেশ সবল হয়ে উঠেছে। শিশুর সামনে কোন জিনিস ধরলে সে ব্যগ্র হস্তে সেটা ধরবার চেষ্টা করে, যদিও প্রথমে দূরত্ব নির্দ্ধারণ করতে না পেরে ব্যর্থমনোরথ হয়ে কাঁদে। জিনিসটি একটু সামনে এগিয়ে দিলে খুশি হয়ে ধরে।

চার মাস হতে ছয় মাসের শিশু নানারূপ শব্দের দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করে। কখনও "কু", "কু" কখনও বা "মাম্ মা" ; "বাব্বা" শব্দ করে থাকে। এ ছাড়া হাসির শব্দ বা গলা দিয়ে গ্‌ গ্‌ গ্‌ শব্দ করে মনের খুশির পরিচয় দিয়ে থাকে। এই বয়সে সে পিতা, মাতা ও আত্মীয়স্বজনের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য বেশ বুঝতে পারে, এমনও মনে করার কারণ আছে।

নিজের পরিবেশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়াতে সে বেশ বুঝতে পারে যে পরিবারের মধ্যে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে সকলেই ব্যগ্র, এ তত্ত্বেরও সন্ধান সে পেয়েছে এতদিনে। জননীর স্পর্শ, গন্ধ ও কণ্ঠস্বরে সে খুশি হয়, পদশব্দে প্রতীক্ষমান হয়ে ওঠে এবং নিত্য পরিচর্য্যার ফলে তাঁর সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জননী বা পরিচিত ব্যক্তির আগমনে তার মুখটি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে সে ধ্যান গম্ভীর হয়ে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে। সোজা করে বসিয়ে দিলে তার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়, চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং উপবেশন কালে পরিবেশটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ হতে দেখা যায় বলে শিশু একটি নূতনত্বের স্বাদ পায়। শিশুর ব্যবহারের এই ক্রমবিকাশগুলি পাশ্চাত্যদেশে প্রমাণসিদ্ধ যন্ত্রসাহায্যে লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন বলে আজ আমরা শৈশবের বিশেষত্বগুলি জানতে পেরেছি।

পর্য্যবেক্ষণ (১) বাবুয়া—

চার মাস—মাথা ও ঘাড় সোজা রাখতে পারে।

বাবুয়া ছোটদের সঙ্গ ভারি পছন্দ করে, বিশেষতঃ রণু, তোতো ও জোজোদের (মাসতুতো দাদারা)।

চেনা অচেনা বোধ হয়েছে, কিন্তু নেহাৎ অপছন্দ না হলে অচেনা লোকের কোলেও যায়।

ছয় মাস—প্রথম প্রথম সে রাত্রেও মায়ের দুধ খেতো। পাঁচ ছয় মাসে সেই অভ্যাস ছাড়ানো হয়। এখন সে বেশ বড় সড় দেখতে হয়েছে। মাঝে মাঝে বেশী খাওয়ার দরুণ পেট-ব্যথায় কাঁদে, এ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তার স্বাস্থ্য এবং স্ফূর্ত্তি দেখবার মত।

একটু সাহায্য পেলে উঠে বসতে পারে।

—পাঁচ মাসে বাবুয়া "দে-দে, বে-বে, পে-পে, যা-যা, বা-বা" বলে। ঠিক মনে হয় যেন লোকের কথা বুঝে তার উত্তর দিচ্ছে। পাঁচ মাসে সে কতকগুলি কথা বেশ বুঝতে পারে। "খাবি ?", "উঠে আয়", "বাবুন বাবুন টাকডা টাডুন" বললে সে কোলে লাফাতে সুরু করে।

ছয় মাসে বাবুয়া রীতিমত সামাজিক জীব হয়েছে। মধু, মদন, ননী, সুধীর—সকলের সঙ্গেই ভারি ভাব। সকলের কোলে চড়তে আর লাফাতে ভালবাসে। দুলী কাকীর পাঁচ মাসের খোকাকে থাবড়া মেরে আদর করে কাঁদিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে এখন ঝাঁপিয়ে

কোলে যায়, না নিলে "এঁ-হে-হে" বলে কাঁদে। "অতা, তাতা, তাই তা, ত্যা ত্যা ত্যা" বলে। আয়, চল্, ফুল, টিকটিকি বোঝে।

পর্য্যবেক্ষণ— (২) টুকু—

খেলা—চার মাস বয়সে টুকু রঙ্গীন খেলনাগুলি বেশ লক্ষ্য করতে সুরু করেছে। একটা লাল রং-এর গেলাস তার খুব পচ্ছন্দ। লাল আর হলুদ ঝুমঝুমিটা খুব টানাটানি করে আর মুখে পোরে। একদিন খুব কাঁদছে, হাতের কাছে ঝুমঝুমিটা ধরতেই কান্না থেমে গেল এবং বেশ আগ্রহের সঙ্গে খেলনাটি ধরতে চেষ্টা করলো।

সাড়ে চার মাস—নীচের ঠোঁটটা, ওপরের ঠোঁটে দিয়ে চেপে ধরে এক রকম শব্দ করে টুকু বেশ মজা পেল। দেখলাম বার বার ওই রকম ঠোঁট চেটে শব্দ করছে।

মাটিতে শুইয়ে দিলে উপুড় হয়ে পেছনে হামা দেওয়ার চেষ্টা করে। গোটা সতরঞ্জিতে ঘুরে বেড়ায় আর খুশি হয়ে নানারকম শব্দ করে। চামচ, চিরুনী, খেলনা ইত্যাদি বাজালে খুশি হয়। নিজেও গেলাসে চামচে শব্দ করে—বয়স এখন পাঁচ মাস।

সাড়ে পাঁচ মাস—টুকুকে কাপড় পরানো দায় হয়েছে। সব কিছু মুঠিতে ধরে। মায়ের কাপড় মুঠিতে ধরে চোষে। বাবার খবরের কাগজে থাবা দেয় বার বার।

ছয় মাস – টুকু আজকাল "টুকি" খেলা বেশ বুঝতে পারে। মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ছোটপিসি "টুকি" দিলে টুকু মাথা ঘুরিয়ে পিসিকে খোঁজে। কোলের মধ্যে নাচে।

অনুকরণ—ছয় মাস "হাত ঘোরালে নাড়ু দেবো" বললে টুকু দেখাদেখি হাত ঘোরাতে চেষ্টা করে।

"বাব্বা, মাম্ মা, দাদ্ দা" বললে অনুকরণ করে। কাগজ উড়ে গেলে হাত নাড়িয়ে "যা যা" বললে টুকুও "যা যা" বলে।

ভয়—টুকুর মধ্যে ভয়ের লক্ষণ এখনও সুস্পষ্ট নয়। মেঘ গর্জ্জনে চমকে উঠতে দেখেছি, কিন্তু কাঁদেনি। অন্ধকারের ভয় একেবারেই নাই। একদিন ছোটকাকা উঁচুতে তুলে টুকুকে লুফে নেন হাতের মধ্যে—প্রথমে টুকু চমকে যায়, পরে বেশ খুশিই হয়। এই চমকে যাওয়া ভয়ের লক্ষণ হতে পারে।

রাগ—সচরাচর টুকুর খাওয়ার দাওয়ার দেরী হয় না—হলে, টুকু রাগ করে কাঁদে

হাসি—টুকু এখন সর্ব্বদাই হাসি খুশি। তার সঙ্গে খেলা করলে বেশ জোরে হাসে।

৭ মাস হতে ৯ মাস—এই বয়সে অতি সামান্য সাহায্য পেলেই শিশু অনায়াসে সোজা হয়ে বসতে পারে, এবং নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। এতদিন সে প্রায় শুয়েই কাটিয়েছে, এবারে বেশ স্বাধীনভাবে বসতে পেরে সে একটু স্বাবলম্বী হতে চায়। জাগ্রত অবস্থায় কিছুক্ষণ বসে এবং কিছুক্ষণ শুয়ে শিশুর দিনগুলি বেশ সহজেই কেটে যায়। ১৪ মাস বয়সে শিশু সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াতে পারে, এবং দেখা গেছে যে শিশু ১৪ মাসে যা করে ৭ মাসে প্রায় তার অর্দ্ধেক কাজগুলি করতে পারে। বেশ সহজে উপবেশন ভঙ্গীটি আয়ত্ত করায় সে এখন দুই হাতে খেলনা বা অন্য কোন বস্তু ধরতে পারে এবং এক হাত হতে অন্য হাতে জিনিস নিতে পারে। সরু সূতো বা ফিতেয় বাঁধা খেলনা দেখলে সে পূর্ণবয়স্কের মত ফিতেটা ধরতে চায়, তবে বেশ হাত ঘুরিয়ে ফিতেটা ধরতে পারে না। ৪ মাসের শিশু তার পরিবেশটিকে বেশ মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে, ৭ মাসের শিশু পরিবেশের মধ্যে যে জিনিসগুলি তার ব্যবহারে লাগে সেগুলিকে লক্ষ্য করে দেখে এবং কোন বস্তু হাতের নাগালের মধ্যে পেলে তৎক্ষণাৎ সেটিকে মুখে দিতে চায় এবং ঘুরিয়ে, ঠুকে, বেশ নেড়ে চেড়ে দেখে। এই বয়সে শিশু তার পরিবেশ সম্বন্ধে আর নির্লিপ্ত নয়; সে এখন সদাজাগ্রত ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সঙ্গে জগতকে চিনতে ও বুঝতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

এখন শিশু কেবলমাত্র "উ-উ, বাব্‌বা, বুল্‌না" বলে আর সন্তুষ্ট হয় না। বেশ জোরে "মাম্‌মা, উম্‌মু, দাদ্‌দা, বাব্বা" বলে ব্যক্তিবিশেষের আগমনে আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করে। অন্যের স্বরভঙ্গীর রূপ-পরিবর্ত্তনে তার মুখের পরিবর্ত্তনও বদলে যায়। যথা:—শিশুর কাছে সজোরে "ও!" বললে, তার কেমন ঠোঁট দুটি ক্রন্দনের ভঙ্গীতে কেঁপে ওঠে। এই সকল লক্ষণ ভাষাবোধের উপক্রমণিকা। ৭ মাস হতে ৯ মাসের মধ্যে শিশুর সামাজিকবোধ বেশ জেগে ওঠে, এবং কয়েকটি শারীরিক ক্ষমতালাভ করে সে আর পিতা মাতার অপেক্ষায় বসে থাকে না। বুকে হেঁটে, হামা দিয়ে, পেটে ঘসে কখনও সামনে, কখনও বা পিছনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। নবলব্ধ প্রত্যেক ক্ষমতাটিকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সে

বেশ অনেকক্ষণ একাকী খেলনা নিয়ে মেতে থাকে, চিৎ করে শুইয়ে দিলে নিজেই বার বার উপুড় হয়ে ঘাড় উঁচু করে নিজের পরিবেশটিকে বিজ্ঞের মত যাচাই করে দেখে।

পর্য্যবেক্ষণ— (১) বাবুয়া—

সাত মাস—নিজেই উঠে সোজা হয়ে বসতে পারে। বুকে ভর দিয়ে অনেক দূরে চলে যায়।

সাত মাসে বাবুয়া বেশ নিজের মনে খেলতে শিখেছে। বম্বে থেকে আনা পাখী ও ঝুমঝুমি, পাখা, খরগোশ এবং কাঠের খেলনা নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ মেতে থাকে। দুটো জিনিস ঠুকে শব্দ করে, কোলে উঠে গহনা চশমা ধরে টানাটানি করে।

বাবুয়া নতুন শব্দ যত না শিখেছে, শব্দের মধ্যে নানা রকম মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখেছে। রাগ, দুঃখ, আনন্দ—নানা স্বরে বুঝিয়ে দেয়। "এই" বলে সবাইকে ডাকে। "পাঁপ", "গাড়ি," "বেড্ডু", "এইটা", "এই যে", "এই তো" বুঝতে পারে।

আট মাসে বাবুয়া ভারি সেয়ানা হলো। কার কাছে কি চায় বেশ হাত পা নেড়ে বুঝিয়ে দেয়। কথা না শুনলে "এই" বলে ডাকে। ছোট ছোট দাদাদের সঙ্গে খেলা করে। ট্রামে চড়ে তার ভারি স্ফূর্ত্তি হয়েছে। সব সময়েই বাবুয়া বেড়াতে যেতে চায়।

সাড়ে আট মাসে একটু হাত ধরলে নিজেই উঠে দাঁড়াতে পারে। সাড়ে নয় মাসে খাটের খুরো ধরে নিজেই দাঁড়াতে পারে। রেলিঙ ধরে খাটের এদিক থেকে ওদিক হাঁটতে পারে।

বাবুয়া এখন কথা বুঝে বলতে শিখেছে।

"ফু"—ফুল

"তিক্"—টিকটিকি

"পাঁপ"—মোটর

কখন কোন্ দিকে যেতে চায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়, পা দিয়ে ঠেলে আর বলে "এই", "ওই"। সাড়ে নয় মাস বয়স থেকেই বাবুয়া বেশ দুই একটা কথা বলতে শিখেছে। অনেক কথাই বুঝতে পারে। এইজন্য তার খেলাধূলা এবং মেলামেশার মধ্যে অনেকখানি নূতনত্ব এসেছে। কখনও উপরে যাবে, কখনও নীচে যাবে, কখনও গাড়িতে চড়বে। হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে "ওই যে"।

ছয় মাস পর্য্যন্ত বাবুয়া কমলার রস আর মায়ের দুধ ছাড়া আর কিছু খায় নি। তার পরে ক্রমে ক্রমে দুই এক আউন্স করে (Cow and Gate) বাইরের দুধও দেওয়া হয়। সাড়ে সাত মাসে সামনের নীচের দুটো দাঁত উঠলো। তখন তাকে একখানা করে শক্ত রুটির টুকরা এবং সামান্য একটু আলু সিদ্ধ দুধ দিয়ে মেখে খেতে দেওয়া হলো। নয় মাসে পুরো বাইরের দুধ খেতো, একটু ল্যাংড়া আমের রস আর একটু মর্ত্তমান কলা মাখাও খেতে আরম্ভ করে। এই সময়ে ওকে একদিন ভাত ও আলু সিদ্ধ খেতে দেওয়া হলো। যা স্ফূর্ত্তি করে খেলো, সে এক দেখবার জিনিস। সাড়ে নয় মাসে তার প্রথম অসুখ হয়—সর্দ্দি, কাসি ও জ্বর। মিক্‌শ্চার, শিবাজল ট্যাবলয়ড (Cibazol Tabloid) খেয়ে সেরে গেল। সাড়ে নয় মাসে উপরের দুটো দাঁত উঠলো। ওজন হলো সতেরো পাউণ্ড।

বাবুয়ার খাবার—৬—৮ মাস—পাঁচ বার প্রধানতঃ মায়ের দুধের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে একটু একটু বাইরের দুধ (Cow and Gate) এক বার কমলার সরবৎ। এক চামচ আলু সিদ্ধ দুধ দিয়ে মাখা।

আট মাস—পাঁচ বার মায়ের দুধের সঙ্গে কিছুটা বাইরের দুধ। এছাড়া এর সঙ্গে একবার আলু সিদ্ধ, একবার সেঁকা পাউরুটির টুকরো, একবার সম্পূর্ণ কমলার সরবৎ।

নয় মাস—সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রে বাইরের দুধ (Cow and Gate) ও সঙ্গে সকালবেলায় সেঁকা পাঁউরুটির টুকরো।

দুপুরে একবার ভাত, আলু ও অল্প দুধ (Cow and Gate)। বিকালে আমের রস, কলা ও কমলা, একটা বিস্কুট।

পর্য্যবেক্ষণ—(২) টুকু—

খেলা—টুকু আজকাল যতক্ষণ জেগে থাকে বেশ একাই খেলায় মেতে থাকে। ওর একটা খরগোস, একটা কুকুর, একটা গেলাস, একটা চামচ আর একটা ঝুমঝুমি আছে। সারাক্ষণ এটা নাড়ছে, ওটা ফেলছে। একদিন চামচটা খাট থেকে পড়ে গেল। বেশ শব্দ হওয়ায় টুকু খুশি হলো। ছোট পিসি চামচটা তুলে দিলেন। টুকু আটবার চামচটা মাটিতে ফেলে আর ছোট পিসি তোলেন। খানিকক্ষণ এই খেলা চললো। খরগোস বা কুকুরটাকে নিয়ে টুকু যেন যুদ্ধ করে। একবার উপুড় হয়ে যায়, একবার মুখে পোরে, একবার

চিৎ হয়ে পা গুটিয়ে দুই হাত দিয়ে খেলনাটি ধরে শব্দ করে। চামচ ও গেলাসে ঠোকাঠুকি করে শব্দ করে। আট মাস বয়সে টুকু উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, হাতের ঝুমঝুমিটা খাটে ফেলে না দিয়ে মুখে রেখে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো।

অনুকরণ—বাড়ীতে একটা কুকুর আছে। নয় মাস বয়সে টুকু "বৌ" বলে কুকুরকে ডাকে। মোটরগাড়ীর শব্দ করে বলে "পাপ্, পাপ্,।" পিসিরা হারমোনিয়াম বাজালে টুকু বাজনার রীডে হাত দিয়ে খেলা করে। "বেলো" না করলে শব্দ বার হয় না, অবাক হয়ে দেখে। পিসিরা হাসলে টুকুও হাসে, তাঁরা গম্ভীর হয়ে থাকলে টুকু কান্নার ভাব দেখায়। আবার হঠাৎ বেলো করলে বাজনা বেজে ওঠে, টুকু খুশি হয়। দুপুর বেলায় কাকের তেষ্টা পেলে যে রকম "কক্ কক্" শব্দ করে টুকুও সেই রকম শব্দ করে।

ভয়— সাত মাস বয়স টুকুর—সন্ধ্যাবেলা দুধ খাচ্ছে এমন সময়ে রাস্তা দিয়ে চানাচুরওয়ালা টিনের চোঙ মুখে দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো। টুকু কপাল কুঁচকে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। মা হেসে কথা বললে টুকু আবার দুধ খেতে সুরু করলো। নয় মাসে টুকুকে একটা পশমের খরগোস দেওয়া হয়। খরগোসের সাদা লোমগুলি জড়ানো উলের। টুকুর সেটা পছন্দ হয় নি। বার বার সন্দেহের চোখে সেটাকে দেখে, কাছে নেয় নি।

হাসি— টুকু সর্ব্বদাই বেশ হাসি খুশি থাকে, তবে আজকাল লোক চিনে হাসে। চেনা লোকের কোলে ঝাঁপিয়ে যেতে বার বার বেশ কলহাস্থে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে।

সহানুভূতি ও ভালবাসার প্রকাশ—মা হাসলে টুকুও হাসে, গম্ভীর হলে সেও গম্ভীর হয়ে যায়। টুকুর যখন সাড়ে সাত মাস বয়স তখন বাড়ীতে বড় পিসিমা এলেন, তাঁর কোলে নয় মাসের বাচ্চা মীনু। মীনুর কান্না শুনে টুকুও কান্না সুরু করে দিলো। মনে হয় এটা সহানুভূতিসূচক কান্না।

ছোট পিসি মিছামিছি কান্নার ভাণ করায় টুকুর মুখ শুকিয়ে যায়, মুখের কাপড় খুলে হাসতে সুরু করলে টুকু পিসির গালে মুখে হাত ঘসতে থাকে। টুকুর এখন বয়স নয় মাস।

ভাষা— টুকু বেশী কথা বলে না কিন্তু বোঝে অনেক। আকারে, ইঙ্গিতেও নিজের মনের ভাব বোঝাতে পারে। জল চাইলে ঠোঁট দিয়ে "চক্

চক্" শব্দ করে। কিছু না চাইলে, "না না" করে মাথা নাড়ে। খাওয়ার সময়ে পেট ভরে গেলে থালা বা চামচ ঠেলে সরিয়ে দেয়। মুখ থেকে খাবার বার করে দেয়। "মিউ" বললে বিড়ালকে দেখায়, "ভৌ" বললে কুকুরকে দেখায়। "চশমা" বললে মায়ের চশমা দেখায়। বোতলের দুধ শেষ হয়ে গেলে "যা" বলে।

১০ মাস হতে ১ বৎসর—এই বয়সে শিশুর ব্যবহারে নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। নিদ্রিত অবস্থা ভিন্ন সে কোন সময়েই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে না। চিৎ করে শুইয়ে দিলে একেবারে নিজের চেষ্টায় সে ঘুরে উপুড় হয়ে যায়, পরে হাতে পায়ে ঠেলে বসে পড়ে। খাটের পায়া বা রেলিং ধরে শিশু উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের কৃতিত্বে খুশি হয়ে নানা ধ্বনির সাহায্যে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। নিজের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে তার দৃষ্টি আর আবদ্ধ থাকে না। কাক, চড়াইপাখী, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি নিত্য আগন্তুকদের সে লক্ষ্য করে, তাদের আনাগোনায় খুশি হয় এবং তাদের ধ্বনিবিন্যাস অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। মনে হয় এই সময়ে শিশুর জীবনে যেন এক যুগান্তর ঘটেছে। ১০ মাস বয়স হতে শিশুর পায়ের জোর বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পায়। সে তার দুটি পায়ের সাহায্যে শরীরের সম্পূর্ণ ভার বহন করে দাঁড়াতে পারে, তবে এখনও ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না, টলে টলে পড়ে যায়। তার উপবেশন ভঙ্গীটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের মধ্যে আসায় সে বসে বসে মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখে, এবং শুয়ে পড়ে হামা দেয়। হামা দিয়ে বা পা ঘসে ঘরের চরিদিকে ঘুরে বেড়ায়। এখন শিশু একটি ছোটখাটো আবিষ্কারক, পরিবেশটিকে খুব ভাল করে অনুসন্ধান করাই হলো তার প্রথম ও বিশেষ কাজ। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে জিনিসপত্র নেড়ে, টেনে, টিপে কখনও বা চেখে সে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে চেষ্টা করে।

শিশুর স্নায়ুমণ্ডলী এবং পেশীসমূহও উত্তরোত্তর সবল ও কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। গেলাস বা বাটি মুখের কাছে ধরলে মুখ এগিয়ে এনে বাটির 'কানা'তে ঠোঁট লাগিয়ে দুধ খায়। জিভের ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে এতদিনে, এখন আর কেবল চুষে বা চেটে খায় না কিন্তু জিভ ও দাঁতের সাহায্যে প্রত্যেক গ্রাসটি উপযুক্তভাবে গ্রহণ করে বা ঠেলে ফেলে দেয়। এই সময়ে শিশুর মধ্যে সামান্যভাবে নির্ব্বাচনী ক্ষমতাও লক্ষ্য করা যায় যথা, পেয়ালা, পিরিচ ও চামচ দূরে দূরে সাজিয়ে রাখলে সে তিনটি একত্র করতে চেষ্টা করে, বা তেলের শিশির ঢাকনা খোলা থাকলে বোতলের মুখে বসিয়ে দেয়, অথবা বন্ধ থাকলে খোলবার জন্য টানাটানি করে। দুটি জিনিসের মধ্যে একটা সম্পর্ক

আছে শিশু ক্রমেই তা বুঝতে পারে এবং **বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করবার ক্ষমতার** (intellect and judgment) অঙ্কুরোদগম এই বয়সেই হয়ে থাকে।

শিশুর ভাষা সমৃদ্ধিও বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে দশমাস বয়সে। জিভ নাড়বার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়াতে তার কথা বলবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। "না না, মা মা, বা, বা, তা তা, জল, দুধ" প্রভৃতি দুই একটি সম্পূর্ণ শব্দও সে ব্যবহার করে। মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করে এবং নিজেকে ক্রমেই পরিবারের একজন বলে বুঝতে পারে যথা, বাবা অফিস গেলে হাত ঘুরিয়ে 'নেই' বলে, পাখী উড়ে গেলে 'ফু' বলে কিম্বা মা কাছে এলে 'আয়' বলে। এইভাবে সমাজ-সচেতনা তার এত বৃদ্ধি পায় এই বয়সে যে সময়ে সময়ে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। আয়নাতে নিজের সুকুমার মুখটি দেখে বিস্ময়ে ও খুশিতে তার মন ভরে ওঠে, মায়ের ও নিজের মুখটি একত্রে আয়নাতে প্রতিফলিত হলে নবীন কৌতুকে ও আনন্দময় কলহাস্যে গৃহ মুখরিত করে তোলে। পরিচিত ও অপরিচিতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বুঝতে পারে এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে নিতান্তই পর মনে করে বিচারকের মত তার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে। বেশ ঘনিষ্ঠতা না হলে সে কোনমতেই অজানা লোকের সান্নিধ্য পছন্দ করে না। ক্রমে শিশুর সঙ্গবোধ এতই গভীর হয় যে, দেখা গেছে, আত্মীয়-স্বজন-পরিবৃত গৃহ হতে পিতার চাকুরীস্থলে গিয়ে সে নিতান্তই একাকী বোধ করে, কখন কখন অসুস্থও হয়ে পড়ে। এই একাকিত্ব ও সঙ্গবোধ এবং পরিচিত ও অপরিচিতের মধ্যে পার্থক্যজনিত ব্যবহারই তার সমাজ-সচেতনার সুস্পষ্ট লক্ষণ।

পর্য্যবেক্ষণ—(১) বাবুয়া—

সাড়ে দশ মাস—খুব তাড়াতাড়ি হামা দিতে পারে। এক হাত ধরে হাঁটতে পারে।

এগারো মাস—সিঁড়ি দিয়ে হামা দিয়ে উঠতে পারে।

সাড়ে এগারো মাস—একটুক্ষণ হাত ছেড়ে দাঁড়াতে পারে। সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়াতে পারে। দুচার ধাপ দাঁড়িয়ে নামতেও পারে।

বারো মাস--গাড়ী ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে বা পিছন দিকে হাঁটতে পারে। খাটে সামান্য হাত ঠেকিয়ে খাটের চারিদিকে ও মাটিতে হেঁটে বেড়ায়। অনেকক্ষণ হাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কোন কিছু না ধরে মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে।

দশমাসে—বাবুয়ার কথা আরও স্পষ্ট হয়েছে। "ম" "ন" আর "ল" শব্দগুলি পরিষ্কার করে উচ্চারণ করে। কথা বুঝতে পারে "তাই তাই", "নাই নাই", "আয় আয়" হাত নেড়ে সব দেখাতে পারে।

বলতে পারে—"হিস্"—হিসি
"বোঁও-ও"—পাখা
এগারো মাসে—"তিকতিকি"—টিকটিকি
"ইউ"—বিড়াল
"বাউ"—কুকুর
বারো মাসে—"তা তা"—বেড়ানো
"তাই তাই"—তালি
"না-না"—নাই
"আ-আ"—আয়
"ম্যাম্"—মা
"চান"—স্নান

দশ মাস বয়সে বাবুয়া দাদাদের, মা ও দিদার সঙ্গে খেলনা দিয়া খেলা করতে শিখলো। তালি দেয়, হাত নেড়ে ডাকে, জিভ নেড়ে দেখায়, "টা-টা" বলে, "নাই নাই" বলে, আবার কাককে "কা-আ-আ" বলে ডাকে। হাসলে উল্টে "হা হা" করে হাসে।

হিসি করবার সময়ে সাধারণতঃ একটু ঈঙ্গিত দেয়। কখনও বা কাজ সারা হয়ে যাওয়ার পরেও বলে "হিস"।

এগারো মাসে—বাবুয়ার খেলাগুলির উন্নতি হয়েছে। ছোট কৌটা বা ঢাক্না পেলে বন্ধ করতে চেষ্টা করে, বন্ধ থাকলে খুলতে চায়। বোতাম, পুঁতি কি কাগজ পেলেও নিজের ঘটিতে, বাটিতে রাখে আবার বার করে। খরগোস নিয়ে খেলে—তাকে বাটি চামচ করে খাওয়াতে চায়, থাবড়ে ঘুম পাড়ায়। দাদাদেরও "আ আ" করে ঘুম পাড়ায়, কল্পিত দুধ বা সত্যি করে বিস্কুট খেতে দেয়।

চিরুণী, বুরুস হাতে পেলেই বাবুয়া চুল আঁচড়াতে চেষ্টা করে। চাবি পেলে তালা বা আলমারীতে লাগাতে যায়। আলমারী খুলে বই টেনে বার করে আর উল্টে পাল্টে দেখে। পাউডারের ওপরে ভারি লোভ, চট্ করে লুকিয়ে ফেললেও বালিশ, তোষকের নীচে থেকে খুঁজে বার করে।

দাদারা কাঠের খেলনা বা পাউডারের কৌটা নিয়ে চূড়ো বা মন্দির তৈরি করলে বাবুয়া হাসতে হাসতে সেটা ভেঙে দিয়ে হাত তালি দেয়। লুকোচুরি খেলাও এই বয়সেই সুরু হয়েছে। তাকে ঘাড়ে বা কাঁধে নিয়ে বেড়ালে বা পা ধরে ঝুলিয়ে তুললে, ভয় তো পায়ই না বরং উৎসাহে চেঁচায়।

৯

পর্য্যবেক্ষণ— (২) টুকু—

খেলা— খেলার ধরনের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। টুকুকে একটা পুতুল দেওয়াতে সে নিজে সেটাকে চুমু দিল, তারপর পিসির দিকে তুলে ধরলো যাতে পিসিও আদর করে দেন।

জিনিসপত্র নাড়া চাড়ার মধ্যে একটা সংহতি এসেছে এবং কিছু কিছু কল্পনামূলক খেলারও পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে পুতুলকে খাওয়ানো একটি। "দুধভাত" খেলাটি পিসি বা মা বার বার তার সঙ্গে খেলেন, সেজন্য সেও এখন অন্যের হাত ধরে "আছে?" বলেই "মিউ মিউ" খেলতে থাকে। ঘোড়া, কুকুর খরগোসের পা ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে চায়। খেলার মধ্যে পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

অনুকরণ—টুকু আজকাল নানা রকম শব্দের অনুকরণ করে। কুকুরের "বাউ বাউ", বিড়ালের "মিউ মিউ" তো করেই। মা কাশির শব্দ শুনে টুকুও খক্ খক্ করে কাশে। পিসি বাজনা বাজালেই টুকু হামা দিয়ে এসে পায়ের কাছে বসে আর দুহাত দিয়ে বাজনার রীডে থাবা দেয়। বাবা সিগারেট খান, টুকু ঠোঁট দুটি গোল করে 'ফু' বলে, যেন বাবার মত ধোঁয়া ছাড়ছে।

ভয়— গোয়ালা গরু নিয়ে দুধ দিতে এসেছে, বাড়ীর ঝি টুকুকে কোলে নিয়ে সামনে বসে দেখছে, টুকুর ভ্রূক্ষেপও নাই। ঝি টুকুকে গাভীর কাছে নিয়ে যেতেই সে ফোঁস করে উঠলো। টুকু ভয়ে ঝিকে জড়িয়ে ধরে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রাগ— টুকু কাপড় পরতে চায় না—পিঠ শক্ত করে হাত দিয়ে কাপড় ধরে রাগ প্রকাশ করেছে, তখন ওর বয়স ১ বৎসর।

সহানুভূতি ও ভালবাসা—ডাক্তারবাবু মাকে ইন্‌জেকশন দিচ্ছেন—মা "উ"! বলে ব্যথা প্রকাশ করাতে টুকু ডাক্তারবাবুর পায়ে এক থাবড়া মারে। নিজের ছেঁড়া পুতুলটি কখনও কোলছাড়া করতে চায় না—নতুন পুতুল পেয়েও ছেঁড়া পুতুলটিকে খোঁজে।

ভাষা— টুকু এখন বেশ কথা বলে। বেশীর ভাগ কথাই অবশ্য একটি শব্দ সম্বলিত, যেমন—আউ (আলু), দুদ (দুধ) ইত্যাদি, এখনও যত কথা বোঝে তার চেয়ে কম বলে।

১৫ মাস—শিশুর প্রথম বৎসরের জন্মদিনটি বেশ আনন্দোৎসবের মধ্যে পালন করা হয়। এই বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে শিশুর জনকজননী

ভগবানের নিকটে তাঁহাদের মনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সন্তানের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেন। এ সকল লোকাচার মাত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরীর ও মনের দিক থেকে শিশু দশ মাস বয়সে যে সকল ক্ষমতা, ভাব ও আবেগের পরিচয় দিয়েছিল সেগুলির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনেই তার আরও পাঁচটি মাস অতিবাহিত হয়। পনেরো মাস বয়স হলে তবেই তার শারীরিক ক্ষমতাগুলি বেশ সুস্পষ্ট, সুসংহত ও কার্য্যকরী হয়ে ওঠে এবং তখন থেকে সে ক্রমাগত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে সুরু করে। বস্তুর আকার, আয়তন, উচ্চতা সম্বন্ধে ক্রমেই তার জ্ঞান সুসম্পূর্ণ হয় এবং দেখা যায় যে শিশু পনেরো মাস বয়স থেকে খাটের উপরে উঠতে চেষ্টা করে, উচ্চ স্থান হতে জিনিস পাড়তে যায়, বোতলের মুখে আঙ্গুল পোরে, জলে হাত দিয়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে, থালায় চামচ দিয়ে ঠুন্ ঠুন্ করে বাজনা বাজায়, একই কথার পুনরাবৃত্তি করে, জানালার রেলিং-এ মাথা ঢুকিয়ে চীৎকার করে, রঙীন খড়ি দিয়ে দাগ কাটে—এইভাবে তার নিত্য নূতন পরীক্ষা চলে পরিবেশের সঙ্গে এবং নির্ব্বাচনী ও সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সে তার মনোমত কাজগুলিকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করে এবং অমনোনীত অংশগুলি ক্রমশঃ ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। পনেরো মাস বয়সে শিশুর শব্দভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে—"দাও", "নাও", "হ্যা", "না" বেশ পরিষ্কাররূপেই বুঝতে পারে এবং অন্যান্য আদেশ সুস্পষ্ট ও সহজ হলে সে খুশি হয়েই সেগুলি পালন করে।

শিশুর সামাজিক বোধ এই বয়সে এত দূর বৃদ্ধি পায় যে, যে-সকল কাজে অন্যে সন্তুষ্ট হয় বা আনন্দ প্রকাশ করে, সেই কাজগুলি সে বার বার করতে চায় এবং সে তার আত্মীয় স্বজনের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। রাগ, হিংসা, ভয়, দুশ্চিন্তা, সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রভৃতি আবেগ অনুভূতিগুলি এই সময়ে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। বাদ্যে ও সঙ্গীতে তার অনুরাগ দেখা যায় এবং বার বার একই ছড়া বা গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে। পনেরো মাস বয়সে শিশু বেশ আত্মনির্ভরশীল হয়; জনকজননী অত্যধিক আদর না দিলে সে নিজের হাতে খেতে পারে, চামচ চাটে, খাওয়ার পরে তৃপ্তিসূচক শব্দ করে, খেতে না চাইলে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসও ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তনকালে বেশ আনন্দের সঙ্গে সহযোগিতা দেখায়। অন্যের বিরক্তিতে সে যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে, সকলের আনন্দের সে ভাগ নেয়। এই ভাবে কেবল যে তার বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তা নয়, এখন থেকে **তার ব্যক্তিত্বও** (Personality) ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি যে কেবলমাত্র বিস্তারলাভ করে তা নয়, ক্রমে ক্রমে সেগুলি পরিণতিলাভও করে থাকে। ছয় মাস বয়স হতে নয় মাস বয়সের পরিণতি লাভ করতে তার মাত্র তিন মাস সময় লাগে, কিন্তু ক্রমে এই পরিণতির ক্ষেত্রে (maturation) দীর্ঘতর সময়ের প্রয়োজন হয়। যথা—দুই বৎসর বয়সে শিশু যে-সকল নূতন ক্ষমতা আয়ত্ত করে, সেগুলিকে অভ্যাসের দ্বারা বলিষ্ঠ করে তোলে প্রায় এক বৎসর ধরে এবং সে আবার নূতন ক্ষমতার পরিচয় দেয় তিন বৎসর বয়সে—অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসর পরে। চার বৎসর বয়সের পরে, শিশু আবার যে কয়েকটি নূতন ক্ষমতা আয়ত্ত করে তার সম্পূর্ণ পরিণতি ঘটে ছয় বৎসর বয়সে, অর্থাৎ আরও দুই বৎসর পরে। এতেই বোঝা যায় যে শিশুর বৃদ্ধির গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে আসে কিন্তু তার আয়ত্তজাত ক্ষমতাগুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সবল ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষের শৈশবেই বৃদ্ধির হার দ্রুত ও ব্যাপক। এই তথ্যটি আপাতবিরোধী বলে মনে হলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য।

পর্য্যবেক্ষণ—বাবুয়া—

অঙ্গ সঞ্চালন—হাত ছেড়ে দাঁড়াতে পারে, দু এক পা হাঁটতে পারে। গাড়ী ঠেলে যতদূর খুসী সামনে যায় আবার পিছনে হেঁটে টেনে আনে। আলমারী খুলে জিনিস বার করে, তোলে।

হঠাৎ একদিন বাবুয়া হাত ছেড়ে, জানালার ধার থেকে খাট পর্যন্ত একা হেঁটে চলে এলো। তিন চার দিনের মধ্যে হাঁটতে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে দৌড়াতে সুরু করলো। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি উঠতে ও নামতে পারে। বেশ অনায়াসে সোফায় চড়তে ও নামতে পারে। পিছন দিকে হাঁটা পারে। তার এক নূতন বিদ্যা হয়েছে, প্যাঁচ-কষা বোতলের ঢাকনা খুলতে পারে। না পারলে "উঁ" বলে কারও হাতে তুলে দেয়।

খাটের নীচে ঢুকবার সময়ে মাথা নীচু করে হামা দেয়, তাই আর মাথা ঠুকে যায় না। ছোট চেয়ার টেবিল বাড়ীময় টেনে নিয়ে বেড়ায়। খেলবার গাড়ীতে বা বাক্সে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়ায়। বল হাতে তুলে ছুড়ে ফেলে। ব্যাট নিয়েও বল মারে। সমস্ত খেলনা ঝুড়ির মধ্যে রাখে ও তোলে। পাউডারের কৌটা নিয়ে মন্দির তৈয়ারি করবার চেষ্টা করে।

স্নানের সময়ে ছোট বাটিতে করে জল তুলে গায়ে ঢালে। খাবার সময়ে নিজ হাতে চামচ ধরে মুখে ভাত, ডিম ইত্যাদি তুলতে পারে। মুখে

দ্রষ্টব্য :—এক বৎসর পূর্ণ হলে টুকু তিন মাসের জন্য মামার বাড়ী যায়, কাজেই তাকে এই সময়ে বৈজ্ঞানিক ধারায় পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি

পৌঁছাবার আগেই চামচ উল্টে দেয় বলে কখন কখনও খাবার কিছুটা পড়ে যায় কিন্তু প্রায় সবটাই খেতে পারে।

সামনে খোলা, জামার একটা হাতা খুলে দিলে অন্য হাতাটা নিজেই খুলতে পারে। টেনে টেনে পা থেকে মোজা খুলতে পারে। বোতাম খুলে দিলে প্যাণ্ট খুলতে পারে। মেজাজ ভাল থাকলে কাপড় পরবার ও ছাড়বার সময়ে সহযোগিতা করে। মেজাজ ভাল না থাকলে গোলমাল করে। "এ হাত—ও হাত—এ পা ও পা" বললে হাত পাগুলি একে একে এগিয়ে দেয়।

স্বাস্থ্য—পনেরো মাসেও বাবুয়া দাঁত ওঠা নিয়ে ভুগছে। সাড়ে চৌদ্দ মাসে তার যে আমাশয় হয় তাতে একটু রোগাও হয়েছে। চৌদ্দ মাসে তার ৮টা সামনের দাঁত ছিল, পনেরো মাসে দুটো উপরের কসের দাঁত উঠেছে, নীচের দুটোও উঠবার উপক্রম করছে। দাঁত ওঠার সময়ে কিছুদিন করে শরীর খারাপ ও ক্ষিধের অভাব হয়। এক বছরে তার ওজন ছিল ১৯½ পাঃ, পনেরো মাসে মাত্র ২০½ পাউণ্ড।

সমাজচেতনা—পনেরো মাসে বাবুয়া এখন রীতিমত একটা সামাজিক জীব। অন্যের খেলায় এখন বেশ ভাল করে যোগ দিতে পারে। দাদারা খেলার রেলগাড়ী তৈরি করলে সেও তাদের সঙ্গে বাক্সে চড়ে বসে বলে "পু—হিস্ হিস্।" দাদাদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলে। বল নিয়ে "দাম" বলে ছুড়ে দেয়, হাসতে হাসতে কুড়িয়েও আনে। বন্দুক নিয়ে "থাস্" করে ছোড়ে। আজকাল "বাড়ি বাড়ি" খেলতে পারে। ভাণ করে টেডি ও খরগোসকে খাওয়ায়। বাক্সে দড়ি বেঁধে তাদের বেড়াতে নিয়ে যায়। দাদাদের সঙ্গে সাবান মেখে একদিন স্নানও করেছে।

মানসিক বিকাশ—এক বৎসরের বাবুয়া ১৩টি নূতন কথা বলতো, এখন আরও ৩৩টি নূতন কথা বলতে পারে। বোঝে আরও অনেক বেশী। পনেরো মাস পর্য্যন্ত বাবুয়া বোতলে দুধ খেতো। একদিন নিজেই বোতল ভেঙ্গে ফেলায় পেয়ালায় দুধ দেওয়া হয়, বিনা প্রতিবাদে খায়। এর আগে বোতল ছাড়ানোর চেষ্টা করা হয়, সে প্রতিবাদ করে। দুদিন পরে তার মা ব্যস্ত থাকায় তাকে বোতলে দুধ দেওয়া হয়, তখুনি সে টের পেয়ে গেল যে আর একটা বোতল আছে—তারপরে আর কিছুতেই পেয়ালায় খাবে না।

বাবুয়াকে ডুলি থেকে কয়েকদিন সন্দেশ দেওয়া হয়, তারপর সে সুবিধা পেলেই ডুলি খুলে সন্দেশ খুঁজে দেখে। একদিন একটা খেলনা নীচে পড়ে যায়। বড়দের একজনকে ডেকে কাতরস্বরে "ওই যে, ওই যে" বলে দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে বুঝতে পারলো না, তখন বাবুয়া তার হাত ধরে টেনে

সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে নীচের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল "ওই যে।" জিনিসপত্র বেশ গুছিয়ে রাখে।

দাদা নীচে কাঁদছিল, তাই শুনে বাবুয়া ব্যস্ত হয়ে বললো "দায়দাএঁ, এঁ, এঁ, এঁ ?" পরে যেই দাদা উপরে এলো, অমনি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো "দায়দা দায়দা"।

পনেরো মাসের বাবুয়া ছবির বই দেখতে খুব ভালবাসে। কোন মেয়ের ছবি দেখলে বলে 'মা'। জন্তু জানোয়ারের ছবি, ফুল, জুতো ইত্যাদি স্পষ্ট করে আঁকা থাকলে বুঝতে পারে।

ছোট ছোট আদেশ শুনে পালন করতে পারে। "মাসীকে চিঠি দিয়ে এসো", "আলমারী বন্ধ কর", "চেয়ারে উঠে বসো" শুনে ঠিক কাজটি করে। মা বল্লেন, "মধু জুতো পরিষ্কার করছে—তোমার জুতো এনে দাও।" তাড়াতাড়ি সে দৌড়ে গিয়ে নিজেরএক জোড়া জুতো এনে বললো, "ধু—পা—নাও।"

১৮ মাস—এক বৎসরের শিশু ও দেড় বৎসরের শিশুর মধ্যে পরিণতিজনিত (maturation) বহু পার্থক্য দেখা যায়। এই সময়ে শিশু আরও দুই তিন ইঞ্চি লম্বা হয় এবং ওজনেও তদনুরূপ বৃদ্ধি পায় তার প্রায় উপরে ও নীচে সব-সমেত ১২টি দাঁতও ওঠে। সাধারণতঃ সুস্থ শিশু এই বয়সে ৩০ হতে ৩৩ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং ওজন হয় ২০ হতে ২৭ পাউণ্ড কিম্বা ১০ হতে ১৩½ সের। সে এখনও ১৩ ঘণ্টাই ঘুমায় কিন্তু সচরাচর দিনে একবার মাত্র অনেকক্ষণ ধরে ঘুমায়। তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এখন বহুলাংশে নিজের আয়ত্তে আসায় সে বেশ সাবলীল ছন্দে চলা ফেরা করে। এক বৎসর বয়সে সে সাহায্য পেলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো। এক বৎসর তিন মাসে বিনা সাহায্যেই সোজা হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু দেড় বৎসর বয়সে সে বেশ স্বাধীনভাবেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়—তবে অবলীলাক্রমে দৌড়াতে পারে না। এখন সে সিঁড়ি দিয়ে নিজেই নামতে পারে, কিন্তু এক পা, এক পা করে থেমে থেমে নামে। নতুবা সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে নামে।

এক বৎসর বয়সে শিশু হাতে বল পেলে সেটি গড়িয়ে দিতো, এখন সে ছুড়ে ফেলতে পারে। হাতের কনুই ও কব্জি ঘুরিয়ে বই এর পাতাও উল্টাতে পারে। লক্ষ্য করে দেখা যায় যে তার নির্ব্বাচনীশক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সহজেই সে জিনিসপত্র চিনে স্বস্থানে রাখতে পারে। অনেকগুলি একই ধরনের কাপড় জামা ধুয়ে শুকাতে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সে নিজের জামা-কাপড় চিনে বার করে আনতে পারে। ছোট-খাট জিনিস গুছিয়ে তুলে রাখে, এবং ছবি দেখে কোন্‌টা কি তাও নিজের ভাষায় বলতে পারে। "খোকন,

তোমার চোখ কই, নাক কই?" এ-সব প্রশ্নে সে নিজের চোখ, মাথা ইত্যাদি আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, কিন্তু হাতের বা পায়ের কটি আঙ্গুল আছে—প্রভৃতি কঠিন প্রশ্নের সে এখনও উত্তর দিতে পারে না।

দেড় বৎসরের শিশুর হাতে কয়েকটি কাঠের টুকরো দিলে সে একটির উপরে আর একটি বসিয়ে উঁচু করে "মন্দির" গড়তে চায়, এবং এতেও বোঝা যায় যে উচ্চতা সম্বন্ধে তার একটা ধারণা আছে। কাজে কর্ম্মে আগ্রহ ও মনঃসংযোগও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এই বয়সে, এবং বহুক্ষণ ধরে কাঠের টুকরোগুলিকে (blocks) নানাভাবে ব্যবহার করে সাজায়। কখনও পাশাপাশি, কখনও একটির উপরে অন্য একটি রেখে, কখনও বা হাত দিয়ে সেগুলিকে ছড়িয়ে শিশু প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে, এবং এই বয়সে জিনিস গুণে রাখবার লক্ষণও ক্রমে ক্রমে দেখা দেয়। এককথায় বলতে গেলে তার প্রত্যেক আচার আচরণেই একটি সুস্পষ্ট দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়।

ভাষার দিক থেকেও শিশুর প্রগতি এতই সুস্পষ্ট যে মনে হয়, দেড় বৎসর বয়সে সে শৈশবের এক পরম সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। ক্রমেই তার আধ আধ ভাষার অবসান ঘটে, এবং কুড়ি পঁচিশটি সম্পূর্ণ শব্দের সাহায্যে তার মনের ভাবটি বেশ সহজেই সে বুঝিয়ে দিতে পারে। সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত আদেশ শুনে সে পালন করে বটে কিন্তু নূতন ক্ষমতার গর্ব্বে এবং স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছায় শিশু অনেক সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠের আদেশ অমান্য করে। এই ব্যবহার-বৈলক্ষণ্যকে অবাধ্যতা বলে মনে করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে, কেননা এই সময়ে শিশু তার স্বল্পপরিচিত জগৎকে বুঝতে চায়, তার প্রত্যেক অনুভূতি ও নবলব্ধ ক্ষমতাকে যাচাই করতে চায়, পূর্ণবয়স্কের তাগাদা-তাগিদের কোন মূল্যই সে বুঝতে পারে না। কাজেই পূর্ণবয়স্কের ইচ্ছাতে সে অনেক সময়ে সাড়াও দেয় না। ভর্ৎসনায় ও বিরক্তি প্রকাশে সে বিড়ম্বিত হয় মাত্র, কিন্তু কেন যে সে বিরক্তির কারণস্বরূপ হয়ে উঠেছে, তা সে কোনমতেই বুঝতে পারে না।

এই বয়সে অপরাধ সম্বন্ধেও সে সচেতন হয়ে ওঠেনি এবং মলমূত্রাদি সম্বন্ধেও তার মনে বিশেষ কোন কৌতূহল বা বিরাগ জন্মায়নি। এক বৎসর পর্য্যন্ত শিশু অধিকাংশ সময়েই মলমূত্রাদি ত্যাগ করবার পর জননীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু দেড় বৎসর বয়সে প্রয়োজনের পূর্ব্বেই সে ইচ্ছা প্রকাশ করে। পিতা-মাতা ও ভ্রাতাভগিনীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে শিশু বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই তাঁদের অনুকরণ করতে সুরু করেছে এতদিনে, এবং ক্রমেই তার আত্মপরায়ণতা হ্রাস পেতে থাকে।

পর্য্যবেক্ষণ—বাবুয়া—

অঙ্গ সঞ্চালন—আঠারো মাসে বাবুয়া শরীরের ভারসাম্য (balance) রক্ষা করে অনেক কাজ করতে পারে। বল ছুড়ে দিয়ে বা ব্যাট দিয়ে বল মেরে সে আর এখন উল্টে পড়ে যায় না। রেলিং ধরে ওঠা নামা করতে পারে। উবু হয়ে বসতে পারে। ১৯" উঁচু খাটে চড়তে পারে। দাদাদের নকল করে রেলিং-এর উপরেও দু-এক পা উঠতে পারে।

মাঝে মাঝে বাবুয়া পিছন দিকে হাঁটে ও হামা দেয়। ডিগ্‌বাজী দিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। স্নানের গামলায় নিজেই নামতে ও উঠতে পারে। ভাল করে এখনও জলে চুমুক দিতে পারে না বলে জল খেতে গিয়ে এখনও ফেলে দেয়।

এখন নিজেই 'পটে' মলমূত্র ত্যাগের জন্য বসতে পারে এবং নিয়মিত অভ্যাসও হয়েছে।

মানসিক—দেড় বছরের বাবুয়ার মানসিক বিশেষত্ব হলো যে সে ছবির বই দেখতে ভালবাসে এবং ছবি দেখে বুঝতেও-পারে। পনেরো মাস বয়স হতেই সে মেয়েদের ছবি দেখে বলতো "মা" এবং খুব স্পষ্ট করে আঁকা বিড়াল, ফুল ইত্যাদির ছবি দেখলে "মিউ," "ফু" ইত্যাদি বলতো। কিন্তু দেড় বছর বয়স হতে সে ছবির বই দেখতে খুবই ভালবাসে। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়ে গল্প শুনতে চায়। এখন আর সে ইচ্ছা করে বই ছেঁড়ে না। ছবি দেখে যে নাম শোনে বা যে যে গল্প শোনে সেগুলি মনে রাখে, সেগুলিই আবার শুনতে চায় এবং নিজেও বলতে চেষ্টা করে।

এখন বাবুয়া চিন্তা ও ধারণার মধ্যে (Association of Ideas) বেশ পরিষ্কার যোগ রাখতে পারে। যে-কোন জিনিস বা কাজের জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করলেই যে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় এই সত্যটি এখন সে বুঝেছে। যথা,—গরম লাগলে "বোঁ বোঁ" বলে পাখা ও সুইচ নিজেই দেখিয়ে দেয়।

তার স্মৃতিশক্তিও যথেষ্ট বেড়েছে বলে মনে হয়। আগে মাকে ব্যাগ হাতে করতে দেখলেই কাঁদতো, এখন মা বাইরে গেলে জানে যে তিনি কলেজে যাচ্ছেন। আজকাল অনেকক্ষণ মাকে না দেখলে তবেই কাঁদে।

দেড় বছরে অনুকরণস্পৃহা তার খুব বেশী হয়েছে। মায়ের কলেজের মেয়েদের কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখে সে নিজেও ছোট কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়বার চেষ্টা করে। বই দেখে "এলাড়ম, বেড়াড়ম" প্রভৃতি শব্দ করে বই পড়ার নকল করে।

দেড় বছরে সে হাত, নাক, চোখ, কান ও মুখ দেখাতে পারে। মা কই, দিদি কই, দিদা কই, বাবুয়া কই ইত্যাদি সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। নিজের সমস্ত ব্যবহারের ও পরিচিত জিনিস সে দেখিয়ে দিতে পারে।

সামাজিক—দেড় বছরের বাবুয়া সাড়ে চার বছরের দাদার সঙ্গে যখন খেলা করে তখন তাকে তার প্রায় সমান বয়সী বলে মনে হয়। কেবল যখন দাদারা মারামারি করে তখন সে একটু ভয় পায়।

বাবুয়ার খেলার মধ্যে আরও অনেক নূতনত্ব দেখা যায়। ভাল্লুকটাকে রীতিমত একটি খেলার সঙ্গী বলেই মনে করে। তাকে "পা পা" করে বেড়াতে নিয়ে যায়, "দুদু" খাওয়ায়, আবার মাটিতে ফেলে তার ঘাড়েও চড়ে। কল্পনামূলক খেলাও অনেক বেড়ে গেছে। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে, "চাই দুদু" কিম্বা "চাই দিম" নানা রকম কল্পনা করে নেয়।

দাদারা কেউ কাঁদলে বাবুয়া তাদের আদর করে। ছবির খোকা খুকু কাঁদলে চুমু খায়। তিনটে পাউডারের টিন উপর উপর সাজিয়ে মন্দির তৈরি করে কিম্বা চার পাঁচটা টিন মেঝের উপরে সাজিয়ে রেলগাড়ী তৈরি করে। দুটো গাড়ী চালাতে চালাতে ধাক্কা লাগায়।

ছবি আঁকা ও ভাষা—বছর খানেক বয়স থেকেই বাবুয়ার হাতে কাগজ পেন্সিল দিলে সে হিজিবিজি কাটতো। দেড় বছরে এই সখ খুবই বেড়েছে। তিন চার রংএর পেন্সিল পেলে সবগুলিই পরীক্ষা করে দেখে। এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট জিনিষের ছাব আঁকে না—তবে যাই আঁকুক না কেন বড়দের কাছে প্রশংসা পেলে বড় খুশ হয়।

দেড় বছরের বাবুয়ার নূতন কথার সংখ্যার চাইতেও বলার ধরনটাই লক্ষ্য করবার বিষয়। সে এখন সবশুদ্ধ ৫১টি নূতন শব্দ ব্যবহার করে। মোটের উপর বাবুয়া একটু মিতভাষী; আকারে, ইঙ্গিতে নিজের কাজ উদ্ধার করতে পারলে কথা বলে না। **স্বাস্থ্য**—বাবুয়ার ওজন ও উচ্চতা

১৮ মাস—২৩ পাউণ্ড		৩১ ইঞ্চি উচ্চতা
১৯ মাস	২৪ পাউণ্ড	দুবার আমাশয় হয়
২০ মাস	২৩ পাউণ্ড	
২১ মাস		৩২ ইঞ্চি উচ্চতা
২২ মাস	২৪ পাউণ্ড	৩৩ ইঞ্চি উচ্চতা
২৩ মাস		
২৪ মাস	২৫ পাউণ্ড	৩৩½ ইঞ্চি উচ্চতা

দাঁত—১৮ মাসে	১২ টা	(৮টা সামনের, ৪টা কষের)
১৯ মাসে	১৪ টা	(ডান দিকের দুটো শ্বদন্ত—canine)
২০ মাসে	১৬ টা	(বাঁ দিকের দুটো শ্বদন্ত)

২৪ মাস—দুই বৎসর পূর্ণ হতে শিশুর মধ্যে গভীরতর বৃদ্ধি ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সে এখন ৩২'' হতে ৩৫'' লম্বা হয়েছে এবং তার ওজন হয়েছে ২৫ হতে ৩০ পাউণ্ড। সবশুদ্ধ তার ১৬টি দাঁত উঠেছে। এখনও সে মোট ১৩ ঘণ্টাই ঘুমায় কিন্তু দিনের বেলায় মাত্র ২ ঘণ্টা থেকে ৩/৩½ ঘণ্টা ঘুমায়। সুস্থ শিশুর পক্ষে এর অধিক নিদ্রার প্রয়োজন নাই। দেহটির মধ্যে মাথা এখনও অপেক্ষাকৃত বড়, পা দুটি তুলনায় ছোট কিন্তু কথাবার্ত্তায় সে বেশ সপ্রতিভ। হাঁটু, গোড়ালী ও পায়ের পাতার সঞ্চালনী ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পায় এই বয়সে, কাজেই শিশু অবলীলাক্রমে এবং আস্থার সঙ্গেই দৌড়ে বেড়ায়। লাফিয়ে, নেচে, হাততালি দিয়ে কলহাস্যে নিজের সচেতন মনের পরিচয় দিয়ে থাকে। চোখের পেশীগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংহতি হওয়ায় সে নানারূপ সমস্যা-মূলক খেলাতেও বেশ নিবিষ্ট চিত্তে মেতে থাকে। একটি বৃত্ত, একটি চতুষ্কোণ এবং একটি ত্রিভুজ খাঁজ কাটা কাষ্ঠফলক (Board) ও অনুরূপ পৃথক পৃথক কাষ্ঠখণ্ড শিশুর সামনে রাখলে সে ফলকটির উপরে কাষ্ঠ-খণ্ডগুলি আকার অনুযায়ী অনায়াসেই সাজাতে পারে। ছবি দেখে তার পরিচিত জন্তু জানোয়ারগুলির নাম বলতে পারে। লাল ও হলুদ রং দুটি বেশ ভালই চিনেছে এতদিনে এবং এক ও বহুর মধ্যেও পার্থক্য সে বুঝেছে।

দেড় বছর বয়স হতেই কল্পনামূলক খেলার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই বছর বয়সে এই জাতীয় খেলার পরিণতি অতি সুস্পষ্ট। ছড়া, কবিতা ও গান শুনে শিশু খুশি হয় এবং বার বার একই গল্প বা ছড়া শুনতে চায়। খেলার মধ্যে অনুকরণপ্রবণতাও যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সহজ সৃজনাত্মক খেলা ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টিমূলক কাজ এখনও বেশী দেখা যায় না। এই সময়ে শিশু অসাধারণ তন্মনস্কতা (Concentration) দেখায় এবং একই খেলায় অনেকক্ষণ মেতে থাকে।

পর্য্যবেক্ষণ—বাবুয়া—

স্মরণশক্তি—বাবুয়া ছড়া বলতে পারে না কিন্তু ছড়া তার মনে থাকে। কিছুটা বলে ছেড়ে দিলে সে পূরণ করতে পারে। যথা :—

কাক ডাকে ? — কা কা

খোকা হাসে ? — হি হি

ঘুঘু ডাকে ? — ঘু ঘু
রুই কাতলা ? — কৈ
ভুলো করে ? — ভৌ ভৌ।

মানসিক—সিঁড়ি ওঠবার বা নামবার সময়ে কিম্বা কাঠের টুকরো নিয়ে খেলবার সময়ে এক, দুই, তিন, চার গোণে। তবে তার সংখ্যাজ্ঞান হয় নি, এটি অনুকরণ মাত্র। "আছে, নাই", কথাগুলির আজ কাল সে বেশ ভালো করে বুঝেছে এবং ঠিক জায়গাতেই ব্যবহার করে। "বড়" এবং "ছোট"র জ্ঞানও তার হয়েছে। নির্ব্বাচনীশক্তিও বেশ পরিস্ফুট,—দাদু সকালে তাকে দুটি পাউডারের টিন দিয়েছেন। ১৩টা টিনের মধ্যে ২টি টিন খুঁজে বললো, "এই তিন দুতো।" ট্রাম ও বাসের টিকিট মিলিয়ে দিলে তাও চিনতে পারে। "যদি, তাহলে" এই সম্বন্ধটা সে বুঝতে পারে।

আত্মসচেতনতা যথেষ্টই প্রকাশ পেয়েছে পৌণে দুই বছর বয়স হতে। নিজের যত রকমের ডাকনাম আছে প্রত্যেকটি তার বলা চাই। মা, বাবার ও দিদার জুতো সে চিনতে পারে, কাপড় জামাও চিনতে পারে।

তন্মনস্কতা ও মনোযোগ—বাবুয়ার তন্মনস্কতা (Concentration) বেশ ভাল। কোন বই বা খেলা পছন্দ হলে ১৫ মিনিট হতে ½ ঘণ্টা পর্যন্ত সে একা একা তাই নিয়ে খেলতে পারে। সকালে সে খুব ভোরে উঠে নিজের খাটে বসে রাজ্যের খেলনা নিয়ে নিজের মনে খেলা করে।

খেলা ও কল্পনা—স্নানের গামলায় একটা সেলুলয়েডের পুতুল ও সাবানের কৌটার ঢাকা নিয়ে খেলছে বাবুয়া। প্রথমে "খুকা"কে খুব জল ঢেলে, সাবান মাখিয়ে স্নান করালো। তারপরে সাবানের কৌটা জলে ভাসিয়ে হলো "নৌকা"। খুকাকে তাতে বসানো হলো। নিজেই জলের মধ্যে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হলো "বীজ"—ব্রীজ (পুল)। সেই পুলের তলা দিয়ে নৌকা চালিয়ে তার যা আনন্দ।

তার খেলনাগুলিকে ঘুম পাড়ায়, খাওয়ায়, কথা বলায়, ঝগড়া করায়। পাউডারের টিনগুলিকে নানাভাবে সাজিয়ে রেলগাড়ী চালায়। আগুন বা বরফের ছবিতে হাত দিয়ে বলে "গরম! ঠাণ্ডা!" কল্পনা করতে তার ভারী মজা লাগে। একটা পাতা বা কাগজ মুড়ে ছোট্ট করে এনে সকলের হাতে দিয়ে বলে, "মা পান নাও।"

ভাষা—১০-১১ মাস থেকেই বাবুয়ার কথা বলা এতই বেড়েছে যে তার কথার সংখ্যা গোণা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

৯ মাসে সে ৩টি শব্দ বলতো,
১০ মাসে — ৫টি
১১ মাসে — ৮টি
১২ মাসে — ১৩টি
১৫ মাসে — ৪৬টি
১৮ মাসে — ৯৭টি
২১ মাসে —২৭৫টি
২৪ মাসে —৯৭২টি পর্যন্ত গোণা হয়েছে কিন্তু মনে হয় তার চেয়ে কিছু বেশী বলে।

দুই বছরের বাবুয়া মোটামুটি কত কথা বলে এবং কি ধরনের কথা বলে তার একটা হিসাব দেওয়া হলো।

ক্রিয়াপদ	১৪৭	খেলনা ইত্যাদি	৫৮
বিশেষণ	৯১	অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	৩৩
জীবজন্তু	৮৪	গাড়ী	৩২
মানুষের নাম	৮৮	গাছ, ফুল ইত্যাদি	৩২
খাবার	৭৩	জামা, কাপড়, প্রসাধন	৩৮
গল্প ইত্যাদি	৬৫	বিবিধ	২৩১

বোধশক্তি—এক বছর সাড়ে দশ মাসে বাবুয়া প্রথম "আমি" কথাটার অর্থ বুঝতে পারে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "তুমি" এবং "তুই" বুঝেছে। দুই বছর হতে "আমি" ও "তুমি" বেশ বুঝেই ব্যবহার করে। সম্বন্ধ পদও সে আজকাল ভালই বুঝেছে।

ওপরে	নীচে	রোগা	মোটা
যাওয়া	আসা	লম্বা	বেঁটে
ওঠা	নামা	সাফা	নোংরা
বড়	ছোট	আগে	পরে
ভাল লাগা	খারাপ লাগা	ঠাণ্ডা	গরম
গোল	লম্বা	ভারি	হাল্কা
দুষ্টু	লক্ষ্মী	একটা	দুটো

খেয়েছে, খাচ্ছে, খাবে ইত্যাদি তুলনামূলক কথা সে বুঝতে পারে।

আবেগ ও অনুভূতি—বাবুয়ার মনে যখন স্ফূর্তি থাকে তখন তার মেজাজ খুব ভাল। আদরের ধরনটাও তার ভারি সুন্দর হয়েছে—ঝাঁপিয়ে কোলে এসে আদর ও চুমু ইত্যাদি আদায় করে নেয়।

বাবুয়ার মেজাজ অধিকাংশ সময়েই ভাল থাকে। তখন তাকে ভুলিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ আদায় করে নেওয়া যায়। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো আজকাল নিতান্তই মুস্কিল হয়ে পড়ছে। "না" কথাটা সে বেশী জোর দিয়ে বলতে শিখেছে—"খাব না—যাব না—করব না—জামা পরব না—সাফা না" ইত্যাদি। আরও বেশী রাগ হলে একেবারে "মা নাই—দিদা নাই—ছুহ্ নাই, তুতু না" ইত্যাদি। রাগের চরম কথা "বুবা না" "বুবা নয়" কিম্বা "বুবা নাই।" রাগ হলে বাবুয়া দাঁত কিড়মিড় করে, লাফায়, মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, খাটের নীচে ঢোকে, কোণে গিয়ে দাঁড়ায়, মাটিতে উপুড় হয়ে শোয় এবং যার উপর রাগ করেছে তার কাছ থেকে যতদূরে পারে পালিয়ে যায়। কোন দরকারী জিনিস নিয়ে হয়তো খেলছে—বাধা দিলেই খুব বেশী রাগ হয়।

একথা সত্য, যে মানুষ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে, কিন্তু শৈশবে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে তার বৈচিত্র্য ও গতি পরম বিস্ময়কর। যে শিশুটি প্রথমে কেবল শুয়ে থাকতো, সে ক্রমে বসতে, হামাগুড়ি দিতে, হাঁটতে, হাত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী ধরতে, কথা বলতে, খেলা করতে, রাগ, দুঃখ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে শিখেছে। এই সব কাজ পূর্ণবয়স্কের কাছে সহজ মনে হলেও এগুলি আয়ত্ত করা বড় সহজ নয়। তার জন্য প্রয়োজন জটিল দেহযন্ত্রের পরিপুষ্টির। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্নায়ুতন্ত্রের ও মস্তিষ্কের বিকাশ না ঘটলে শিশুর মানসিক বিকাশ সম্ভব হয় না। সুতরাং শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে লক্ষ্য করতে হবে যে তার দেহ ও মন সেই বিশেষ কাজটি করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে কিনা। সেই প্রস্তুতি কি ভাবে হয় তারই পরিচয় এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

জীবনের প্রথম দুই বৎসরের মধ্যেই শিশুর প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতাগুলি বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা সংযত হয়ে আসে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে শিশু তার পরিবেশটিকে আবিষ্কার করে এবং অনুকরণ ও কল্পনার দ্বারা জ্ঞাত, অজ্ঞাত সকল বিষয়কেই অধিকার করে ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে। এই সময় হতেই তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় এবং সে তার পরিচিত সমাজে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। চিন্তা ও ধারণার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে শিশু নিবিষ্টচিত্তে তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করে এবং এইভাবেই তার জীবন-প্রয়াস ক্রমে ক্রমে সার্থক হয়।

এই অধ্যায়ে যে শিশু দুটির জীবন পরিক্রমা সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল, তাতে আমরা দেখি যে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে অভিজ্ঞতালাভের দ্বারা উপযুক্ত অভ্যাস গঠন হলো শিশু-জীবনের বিশেষত্ব। যদি দেহের ও মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশুর সদভ্যাসগুলি গড়ে ওঠে তাহলে তার জীবনযাত্রা যে সুগম হয়ে উঠবে, এতে কোনই সন্দেহ নাই।

গ্রন্থচী :—

C. W. Valentine—The Psychology of Early Childhood.

C. Burt—The Young Delinquent.

A. L. Gesell—Infancy and Human Growth.

A. L. Gesell & H. Thompson—Infant Behaviour.

Charlotte Pühler—The First Year of Life.

Arthur. T. Jersild—Child Psychology.

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম্মপ্রবাহে শিশুর জীবন-পরিচয়

অতিশয় ৩২ তীক্ষ্ণধী মঃ=২০০
← অনুভূমিক বৃদ্ধি →
২৮ মঃ = ১৭৫
তীক্ষ্ণধী
২৪ মঃ = ১৫০
↑
২০ মঃ = ১২৫
স্বভাবী বা সাধারণ
১৬ মঃ = ১০০
অল্পধী
১১·২ মঃ = ৭০
নির্ব্বোধ ৮ মঃ = ৫০
জড় বুদ্ধি ৩ মঃ=২০
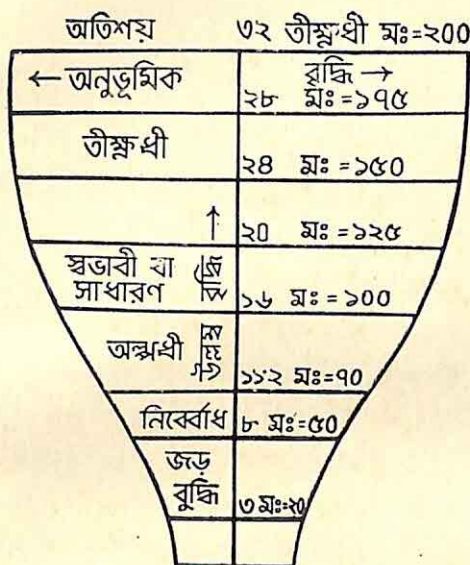
স্যাণ্ডিফোর্ডের মতে সকলের বুদ্ধি উঁচু দরের হয় না বলে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা, জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

টীকা- মঃ = মনস্বিতাংশ (I.Q.)

বুদ্ধির অনুভূমিক বৃদ্ধি (HORIZONTAL GROWTH OF INTELLIGENCE)
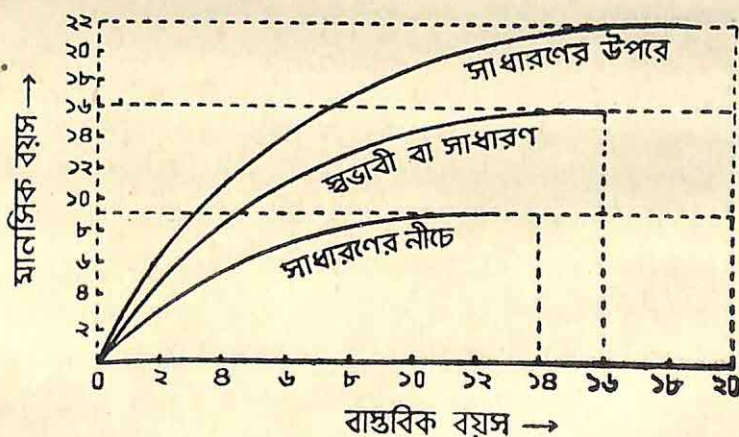
বুদ্ধির উল্লম্ব বৃদ্ধি (VERTICAL GROWTH OF INTELLIGENCE)

কর্ম্মপ্রবাহে শিশুর জীবন-পরিচয়

শিশু যে কিভাবে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তোলে, এ সম্বন্ধে আমরা নিতান্তই উদাসীন। প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়মে শিশুমাত্রেই তার পরিচিত গণ্ডী হতে ক্রমশ: অপরিচিত জগতের সীমাতে এসে পৌছায়, এই কথাই আমরা ধরে নিই। কিন্তু, একথা আমাদের মানতেই হবে যে শিশু যখন এই জানা হতে না জানার পথে চলতে সুরু করে তখন তার মন একটা ছন্দোবদ্ধ গতিতে এগিয়ে চলে। এই গতির যে ছন্দ ও নিয়ম সেগুলিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। পিতামাতা ও শিক্ষকমাত্রেরই এই নিয়মগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, মানবশিশু অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তার নানাবিধ সহজ প্রবৃত্তি থাকে, কিন্তু কোনরূপ অভ্যাস থাকে না। ক্রমে ক্রমে সে তার পরিবেশের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক তৈরী করে নেয়। কি করে জীবনের সঙ্গে তার এই সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটাই আমাদের এখন জানতে হবে।

দেখা গেছে যে, ভ্রূণাবস্থাতেই শিশু উদ্দীপকজনিত উত্তেজনায় সাড়া দেয়, জন্মের পরে সেই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাটিকে সে নবতর ক্ষেত্রে, নব উৎসাহে প্রয়োগ করতে থাকে। এই হলো তার জীবন-প্রয়াস। সমস্ত শরীর ও মন দিয়ে সে এই পরম বিস্ময়কর জীবনটিকে পরখ করে দেখে। জগতের অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারের এক অণুমাত্রেরও সন্ধান পেলে তার অনুসন্ধিৎসু মন বারবার সেই আস্বাদ গ্রহণ করতে চায়, কিছুতেই তার আর সাধ মেটে না।

জন্মের পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত শিশুর জাগ্রত জীবনের অবসরটুকু একটা অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্যতার মধ্যে কাটে। সেই অবস্থায় অবসান হলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে বেশ কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sensation) থাকে কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকে না। নিজের সহজাত প্রবৃত্তির বশেই হোক, কি স্বাভাবিক প্রত্যাবর্ত্তক ক্ষমতার ফলেই হোক সে নিয়মিত স্তন্যপানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। পক্ষকালের মধ্যেই তার ইন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, তারপর ক্রমে ক্রমে ভাববৃত্তিরও উন্মেষ হয়। জননীর কণ্ঠস্বরে সে মাথা ঘুরায়—সেই কণ্ঠস্বরে যে সুধা আছে তাতেই যে কেবল শিশু মুগ্ধ হয় তা নয়, কিন্তু সে জানে যে এই ব্যক্তিটির আগমনে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে এবং একটি কল্যাণময় স্পর্শে তার জীবন-প্রয়াস সার্থক হবে। এইরূপে অবিলম্বেই সে

এমনই নিয়মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার কোন বিচ্যুতি বা পরিবর্ত্তন হলেই সে অসহায়বোধ করে কেঁদে ওঠে। শিশুর বুদ্ধিবিস্তারের এই হলো প্রথম লক্ষণ।

শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সমাবেশে তার প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয়। এই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র হলো তার পরিবেশ। শিশু তার পরিবেশটিকে কখনও খণ্ড খণ্ড করে দেখে না। তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা সে তার ক্ষুদ্র পরিবেশটির অখণ্ড সমগ্রতাকে গ্রহণ করে, অনুভূতির দ্বারা বোধ করে এবং বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে হৃদয়মধ্যে ধারণ করে। জন্মমুহূর্ত্তে শিশুর স্বেচ্ছায় কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না। নিতান্ত জৈব প্রয়োজনেই সে প্রবৃত্তিগত কতকগুলি কাজ করে বটে কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে না। ক্রমে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে কেননা, নিয়মিতভাবে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির ফলে শিশু প্রত্যাশা করার অভ্যাসটিকে আয়ত্ত করে। এখন থেকে যে উত্তেজনায় বা প্রয়োজনে সে সাড়া দেয় সেটি সে অনুভব করে, প্রত্যক্ষভাবে দেখে এবং বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতে চেষ্টা করে। তার সমগ্র প্রয়োজনটিকে যতক্ষণ না সে প্রত্যক্ষরূপে বুঝতে পারে, ততক্ষণ স্বেচ্ছায় সে কোন উত্তেজনায় সাড়া দেয় না। এইজন্য শিশুশিক্ষার প্রথম সূত্রটি হলো—প্রত্যক্ষজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, সমস্ত প্রকৃতিরাজ্যের সংবাদ ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে যখন মনের কাছে পৌছায় তখন হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা প্রাথমিকবোধ। সেই সংবাদ বহির্বিশ্বেরও হতে পারে আবার দেহের আভ্যন্তরীণ কথাও হতে পারে। ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতন্তু উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা স্নায়ুশিরা বয়ে উপনীত হয় মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে এবং তখনই বোধ জাগে। এই প্রাথমিকবোধই হচ্ছে শিশুর বস্তু, স্থান ও কাল জ্ঞানের মূল উপাদান। জীবনের সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতাই প্রাথমিকবোধের উপর নির্ভর করে। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, "যে স্বাভাবিক ও সহজ চেতনা স্নায়বিক শক্তির দ্বারা জাগ্রত হয়ে গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মস্তিষ্কে পৌছায় তাকেই বলে প্রাথমিকবোধ"। (১) অবশ্য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রাথমিকবোধ বলে কোন মানসিক প্রক্রিয়া সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। (২) তাঁরা বলেন প্রাথমিকবোধ ও প্রত্যক্ষজ্ঞান এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে একাধিক প্রাথামকবোধ সমন্বয়ে যে বস্তু-জ্ঞান জন্মায় তাই হলো প্রত্যক্ষজ্ঞান।

(১) "A sensation is the simple consciousness aroused by the transmission of nervous energy from a receptor or sense organ to some part of the cerebral cortex." Physical and Mental Life of School Children. Sandiford.

(২) 'A pure sensation is a psychological myth." Ward.

এখন দেখা যাক, শিশুর মনে কি ভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞান স্থায়ী হয়। ক্ষুধার উদ্রেক হলে খাদ্যের প্রয়োজন। পাকস্থলীতে ক্ষুধাজনিত সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ অনুভব করা মাত্র শিশু কেঁদে উঠলো—অর্থাৎ শিশুর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে একটি পরিস্থিতি বা অবস্থার উদ্ভব হলো। এটি হলো শিশুর প্রাথমিকবোধ ও প্রত্যক্ষজ্ঞান। ক্রন্দনরত, ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে শান্ত করবার জন্য জননী তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং শিশু স্তন্যপানে তৃপ্ত হলো। এইরূপে জীবনে সে একটি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করলো। প্রথমতঃ, পাকস্থলীতে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ হলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, এটি হলো তার প্রাথমিকবোধ (affective aspect); দ্বিতীয়তঃ, সেই জৈব প্রয়োজন ক্রন্দনের দ্বারা জানিয়ে দিতে পারলে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি পরম যত্নে তার ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করবেন, এটি হলো তার কর্ম্ম-প্রয়াস (Conative aspect) এবং তৃতীয়তঃ, শিশু যখন বুঝতে পারলো যে কেবলমাত্র স্তন্যপানে অর্থাৎ আহার গ্রহণেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় আঙ্গুল বা কাপড় চুষলে হয় না, তখন অভিজ্ঞতাজনিত যে জ্ঞানসঞ্চয় হলো তাকে বলা যায় অবগতি (Cognitive aspect)। তিনমাস বয়স হতে শিশু তার প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের প্রতিটি বিষয় বেশ সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করে ও প্রত্যেক উত্তেজনায় বেশ সুসম্বদ্ধ ভাবে সাড়া দেয়। ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা নির্দিষ্ট উত্তেজনায় তার নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াগুলিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে। অভ্যাসের দ্বারাই তার প্রত্যক্ষজ্ঞান স্থায়ী হয়।

নিয়মিত অভ্যাসের ফলে বস্তু-সত্তা সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও ধারণা গড়ে উঠলে পর তার আর একটি নূতন ক্ষমতা দেখা যায়। তার সমগ্র পরিবেশটির মধ্যে যে বিশেষ বস্তুটি তার জীবন-প্রয়াসে অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেটিকেও সে নির্ব্বাচন করতে শেখে—এইভাবে তার নির্ব্বাচনীশক্তিরও অঙ্কুরোদ্গম হয় এই সময়েই। এই নূতন শক্তির সাহায্যে সে বুঝতে পারে যে কোন্ বিশেষ কর্ম্ম-প্রয়াসে তার আত্মরক্ষা হবে এবং সমগ্র পরিবেশে তার স্থানটি কোথায়। যত সহজে এই সত্যটি সে উপলব্ধি করতে পারে, ততই তার পক্ষে মঙ্গল। কেননা জগৎকে জানবার ও চেনবার জন্য তাকে পুনঃ পুনঃ নানা নূতন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, নির্ব্বাচনী শক্তির দ্বারা অপ্রয়োজনীয়কে বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয়কে গ্রহণ করতে পারলে শিশুর জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক।

বহির্জগৎ শিশুর মনের মধ্যে প্রবেশ করে আর একটি জগতের সৃষ্টি করে। সেই জগতে যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতির রঙ, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তা তো নয়, তার সঙ্গে আছে শিশুর ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ভয় ও বিস্ময়,

সুখ ও দুঃখ। সমস্ত হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে ও রঙে রঙীন হয়ে পৃথিবী শিশুর কাছে ধরা দেয়। কোন্‌টা সাদা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট ঐটুকুতেই শিশুমন খুশি হয় না। কোনটা প্রিয়, কোন া অপ্রিয়, কি সুন্দর কি অসুন্দর ; কি ভালো, কি মন্দ এ সংবাদ পাওয়ার জন্যও শিশুচিত্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এই যে বাইরের ও হৃদয়ের জগৎ শিশু এর পূর্ণ পরিচয় পায় কি করে, এবং কোন্ উপায়েই বা তাকে মনোরাজ্যে ধরে রাখে তাই হলো মনোবিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়।

প্রত্যেক নবলব্ধ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষজ্ঞান শিশু তার হৃদয়-মধ্যে সযত্নে ধারণ করে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তার অভি তার স্বল্পপরিসর গণ্ডীটুকু ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে চলে। সেই পরিবেশের মধ্যে থেকে সে যা শিখলো, যা বুঝলো তা তাকে মনে রাখতেই হবে, নতুবা সারা জীবনই তার চারিধারে ঘিরে থাকবে অপরিচয়ের অকূল জলধি! শিশুমন আর কোন দিনই থৈ পাবে না। এইজন্যই জ্ঞানবিস্তারের নিয়ম হলো পরিচিত জগৎ হতে অপরিচিত জগতে অগ্রসর হওয়া এর ফলে শিশু যখনই কোন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখনই সে অভিজ্ঞতার তলদেশ আলোড়ন করে দেখে যে নবোদ্ভূত সমস্যাটি পরিচিত কিনা। সমস্যাটির মধ্যে পরিচয়ের ইঙ্গিত মাত্র খুজে পেলেই শিশু তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়, নতুবা স স্যাটি সমাধান করবার জন্য নবোদ্যমে অগ্রসর হয়। এই সময়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী থাকে পরীক্ষামূলক। প্রত্যেক নূতন সমস্যাকে সে লব্ধ অভিজ্ঞতার পরি েক্ষিতেই বিচার করে এবং এই ভাবে জটিল হতে জটিলতর পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে যে কু জীবনীশক্তি ব্যয় করা উচিত সেইটুকুই সে ব্যবহার করে, অযথা ক্ষয় করে হয়রান হয় না।

শেখা মানে কোন নূতন ক্ষমতা বা ধারণাকে আয়ত্ত করা। পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন সমস্যাকে জয় করতে পারলে শেখা সম্পূর্ণ হয়। শিশুর পক্ষে পুরাতন ও নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা বেশ দুরূহ ব্যাপার, তাই সে বারবার তার পিতামাতা ও শিক্ষকের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। যা শেখা হলো, সেটি ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হলে, সেই অভ্যস্ত শিক্ষার উপরেই ভিত্তি করে শিশু জীবনপথে এগিয়ে চলে। জীবনের প্রারম্ভে শিশু অসংলগ্নভাবে কাজ করে, তার পেশীগুলি তখনও সুবিন্যস্ত হয় না, কাজেই শেখার প্রথম দিকে থাকে অনেক ভুল ভ্রান্তি (wr ng responses)। এই ভুল ভ্রান্তিগুলি শুধরে নিয়ে ক্রমে ঠিক কাজটি করতে পারলে শিক্ষা সার্থক হয়।

জীবনের সমস্ত সার্থকতা মানুষের শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে। সেইজন্য জ্ঞান উন্মেষের আরম্ভ হতেই যাতে শিক্ষা সহজ ও আনন্দময় হয়ে ওঠে এর জন্য নানা গবেষণা হচ্ছে। এই স্থানে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অধ্যাপক থর্নডাইক বলেন যে চেষ্টা ও ভ্রান্তির (Trial and Errors) দ্বারাই মানুষের শিক্ষা সুরু হয়। সহজ ভাষায় আমরা যাকে বলি "ঠেকে শেখ"। যখন কোন জটিল সমস্যায় মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে, তখন সেই সমস্যাটির সমাধানের জন্য সে অন্ধের ন্যায় কতই না নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে থাকে। নানা ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে দৈবাৎ কৃতকার্য্য হলে যে পন্থা অবলম্বন করে সমস্যাটি সমাধান করা গেল, সেই সার্থক উপায়টিকে বারবার অভ্যাসের দ্বারা মানুষ নিপুণভাবে আয়ত্ত করে থাকে। যাতে ভবিষ্যতে অযথা শক্তি ব্যয় না হয়, সেইজন্য অভ্যাসকালে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় আচরণগুলি ত্যাগ করে কেবলমাত্র নিতান্ত আবশ্যক ব্যবহার-গুলির সাহায্যে দক্ষতা অর্জ্জন করাই মানুষের প্রাথমিক শিক্ষার মূল। এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

একটি ক্ষুধার্ত্ত বিড়ালকে খাঁচার ভিতরে বন্ধ করে বাইরে একখণ্ড মাংস রাখা হলো। বিড়ালটি খাদ্যের আশায় খাঁচাটিকে ভেঙ্গে ফেলবার জন্য নানা চেষ্টা করলো। বহু পরিশ্রমের পর হঠাৎ খাঁচার খিলটি খুলে গেল। বিড়ালটি তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে মাংসখণ্ডটি মুখে তুলে নিলো। কোন পরীক্ষা একবার মাত্র করে চরম সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কাজেই কয়েকদিন পরে সেই বিড়ালটিকে আবার ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় খাঁচায় বন্ধ করা হলো। এবারে দেখা গেল যে, সে অযথা তর্জ্জন গর্জ্জন করে বা আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে সময় নষ্ট করলো না। সামান্য চেষ্টাতেই থাবা দিয়ে খাঁচার দরজাটি খুলে বার হয়ে গেল।

এইভাবে মানুষের শিক্ষাও নানা উদ্যম ও ভ্রান্তি, প্রমাদ ও প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েই অবশেষে সার্থক হয়। কিন্তু এই উপায়ে অনেক সময় অযথা নষ্ট হয়, তাই যাতে সার্থক প্রচেষ্টাগুলি মনে রেখে শিশু অল্প সময়ের মধ্যেই কাজে দক্ষতা লাভ করতে পারে এর জন্য মনোবিদগণ আমাদের কয়েকটি উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন। থর্নডাইকের মতে সেগুলি হলো :—

(১) প্রস্তুতি সূত্র—Law of Readiness.

(২) অনুশীলন সূত্র—Law of Exercise.

(৩) পরিণতি সূত্র—Law of Effect,

শিক্ষাকে গ্রহণ করবার জন্য যদি মন উন্মুখ না হয় তাহলে জোর করে শিশুকে কোন বিষয় শেখানো উচিত নয়। মনের প্রস্তুতি ও আগ্রহের অভাব

হলে অনিচ্ছুক শিশু কোন মতেই শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করে না, বরঞ্চ বিপরীত ফলই ঘটে থাকে। সেইজন্য প্রত্যেকবার শিশুর নিকটে কোন নূতন বিষয়ের অবতারণা করতে হলে তার মনে একটা প্রয়োজনবোধ (Motivation) জাগিয়ে তুলতে হবে। কোন্ উদ্দেশ্যে সেই নূতন বিষয়টি শিখছে তা তার মনে পরিষ্কার না হলে সিদ্ধিলাভের জন্য তার কোন আগ্রহ জন্মাবে না।

অনুশীলন সূত্র অনুসারে যে কাজটি যতবার করা যায় সে কাজটি তত বেশী সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক সম্বন্ধটি স্থাপন করাই হলো শেখা (Bond Theory of Learning)। এই সম্বন্ধ স্থাপন করতে যদি মনে কোন বিতৃষ্ণা না জন্মায় তাহলে কাজটি অনুশীলন করা আনন্দময় ও সহজ হয়ে ওঠে। প্রীতিজনক কাজে দক্ষতা লাভ করতে কোন অসুবিধা হয় না। যে সকল অভিজ্ঞতায় মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, মানুষ সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতে চায়। মনের কোণে যেন তারা কোনমতেই আসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারে—এই হলো মানবচিত্তের বিশেষত্ব ;—পরিণতিসূত্রে থর্নডাইক এই কথাই বলেছেন।

মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে "অনুকরণ পদ্ধতি" শিক্ষালাভের আর একটি প্রকৃষ্ট উপায়। অন্যকে অনুকরণ করে কোন বিষয় আয়ত্ত করা অর্থাৎ "দেখে শেখা" শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। পক্ষীশাবক তার জননীকে অনুকরণ করে খাদ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় কিংবা আত্মরক্ষা করে। মানবশিশু পিতামাতাকে অনুকরণ করে চলতে, কথা বলতে, আত্মসংযম করতে এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার শেখে। এই প্রণালীতে শিশুর শক্তি অযথা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে নানা দুরূহ কাজের জন্য সঞ্চিত থাকে। যদি প্রত্যেককে ব্যক্তিগত চেষ্টায় জীবনের সকল শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করতে হতো, তাহলে কোন কাজেই সফলতা লাভ করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ, বরঞ্চ মনে হয় পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে আত্মরক্ষা করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়তো। এমন কি, কঠিন জীবন-সংগ্রামে হয়তো অনেক দুর্ব্বল প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। জীবের জীবন-প্রচেষ্টায় সাহায্য করে তাকে বাঁচিয়ে রাখাপ্রকৃতিমাতার দায়িত্ব, তাই স্বভাবের নিয়মে প্রত্যেক জীবশিশু অনুকরণপ্রিয়।

ব্যবহারবাদী বৈজ্ঞানিকগণ (Behaviourist) থর্নডাইকের মতবাদ কিংবা অনুকরণ-পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি। পাভলভ, ওয়াট্সন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে জীবের প্রত্যেক কাজই কোন না কোন উদ্দীপকজনিত প্রতিক্রিয়ার ফল (Stimulus Response)। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়া স্বভাবজ নাও হতে পারে, কৃত্রিম উপায়েও যে সকল প্রতিক্রিয়া ঘটে তার সাহায্যেও

মানুষের শিক্ষা এগিয়ে চলে। পাভলভের কুকুর সংক্রান্ত পরীক্ষাটি এই সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েছে। একটি কুকুরের সামনে একখণ্ড মাংস রাখা হলো। মাংসখণ্ডটি হলো উদ্দীপক। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে মাংসখণ্ডটি দেখেই কুকুরের মুখ হতে লালা ঝরতে লাগলো। তার কয়েকদিন পরে কুকুটির সামনে মাংস রাখবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই একটি ঘণ্টা বাজানো হলো। কুকুর লক্ষ্য করে দেখলো যে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা একখণ্ড মাংস তার সামনে রাখা হয়। একদিন পাভলভ কুকুরের সামনে মাংস না রেখে কেবল ঘণ্টা বাজালেন, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার মুখ হতে লালা নিঃসৃত হতে লাগলো। মাংস দেখলে কুকুরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় লালা নিঃসরণ, এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে যে লালা নিঃসরণ হলো, তাকে পাভলভ কৃত্রিম উপায়ে অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া (Conditioned reflex) বলেছেন।

ব্যবহারবাদিগণ বলেন যে আমাদের সমস্ত শিক্ষা এই অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়ার ফলেই হয়ে থাকে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে অভ্যাসের দ্বারা রুদ্ধ করাও শিক্ষার অঙ্গ। যেমন, যে কোন জিনিষে হাত দেওয়া শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু পরের জিনিষে হাত না দেওয়া বা আগুনে হাত না দেওয়ার যে শিক্ষা--তা হলো অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়ার ফল। বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুনও এই উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা হয় এবং জীবনের নানা সামাজিক ব্যবহার এই অভ্যস্ত ও কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন মনস্তাত্ত্বিক কতকগুলি শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে শিক্ষার উপায় ও প্রণালী সম্বন্ধে ব্যাপকরূপে গবেষণা করেন। এই মনস্তাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে বলা হয় স্বরূপবাদী (Gestalt School)। এঁরা বলেন, মানুষের প্রত্যেক অভিজ্ঞতারই একটি সামগ্রিক রূপ আছে—যদি প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে তার অখণ্ড রূপটি নষ্ট হয়ে যায় যেমন, একটি চিত্রের সমগ্র রূপটি না বুঝতে পারলে চিত্রটির সৌন্দর্য্য বা বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না কিংবা সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করতে হলে সমস্ত গানটিকে শুনতে হয়, বিচ্ছিন্ন সুরের যোগফলে সঙ্গীত গড়ে ওঠে না—তেমনি মানুষের শিক্ষাও খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার যোগফলমাত্র নয়, এই কথাই স্বরূপবাদিগণ বলে থাকেন। প্রত্যেক নূতন অভিজ্ঞতা সমগ্র লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। শৈশবে অভিজ্ঞতার সমগ্র রূপটি অস্পষ্ট থাকে, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সঙ্কীর্ণ সমগ্রতাকে বৃহত্তর সমগ্রতার পথে চালনা করা পিতামাতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব। শিশুকে পাঠ দেওয়ার সময়ে প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়টি সমগ্রভাবে তার কাছে উপস্থাপিত করতে

হবে—এই যে পদ্ধতি আমরা মেনে চলি তা স্বরূপবাদিগণের মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

শিশু কি করে শেখে সে সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্তগুলি অনুশীলন করে জানা গেল যে, জীবনের আদি অবস্থায় মানুষ তার জৈব প্রয়োজনেই কাজ করে থাকে। বৃহত্তর পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তার প্রয়োজনগুলিও বৃদ্ধি পায়। সেই প্রয়োজনগুলি মিটাবার জন্য তার একটা আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায়। এই সময়টিই শিক্ষকের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। তিনি নির্দ্দিষ্ট, উদ্দেশ্যময় ও স্বাভাবিক প্রেরণার দ্বারা সেই আগ্রহকে লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করবেন। শিশুর লীনশক্তিকে (latent energy) যথাযথরূপে প্রয়োগ করে তাকে আনন্দের সন্ধান দেবেন। উদ্দেশ্য ও প্রেরণা অব্যবহিত (immediate), বাস্তব (real) এবং স্পষ্ট হলে শিশু আনন্দের সঙ্গে কাজটি অভ্যাস করবে। অভ্যাসের ফলেই অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়। স্থায়ী ও লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েই নূতন অভিজ্ঞতাগুলি তাৎপর্য্যময় হয়ে ওঠে—এবং এইভাবেই মানুষের শিক্ষা দিনে দিনে এগিয়ে চলে।

কোন বিষয় শিখতে গেলে চাই বুদ্ধি। বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করে মানুষের আর সব মানসিক প্রক্রিয়া। অভিজ্ঞতা মনে রাখা বা ভুলে যাওয়া, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ, কল্পনা, মনোযোগ প্রভৃতি সবই মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সেইজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধিকে একটি খুব বড় স্থান দেওয়া হয়। বুদ্ধি ঠিক কি জিনিষ, মনস্তাত্ত্বিকগণ সে সম্পর্কে কি বলেছেন তাও সংক্ষেপে জানা ভালো।

প্রথমেই বুদ্ধির কয়েকটি সংজ্ঞা (Definition) দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিনে (Binet) বলেছেন, "সুবিচারের ক্ষমতা, যথাযথভাবে বুঝবার শক্তি এবং যুক্তিপূর্ণ কথাবার্ত্তা হলো বুদ্ধির কয়েকটি প্রধান লক্ষণ।" (৩)

সিরিল বার্ট (Cyril Burt) বলেছেন, "দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলে।" (৪)

ট্যারমান (Terman) বলেন, "যে ব্যক্তি যত বেশী বস্তুবিবর্জ্জিত ও বিমূর্ত্ত চিন্তা করতে পারে—সেই অনুপাতে সে তত বেশী বুদ্ধিমান।" (৫)

(৩) "To Judge well, to understand properly, to reason well—these are essential springs of intellingence.

(৪) "The power to readjustment to relatively novel situations by organizing new psychophysical combinations is called intelligence.

(৫) "An individual is intelligent in proportion as he is able to carry on an abstract thinking.

এই সকল সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা বুদ্ধির মোটামুটিভাবে কয়েকটি বিশেষত্ব দেখতে পাই, সেগুলি হলো :—

(১) নূতন কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তাকে যথাযথরূপে সমাধান করবার বিচারক্ষমতা।

(২) উদ্দেশ্য উপায়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষমতা।

(৩) বস্তু-বিবর্জ্জিত ও বিমূর্ত্তভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা।

অনেক সময়ে বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, একটি শিশুর গণিতে বিশেষ আগ্রহ আছে কিন্তু সাহিত্যে কোন অনুরাগ নাই। আবার কোন শিশুর ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায় কিন্তু অঙ্কে কোনমতেই সে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না। এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি? বুদ্ধি কি বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি না বুদ্ধিই বিভিন্ন রকমের? এ সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিকগণের মধ্যে দুটি বিশেষ মত আছে।

স্পিয়ারম্যান (Spearman) বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি সাধারণ বুদ্ধি (General Intelligence) আছে এবং সমস্ত কাজের মধ্যেই সেই সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার সাধারণ বুদ্ধি একেবারে স্থির নির্দ্দিষ্ট (C nstant) এবং সেই ব্যক্তিরই বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের শক্তি থাকে, সেগুলিকে তিনি বিশেষ ক্ষমতা (Special Abilities) বলেছেন। একই ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতাগুলির মধ্যে প্রভূত পরিমাণে তারতম্য থাকতে পারে যেমন, যে ব্যক্তি বেশ ভালো অভিনয় করতে পারে, অঙ্কে তার হয়তো তেমন বুদ্ধি নাই। স্থির সাধারণ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপরেই বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সাধারণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ না হলে অভিনয়কালে সেই ব্যক্তি কখনই বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারতো না, এবং অঙ্কশাস্ত্রে ততখানি বুৎপত্তি না দেখালেও সে একেবারে মূর্খের মত ব্যবহার করবে না একথাও মানতে হবে।

বুদ্ধি সম্বন্ধে আর একদল মনস্তাত্ত্বিকের মত হলো যে মানুষের বুদ্ধি কতকগুলি বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন শক্তির সম্মিলিত প্রকাশ। এই দলের মধ্যে থর্নডাইক অন্যতম। তিনি বলেন যে, এই বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে, না থাকলেও আশ্চর্য্য হওয়ার কোন কারণ নাই। সাধারণতঃ একই ব্যক্তির বিভিন্ন ক্ষমতার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (Positive Correla ion) দেখা যায়, কিন্তু সেইটাই যে নিয়ম এমন কোন কথা নাই। থর্নডাইক বলেন যে, বিভিন্ন ক্ষমতার মধ্যে যদি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়, সেখানে ধরে নিতে হবে যে তাদের মধ্যে একই উপাদান

বর্ত্তমান আছে। (৬) স্পিয়ারম্যানের মতে বুদ্ধির পরিমাপ করতে হলে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিটি মাপতে হবে আর থর্নডাইকের মতে বিশেষ ক্ষমতাগুলি মাপতে পারলেই মানুষের বুদ্ধির গভীরতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধির পরিমাপ সম্বন্ধেও আলোচনার প্রয়োজন। অনেক সময়ে আমরা বলে থাকি, "কমল ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান" তখনই মনে একটা প্রশ্ন জাগে, "কার তুলনায় বুদ্ধিমান, কি হিসাবে বুদ্ধিমান? তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা বুদ্ধিকে সচরাচর তুলনামূলকভাবে বিচার করে থাকি। বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ বিচারের একটা মাপকাঠি স্থির করেছেন। পথের দৈর্ঘ্য, কূপের গভীরতা, বৃক্ষের উচ্চতা, জড় পদার্থের আয়তন বা ওজন—সবই তো মাপা যায় কিন্তু বুদ্ধি কি মাপা সম্ভব? এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন বিনে। এই ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও তাঁর সহকর্ম্মী সাইমন লক্ষ্য করেছিলেন যে দুটি একই বয়সের শিশুর বুদ্ধিতে যথেষ্ট তারতম্য থাকে এবং বয়সের সঙ্গে বুদ্ধির একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রথমে তাঁরা এক বয়সের অনেকগুলি ছেলেমেয়েকে নানারূপ প্রশ্ন করে তাদের জবাবগুলি সংগ্রহ করে রাখলেন। সঠিক উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে তাঁরা প্রত্যেক বয়সের জন্য এক একটি মান (Stan ard) নির্দ্ধারণ করলেন। ২ বৎসর হতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করে এই দুই বৈজ্ঞানিক "বুদ্ধি-মাপক মান" প্রচলিত করলেন শিক্ষাজগতে।

ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও আমেরিকায় শিশুদের বুদ্ধি মাপবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা হচ্ছে এবং এরই মধ্যে শতাধিক পরীক্ষণ-পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। বুদ্ধি কি ভাবে মাপে তারই অতি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি ৮ বৎসরের ছেলেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নপত্রটি দিয়ে বলা হলো ৫ মিনিটে এর জবাব দাও:—

(১) **যে শব্দটি দেওয়া হয় নি সেটি লেখ:—**
পেনসিল : ড্রয়িং :: তুলি :—?

(২) **উপযুক্ত শব্দটির নীচে একটি দাগ দাও:—**
কর্ণ : শ্রবণ :: চক্ষু :—? (হস্ত, চেয়ার, দর্শন, আহার)

(৩) **বিপরীত অর্থপূর্ণ শব্দটির নীচে দাগ দাও:—**
উচ্চ—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ, সামান্য, নীচ।
উত্তপ্ত—বরফ, অন্ধকার, অগ্নি, সূর্য্য, শীতল, গ্রীষ্ম।

---

(৬) "Whatever correlations are found between abilities, it is due to elements that are common to many of them."

(৪) **ঠিক উত্তরটির নীচে একটা দাগ দাওঃ—**

পাখীর দেহ কি পালকে ঢাকা? হাঁ, না
এই সহরের নাম কি পাটনা? হাঁ, না
ট্রামগাড়ী কি বাষ্পে চলে? হাঁ, না

(৫) **শূন্য স্থানগুলিতে যে যে সংখ্যা থাকা উচিত তাহা বসাওঃ—**

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, — — — —
৯, ১, ৮, ১, ৭, ১, — — — —
৩, ৪, ৬, ৯, ১৩, ১৮, — — — —

সেই ৮ বৎসরের ছেলেটি এই প্রশ্নপত্রটির পাঁচ মিনিটে নির্ভুল জবাব দিল। এর পরে অনেকগুলি একই পরিবেশে পালিত ৮ বৎসরের ছেলেমেয়ে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই প্রশ্নপত্রের নির্ভুল উত্তর দিতে পারে তাহলে জানা যাবে যে প্রশ্নপত্রটি বয়সের উপযোগী হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল যে একটি ৭ বৎসরের ছেলেও এর সবগুলিই নির্ভুল জবাব দিয়েছে। তাহলে এই শিশুটির বুদ্ধির মাপ কত? কেননা দেখা যাচ্ছে তার বাস্তবিক বয়স ৭ বৎসর হলেও তার বুদ্ধির পরিণতি হয়েছে ৮ বৎসরের ছেলের মত। এই কথাটাই অঙ্কে প্রকাশ করা হয়েছে এই ভাবেঃ—এই ছেলেটির মনস্বিতাংশ (Intelligence Quotient, সংক্ষেপে I Q) হলো $\frac{৮}{৭}$ অথবা ১·১৪। ৭ বৎসরের সাধারণ ছেলের বুদ্ধির মাপ বা মনস্বিতাংশ হয় $\frac{৭}{৭}$ = ১·০০। দশমিক বিন্দুটা বাদ দিলে সাধারণ ছেলের বুদ্ধির মাপ হয় ১০০ এবং এই ছেলেটির বুদ্ধির মাপ হলো ১১৪। তাহলে মনস্বিতাংশ বার করবার পদ্ধতি হলো মানসিক বয়স (Mental Age)-কে বাস্তবিক বয়স (Chronological Age) দিয়ে ভাগ করে, সাধারণ মনস্বিতাংশ ১০০ দিয়ে গুণ করা অর্থাৎ

$$\text{মনস্বিতাংশ} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{বাস্তবিক বয়স}} \times ১০০$$

মানসিক বয়স বা মনস্বিতাংশের দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ বুদ্ধির প্রখরতা বিচার করেন। যাদের বুদ্ধি খুব উঁচুদরের তাদের মনস্বিতাংশ সচরাচর ১৪০এর উপরে হয়ে থাকে। এদের বলা হয় প্রতিভাশালী। যাদের মনস্বিতাংশ ১০০, তারা হলো স্বভাবী বা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। ৭০ এর নীচে যাদের মনস্বিতাংশ তাদের বুদ্ধি নীচুজাতের বলে তারা নির্ব্বোধের পর্য্যায়ে পড়ে এবং যারা ০ এর নীচে পড়ে তাদের অপদার্থ জড়বুদ্ধির দলে গোষ্ঠীভূত করে পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিদগণ তাদের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

বুদ্ধির মাপ কত হলে একটি ছেলেকে প্রতিভাশালী বলা যেতে পারে এবং কখনই বা শিশুকে অল্পধী মনে করা ন্যায্য হবে এ সম্বন্ধে উড্ওয়ার্থের মাপ অনুযায়ী বলা যেতে পারে ঃ—

মনস্বিতাংশ	সংজ্ঞা	জনসংখ্যার শতকরা
১৪০ এর উপর	প্রতিভাশালী	১
১৩০—১৩৯	তীক্ষ্ণধী	২
১২০—১২৯	বুদ্ধিমান	৮
১১০—১১৯	বেশ বুদ্ধিমান	১৬
১০০—১০৯	সাধারণ	২৩
৯০—৯৯		২৩
৮০—৮৯	অল্পধী	১৬
৭০—৭৯	নির্ব্বোধ	৮
৬০—৬৯	জড় বুদ্ধি	২
৬০ এর নীচে	অপদার্থ জড়বুদ্ধি	১

শৈশব ও কৈশোর—মানুষের জীবনের এই দুইটি সময়ের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কেননা, মানুষের বুদ্ধির সীমা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত। পণ্ডিতগণ বলেন যে জন্ম হতেই বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হতে থাকে কিন্তু ৫।৬ বৎসর হতে বুদ্ধি-বৃদ্ধির গতি অতি দ্রুত। ১৩।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত এই গতি প্রায় একই হারে চলতে থাকে, তারপরে বুদ্ধির গতি ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসে। ১৬ বৎসর পরে বুদ্ধির আর বৃদ্ধি হয় না তবে জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা বুদ্ধিকে সুসমৃদ্ধ করে জীবনের কর্ম্মনৈপুণ্য বাড়িয়ে তোলা চিরদিনই চলতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর জীবনের মহামূল্য সময়টি পূর্ণবয়স্কের হাতে। এই সময়টির যাতে উপযুক্ত ব্যবহার হয় তার গুরু দায়িত্বও পূর্ণবয়স্কের। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বংশানুক্রম ও পরিবেশ—এই দুটি নিয়েই পরিণত মানবের উৎপত্তি ও বিকাশ। জন্মসম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়ে যায়, কিন্তু তার পারিবেশিক প্রভাব হতে সে কখনও মুক্ত হতে পারে না। আজ আমরা নিশ্চিতরূপেই উপলব্ধি করেছি যে, পরিবেশ যত সুষ্ঠু, সুন্দর ও রুচিসঙ্গত হবে, শিশুর জীবনবিকাশও তত সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতির দরুন আমাদের শিশুসন্তানদের জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি আমরা করতে চাই, সেই অনুকূল আয়োজন করা

আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য রাষ্ট্র ও সমাজ আজ সেই পরিবেশ রচনার দায়িত্ব স্বীকার ও গ্রহণ করেছে এবং শিশু-শিক্ষার মাধ্যমে সেই মহান কর্ত্তব্য পালনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

শিক্ষানুকূল পরিবেশে শিশুর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য কিরূপ আয়োজন ও ব্যবস্থা করা হয় সে সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অনেকেই মনে করে থাকেন যে, সন্তানের যাতে ঠিকতম আহার ও বিশ্রাম হয়, যথানিয়মে তারা স্নানাদি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে যাতে তাদের যথাযথ সুঅভ্যাস গড়ে ওঠে সেজন্য জননী অবিরত পরিশ্রম করে থাকেন। সুতরাং পারিবারিক দায়িত্বকে সমাজ ও রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে পরিবারের সীমাকে সঙ্কীর্ণ করে দেওয়ার প্রয়োজন কি? সে তো বড় অশুভ লক্ষণ। যুক্তির দিক দিয়ে কথাটি সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? সচরাচর গৃহ পরিবেশে বয়স্কদের সুখ-সুবিধা ও খেয়ালের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর মঙ্গলবিধান উপেক্ষিত হয় এবং সহজ সুখাবেশ হতে বঞ্চিত হয়ে তার সম্যক পুষ্টি ও জীবন-বিকাশ ব্যাহত হয়। এমন সব গৃহের সন্তানগুলির মধ্যে আজীবন বঞ্চনাক্লিষ্ট আত্মস্ফূর্ত্তির অভাব থেকে যায়। অনেক গৃহে আদুরে ছেলের খেয়াল-খুশি এমনই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে পড়ে যে ভবিষ্যৎ জীবনে তার স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর খেয়ালখুশি, তার মনোগত অভিপ্রায়, তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহকে ঘিরে প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্যক ও সুস্পষ্ট বিকাশের ব্যবস্থা করতে না পারলে যেমন শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদিকে সংযম, আত্মশাসন ও স্বাবলম্বিতা শিক্ষা না হলে জীবনবিকাশও কল্যাণপ্রদ হয় না। সকল দিকের সুষম ও সমন্বয় শিক্ষা শিশু-শিক্ষায়তনেই সহজ হতে পারে বলে শিক্ষাবিদগণের বিশ্বাস।

জন্ম হতে পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ তারা কাজে ব্যস্ত থাকে। এই কর্ম্মব্যস্ততাকে আমরা "খেলা" আখ্যা দিয়ে এক রকম অবহেলার চক্ষে দেখি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই খেলার সাহায্যেই তারা ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা করে জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে থাকে। সেইজন্য ইন্দ্রিয়বোধ চর্চ্চাই হলো শিশু-শিক্ষার আদি কথা। শিশু প্রত্যেক জিনিষ নেড়ে চেড়ে পরখ করে দেখবে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করবে, এই-ই তার স্বভাব। এই স্বভাবকে অনুসরণ করে শিক্ষা দিলে শিক্ষা সহজ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে যে, ইন্দ্রিয়পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব একটি ধারা আছে এবং সেইখানেই বয়স্ক মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য। দেহ ও মনের গঠন এবং আকৃতি

ও প্রকৃতিতে শিশু পূর্ণবয়স্ক হতে পৃথক বলেই তার শিক্ষাপ্রণালীর একটা স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত। তার নিজস্ব সত্তা কি, কোন্ প্রেরণার ফলে সে তার পরিবেশ হতে বৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করে নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়ে পূর্ণবয়স্ক মানবে পরিণত হবে—এই সকলই বিচার করে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা তো প্রতি গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। শিশুদের মনোবিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটা পরিমাণে তাদের শরীর বিকাশের সমসূত্রে চলে। বয়সের যে অংশে তাদের দেহের বৃদ্ধি দ্রুত, সেই অংশে তাদের মনোবিকাশও দ্রুত হয়ে থাকে। সেইজন্য যে সময়ে শিশু শিক্ষায়তনে থাকে, সেই সময়ে প্রত্যেক শিশুকে অক্লান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। কার স্বাস্থ্য কেমন, কে ওজনে বাড়ছে, কে ওজনে কমছে, কার স্বাভাবিক দেহবিকাশে বা বুদ্ধিবিকাশে কি কি কারণে বিঘ্ন ঘটছে, কে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করতে করতে হঠাৎ কেন থমকে গেল, কেনই বা এই শৈথিল্য—এই অবাঞ্ছনীয় বৈকল্যের স্থায়িত্ব কতদিন, কে বর বর নিরুদ্যম থেকে হঠাৎ উদ্যমশীল হয়ে উঠলো এবং কেনই বা এই উৎসাহ দেখা দিল—এইসব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখলে বুঝতে পারা যায় কার মনের বা জীবনের বিকাশ কি ছন্দে চলে, কার গতির মধ্যে কোথায় মোড় ঘুরে যায়, কোথায় চলতে তার বাধা।

দুই বৎসর পূর্ণ হলে শিশু আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে যোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সময়ে তার দৈহিক বৃদ্ধিহার জীবনের প্রথম দুই বৎসর অপেক্ষা যথেষ্ট কম হলেও তার শরীরের বিকাশবৃদ্ধি অব্যাহতই থাকে। সাধারণ সুস্থ শিশুদের ওজন ও উচ্চতার মাপ হতে যে একটি মান প্রস্তুত করা হয়েছে তারই প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হলো :—

বয়স	ওজন	সের	উচ্চতা	ইঞ্চি
	প্রথম ১০%	শেষ ১০%	প্রথম ১০%	শেষ ১০%
৩ বৎসর	১৩ সের	১৮ সের	৩৪"	৩৮"
৪ বৎসর	১৪½ সের	২০ সের	৩৬"	৪০"
৫ বৎসর	১৬ সের	২২ সের	৩৮"	৪২"
৬ বৎসর	১৭ সের	২৪ সের	৪০"	৪৫"

মাঝের ৮০ ভাগ শিশু এই নমুনার মাপের মধ্যেই ওজনে ও উচ্চতায় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এই বয়সে শিশুদের নিদ্রার অভ্যাসটিও নিয়মিতরূপে লক্ষ্য করতে হবে। শিশু-চিকিৎসকগণ বলেন যে ২ হতে ৪ বৎসরের শিশু ১২ হতে ১৪ ঘণ্টা ঘুমাবে এবং ৪ হতে ৬ বৎসরের শিশু ১১ হতে ১০ ঘণ্টা ঘুমাবে। এইজন্য প্রত্যেক শিশু বাড়ীতে কয় ঘণ্টা ঘুমায় তারএকটা হিসাব রাখলে শিশু-শিক্ষায়তনের শিশুর জন্য নিদ্রার সময়টি পৃথকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হবে। শিশুর নিদ্রাল্পতা বা নিদ্রা-কাতরতা অস্বাভাবিক হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কেননা গ্রন্থিরসস্রাবের তারতম্য দোষে শিশুর এই সকল বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। নীচে শিশুদের বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিদ্রার একটি মান দেওয়া হলো :—

বয়স	সময়	বয়স	সময়
১—৬মাস	১৬ ঘণ্টা	৩—৪ বৎসর	১২ ঘণ্টা
৬—১২ মাস	১৪ ঘণ্টা	৪—৫ বৎসর	১১½ ঘণ্টা
১২—১৮ মাস	১৩½ ঘণ্টা	৫—৬ বৎসর	১১ ঘণ্টা
১½—২ বৎসর	১৩ ঘণ্টা	৬—৭ বৎসর	১১ ঘণ্টা
২—৩ বৎসর	১২½ ঘণ্টা		

মনের বিকাশ দৈহিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তাল মিলিয়ে চলে, তাই শিশু শিক্ষায়তনে এলে তার বুদ্ধির মাপটা জেনে নিতে পারলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। গেসেল-বর্ণিত বুদ্ধিমাপক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বা সেগুইন ফর্ম বোর্ডের (Seguin From Board) সাহায্যে কোন্ শিশুর বুদ্ধির হার কত তারও একটা নিশ্চিত মাপ রাখবার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হলো।

নাম	বাস্তবিক বয়স	মানসিক বয়স
১। মঞ্জিমা বসু	৫ বৎসর ৮ মাস	৩ বৎসরের নীচে
২। আবু রেজা	৪ বৎসর ৭ মাস	৫ বৎসর
৩। রূপশ্রী বসু	৩ বৎসর ৫ মাস	৩ বৎরের নীচে
৪। সুভাষ ভট্টাচার্য্য	৩ বৎসর ৪ মাস	৪ বৎসর
৫। বিমান দত্ত চৌধুরী	৩ বৎসর ৪ মাস	৪ বৎসর
৬। সোনা গাজী	২ বৎসর ৮ মাস	৩ বৎসর
৭। বিমল চৌধুরী	৩ বৎসর ৬ মাস	৫ বৎসর
৮। মনীশ সরকার	২ বৎসর ৭ মাস	৩ বৎসম
৯। দেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	৫ বৎসর ২ মাস	৩½ বৎসর
১০। নির্ম্মল পাল	৪ বৎসর ৪ মাস	৫½ বৎসর

সাধারণতঃ আমাদের দেশের শিক্ষায়তনগুলিতে বৈজ্ঞানিকমতে বুদ্ধি পরিমাপের উপায় ও ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সারা সপ্তাহের কাজের উপরে সহজ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে ব্যবহার করলে মোটামুটিভাবে বুদ্ধির মান খুঁজে পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :—

বাঘ কোথায় থাকে?
কুমীর কোথায় থাকে?
পাখী কোথায় থাকে?
ইদুর কোথায় থাকে?
মাছ কোথায় থাকে?
কুকুর কোথায় থাকে?
রেল কোথা দিয়ে যায়?
বাস কোথা দিয়ে যায়?
জাহাজ কোথা দিয়ে যায়?
এরোপ্লেন কোথা দিয়া যায়?
রিকশা কোথা দিয়ে যায়?
ট্রাম কোথা দিয়ে যায়?

তুমি চোখ দিয়ে কি কর?
তুমি নাক দিয়ে কি কর?
তুমি কান দিয়ে কি কর?
তুমি মুখ দিয়ে কি কর?
তুমি পা দিয়ে কি কর?
তুমি হাত দিয়ে কি কর?
কাক কালো না বক কালো?
পিঁপড়ে উড়তে পারে কি?
ঘোড়া উড়তে পারে কি?
ব্যাঙ কি দৌড়ায়?
কাঠবেড়ালী কি খায়?
শেয়াল কি খায়?

নির্দ্দেশমূলক :—

একটা লাল কাঠ দাও।
দুটো হলদে কাঠ নাও।
দুটো সবুজ কাঠ দাও।
চারটে নীল কাঠ দাও।
পাঁচটা সাদা কাঠ দাও।

সাদা কাঠের উপর নীল কাঠ রাখ।
নীল কাঠ নামিয়ে, লাল কাঠ রাখ।
সবুজ, লাল আর হলদে কাঠ পাশা-পাশি রাখ।
সব কাঠ দিয়ে একটা বাড়ী তৈরী কর।

এই প্রশ্নগুলি দুই হতে তিন বৎসরের শিশুদের পক্ষে উপযোগী। কে কতদূর আমাদের নূতন শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, তাই আমাদের বিচারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো বটেই, এছাড়া শিশুর বুদ্ধি পরীক্ষা করে আরও অনেক সুফল পাওয়া যায়। যেমন, বিমলকে আমরা অবাধ্য ও হিংস্রপ্রকৃতি (aggressive) বলে মনে করতাম। বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার জন্ম বয়স ৪ বৎসর ৪ মাস বটে কিন্তু তার মানসিক বয়স ৫½ বৎসর অর্থাৎ তার মনের পরিণতি সাড়ে পাঁচ বৎসরের শিশুর মত। তার গৃহপরিবেশ সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে গৃহের প্রতিকূল অবস্থায় তার মনে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তাতেই তার ব্যবহার এমন আক্রোশপরায়ণ হয়ে উঠেছে। (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

রাণী কিছুই মনে রাখতে পারে না দেখে আমরা ক্রমশঃ তার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। বুদ্ধির মাপে জানা গেল যে বয়স তার ৫ বৎসর ৮ মাস অথচ তার মনের পরিণতি হয়েছে ৩ বৎসরেরও কম। একে পড়াশুনার জন্য ৫+ দলে না রেখে ৩+বৎসরের দলে রেখে ছড়া, গল্প, গান, হাতের কাজের দ্বারা তার কর্ম্মনৈপুণ্য বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শিশু পরিচালনার ভার গ্রহণ করলে প্রত্যেক শিশুর বুদ্ধির মাপটি কত তা জানা ভালো। অনেক সময়ে দেখা যায় যে বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু কোন কোন শিশু অন্যায় ব্যবহার করে। আবার অনেক শিশু অত্যন্ত বুদ্ধিমান কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা না পেয়ে ক্রমশঃ দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃত কোন কারণে শিশুর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠছে এ তথ্য জানা থাকলে তবেই তো তাকে সংশোধন করা সম্ভব। যে ছেলে বুদ্ধিমান তাকে সংশোধন করার সম্ভাবনা অনেক বেশী। বার্ট বলেছেন, "বুদ্ধির অভাবই অপরাধের কারণ হতে পারে, এবং একমাত্র বুদ্ধির অস্তিত্বেই সংস্কারের আশা করা যায়।" (৭) অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে অনেক সময়ে তার প্রখর বুদ্ধিপ্রসূত অস্বাভাবিক আচার ব্যবহারে পিতামাতাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার বিকৃতির মূল কারণটি জানা থাকলে ত্রুটি সংশোধনের সম্ভাবনা অধিক।

বুদ্ধি অনুযায়ী শিশুদের শ্রেণীবিভাগ করা ভালো। গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী ও নিতান্ত নির্ব্বোধ শিশুর সংখ্যা খুব কম। শতকরা ৬০।৭০টি বালক-বালিকা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এদের মধ্যে যারা পিছিয়ে থাকে, তাদের নানারূপ পরিবেশঘটিত অসুবিধা থাকে বলেই তারা সকলের সঙ্গে ঠিকমত মানিয়ে চলতে পারে না। এদের সেই অসুবিধাগুলি শিক্ষিকা জেনে নিয়ে যতদূর সম্ভব সেগুলি দূর করতে চেষ্টা করবেন। এইভাবে শিক্ষার মান প্রভূত পরিমাণে উন্নত করা যেতে পারে। প্রত্যেক দলের মধ্যে ভাল, মাঝারী ও মন্দ ছেলেমেয়ে থাকে। ব্যক্তিগত কাগজে (individual cards) শ্রেণীর কাজ প্রস্তুত করে শিক্ষিকা প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করবেন। এইভাবে কাজ করলে সময়ের অপচয় ও অনেক অসুবিধা দূর করা সম্ভব হবে। এতে বুদ্ধিমান ছেলেরা অলস

(৭) "A lack of intelligence may be the main reason of faults and the possession of intelligence the sole hope of reform". C. Burt. The Young Delinquent.

বা নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে না এবং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা নিজেদের অক্ষমতায় লজ্জিত হয়ে হিংসুক বা তিক্ত হয়েও উঠবে না।

আমেরিকায় আইয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (Iowa University) ওয়েলম্যান (Wellman) নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ নার্সারী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা করেন। তাঁর পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে সাধারণ (average) বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা নার্সারী স্কুলে গিয়ে শিক্ষাসম্ভাবনায় পূর্ণ পরিবেশ হতে নানা তথ্য আহরণ করে এবং এক বৎসরের মধ্যেই তাদের মনের এমন উন্নতি ঘটে যে তাদের সমবয়সী ও সমবুদ্ধিসম্পন্ন পাড়ার ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী ভদ্র, সভ্য ও কর্ম্মতৎপর হয়ে ওঠে। অতি বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা নার্সারী স্কুলে এসে বুদ্ধিবৃত্তিতে কোন প্রকৃষ্ট উন্নতি দেখায় বলে এমন কোন প্রমাণ তিনি পান নি, তবে তাদের আচার ব্যবহারে প্রভূত উন্নতি তিনি লক্ষ্য করেছেন।

সবচেয়ে ফলপ্রদ পরীক্ষা হয়েছিল অনাথাশ্রমের কয়েকটি শিশুকে নিয়ে। এই সব অনাথ শিশুদের বঞ্চিত জীবনের পরিণাম কি তা আমরা সকলেই জানি। আত্মস্ফূর্ত্তির অভাবে এদের কথা ছিল আড়ষ্ট, শব্দসম্ভার ছিল সামান্য, দৈহিক ও মানসিক বিকাশ হয়েছিল ব্যাহত। এদের একটি সুন্দর আধুনিক শিশু-শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি করে দেওয়া হলো। যে সব শিশুরা নিজেদের গৃহের মনোরম পরিবেশে বড় হচ্ছিল তাদের চেয়ে এই অনাথ শিশুরা প্রথম দিকে বিশেষ কোন বুদ্ধি বা আচার-ব্যবহারে উন্নতি দেখায় নি, কিন্তু ২০ মাস পরে তাদের মধ্যে ৪·৬ হারে বুদ্ধির উন্নতি দেখা যায়। বিনে ও ক্যুহ্‌লম্যান পরীক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা এই শিশুদের বুদ্ধির ক্রমোন্নতি মাপা হয়। ওয়েলম্যান বলেন যে পৃথিবীতে অধিকাংশ শিশুই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সামান্য অবস্থাতেই তারা মানুষ হয়, সুতরাং শিশু-শিক্ষায়তনের উন্নত পরিবেশে তারা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। এছাড়া, ধনী গৃহের সন্তানদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকতে পারে বটে, কিন্তু তাদের নানারূপ বিকৃত ব্যক্তিত্ব থাকার সম্ভাবনাও তেমনই বেশী। কোন শিশু হয় নিতান্ত স্বার্থপর, কেউ বা আলালের ঘরের দুলাল—এদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিশু-শিক্ষায়তন হলো উৎকৃষ্ট পরিবেশ।

শিশুর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সূক্ষ্মপেশীসমূহ ক্রমশঃ সংহত হয়ে আসে। খণ্ড খণ্ড কাষ্ঠফলক একত্র করে ঘরবাড়ী তৈয়ারী করতে, কিংবা পেরেক ঠুকে রেলগাড়ী নির্ম্মাণ করতে তার পরম আগ্রহ দেখা যায়। খাওয়ার সময়ে শিশু পরিবেশনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কেমন

সহজেই সে জলের ঘটি, দুধের গেলাস তুলে নেয়, তারপরে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে অন্য ছেলেমেয়েদের সামনে রেখে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জল বা দুধের ফোঁটা পড়ে না, এবং দুই একবার অঘটন ঘটলেও যদি পূর্ণবয়স্কগণ বিরক্তি প্রকাশ না করেন, তবে ক্রমেই শিশুর নিজের উপর আস্থা জন্মায়। এই সময়ে তার হাতের আঙ্গুলগুলির সঞ্চালনী ক্ষমতাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সামনে কাঁচি পেলেই কাগজ কেটে কুচি কুচি করে, কিংবা কাপড় কেটে পুতুলের কাপড়জামা প্রস্তুত করতে চায়। এই শক্তির যাতে অপচয় না ঘটে, এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিভাবককে অবহিত হতে হবে। নানাবিধ সৃজনমূলক কার্যের দ্বারা এই মহতী শক্তিকে উদ্দেশ্যময় ক্ষেত্রে পরিচালিত করা পূর্ণবয়স্কের দায়িত্ব। শিক্ষাবিদ গেসেল (Gesell) বলেন যে ৮৫—১০০% পাঁচ বৎসরের ছেলেমেয়েরা একটি চতুষ্কোণ কাগজকে খামের আকারে ভাঁজ করে খামের মত মুড়তে পারে, একটি চিত্র দেখে অনুকরণ করতে পারে, সহজ নমুনাতে 'দাগা' বুলাতে পারে এবং মনুষ্যাকৃতিও আঁকতে পারে।

দুই বৎসর বয়সে শিশু হাতে খড়ি পেলেই হিজিবিজি আঁকতে সুরু করে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই সময়ে সে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তার মাথাটি ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে, জিভ ঠেকে গিয়ে গালে, শরীর নানা ভঙ্গীতে দুলে ওঠে, পা ছড়িয়ে দেয় পিছন দিকে, কখনও বা নেয় মুড়ে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পেশীসমূহ যেমন সংহত হয়ে আসে, তার এই সকল অঙ্গ-ভঙ্গিমাও ধীরে ধীরে সংযত হয়ে আসে। দুই বৎসরের শিশু হাতে খড়ি পেলে তার পাঁচটি আঙ্গুল দিয়েই সেটিকে চেপে ধরে এবং মনের আনন্দে কতকগুলি হিজিবিজি কেটে ক্ষান্ত হয়। এই হিজিবিজির মধ্যে কোন চিন্তামূলক চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না।

চার বৎসর বয়সে এই হিজিবিজি আঁকার মধ্যে বেশ পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দাদা দিদিদের হাতের লেখার খাতা দেখে, মাকে চিঠি লিখতে দেখে শিশুর লেখা সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে এতদিনে, সে এখন নিজেও কাগজে কলমে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে চায়। এই সময়ে শিশুর লেখাপড়া তার প্রয়োজনকে ঘিরে সুরু করলে তার প্রথম পাঠগুলি সরস ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। যেমন, মায়েদের আসর হবে আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই উৎসব উপলক্ষ্যে মায়েদের চিঠি লেখে, অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে তাদের নাচ, গান, বাজনা, গহনাপত্র প্রস্তুত করা ইত্যাদি। পাঁচ বৎসরের নীচে যাদের বয়স তারা তো লিখতে পারে না, কাজেই তারা মায়েদের জন্য ছাপা চিঠি নিয়ে যায়। এতে আড়াই বৎসরের

মণীশের মহা আপত্তি! তার দিদি রত্না নিজের হাতে লেখা চিঠি নিয়ে যাবে আর সে কেন এক খণ্ড টাইপ করা কাগজ নিয়ে যাবে? কাজেই তাকেও একটি পেন্সিল ও কাগজ দেওয়া হলো। মণীশ লিখলো বসে নানা হিজিবিজি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বক্তব্য মুখে মুখে বলে গেল। "মা নাচ হবে, ফুল দেবে, দিদি শাড়ী পরবে, মা আস।" এইভাবে আরও দুই চার জন ছেলেমেয়ে মাকে চিঠি লিখতে বসে গেল। তার মধ্যে সাড়ে চার বৎসরের সমীর সবচেয়ে বেশী আগ্রহ দেখালো। এই উপলক্ষ্যেই তার লেখাপড়া স্থুরু হয়ে গেল।

প্রথমতঃ সমীরের লেখার গতি ডান দিক হতে বাম দিকে অগ্রসর হয়, কয়েকদিন পরেই বাম দিক হতে ডান দিকেই এগিয়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা সম্বন্ধেও আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। ২ ১ ৩ ৪ ৫ এইভাবে তার সংখ্যা লেখা এগিয়ে চললো। লেখার সমতা বা সৌন্দর্য্যের প্রতি কোন লক্ষ্য না রেখেই অবিরত ধারায়, অবিশ্রান্তভাবে সমীর লিখে চললো কখনও দেওয়ালে, কখনও মাটিতে, কখনও খাতার কাগজে। দুই সপ্তাহ পরে সমীর নিজের নামটি, বাবা, দাদা, দিদি, মা ইত্যাদি লিখে খুব খুশি হলো। লক্ষ্য করে দেখলে এই লেখার মধ্যেই শিশুর স্বল্প পরিসর জগৎটিকে বেশ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। সমীর "বাবা, দাদা" লিখে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলো বটে কিন্তু তার "মা" লিখতে সবচেয়ে বেশী সাধ কিন্তু "ম" অক্ষরটি যে বড় বেয়াড়া, কিছুতেই তার মোড় ঘোরানো যায় না। অনেক অভ্যাসের ফলে যেদিন প্রথম সে "মা লিখতে পারলো সেদিন তার উল্লাস দেখে কে? এবার "বাহাদুর" লিখতে হবে, কোনমতেই তো তাকে বাদ দেওয়া চলে না। "বাহাদুর" দ্বারবানের সঙ্গেই তো তার সারাদিন খেলাধূলা চলে; বাবা, দাদা, কাকার সঙ্গে সারাদিনের মধ্যে আর কতটুকু দেখাশুনা, কতটুকুই বা সম্পর্ক। ক্রমে মা, বাহাদুর, দাদা পরে বাবা—এই পর্য্যায়ে বার বার লিখে সমীর তার জীবনের পরিসরটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিল।

মানবজীবনে ভাষার প্রয়োজন অপরিমেয়। আমাদের মনের গহনে যে সকল বিচিত্র চিন্তা ও ধারণার উদয় হয়, ভাষার মাধ্যমে আমরা সেগুলি অন্যের কাছে প্রকাশ করি। ভাষার সাহায্যেই আমরা মৌন অতীতকে মুখর করে তুলি, বর্ত্তমানের কাহিনী সঞ্চয় করে রাখি, ভবিষ্যতে একদিন তারা প্রেরণা জোগাবে বলে। আত্মপ্রকাশ, আত্মরক্ষা, কৌতূহল, কল্পনা, সহানুভূতি প্রভৃতি আদিম ও অর্জ্জিত ক্ষমতাগুলির সহজ প্রকাশ হয় ভাষার মাধ্যমে।

ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু কেঁদে ওঠে। এই জন্মক্রন্দনই মানবজীবনে স্বরযন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার। 'পাপপঙ্কিল পৃথিবীতে প্রবেশ করে মানবশিশু দুঃখে

কেঁদে ওঠে' এমনিই একটি প্রচলিত বিশ্বাস বহুদিন ধরে সাধারণ লোকে মেনে আসছে। বৈজ্ঞানিক মতে শিশুর এই প্রথম ক্রন্দন হলো তার স্বাভাবিক জন্মগত প্রতিক্রিয়া। সঙ্কীর্ণ, অন্ধকার মাতৃগর্ভ হতে শিশু যখন এই বিশাল আলোক বায়ুর ধাত্রী-ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করে, তখন তার সর্ব্বদেহে এক প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন থাকায় তার রক্ত-সঞ্চালনের গতি দ্রুত হয়ে ওঠে। বায়ুস্রোত খরবেগে শিশুর স্বরযন্ত্রের ভিতরে প্রবাহিত হয়, তাই শিশু কেঁদে ওঠে। জন্ম হতে চার মাস পর্য্যন্ত শিশু নীরব হয়ে থাকে না। নানা শব্দের দ্বারা সে তার মনের উল্লাস, বিষাদ, দৈহিক-কষ্ট, বিরক্তি সবই জানিয়ে দেয়।

চার মাস হতে নয় মাসের মধ্যে শিশু আবোলতাবোল কথা বলতে সুরু করে। এই মধুর, অস্ফুট কলধ্বনিকে বলা যায় শৈশব-কাকলী। মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে যে শিশু প্রথমে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে, পরে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। স্বরধ্বনির মধ্যে "অ" ধ্বনিই সর্ব্ব প্রথমে উচ্চারিত হয় এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রথমে "ব" তার পরে "ম, প, ফ, ক, ল" এবং সর্ব্বশেষে "র" উচ্চারণ করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম ঘটে না এমন নয়। শৈশব-কাকলী-কালে শিশু একই শব্দ বারবার উচ্চারণ করে যথা :— মা, মা ; দা, দা ; বা, বা। শিশুর এই শব্দ-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক সময়ে পিতামাতা মনে করেন হয়তো বা সে অর্থপূর্ণ কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করছে।

আমরা জানি যে শিশু নীরবে চিন্তা করিতে পারে না। সে যা কিছু ভাবে তা জোরে বলা চাই-ই। এই ভাষণ-ভঙ্গিমা প্রথমে বেশ আত্মকেন্দ্রিক থাকে। ক্রমে শিশুর কথাবার্ত্তা সামাজিক হয়ে ওঠে। আত্মকেন্দ্রিক ভাষণ-ভঙ্গিমা তিন প্রকার—(১) শৈশব-কাকলী ও পুনরুক্তি (২) স্বগতোক্তি (৩) অন্যের উপস্থিতিতে স্বগতোক্তি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্ব্বেই এই স্বগতোক্তির অভ্যাস ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে সামাজিক ভাষণে (Socialised conversation) পরিণত হয়। শিশু যখন আত্মবিস্তৃতির প্রয়োজনে কথোপকথন সুরু করে তখন তার ভাষার রূপ হয় সামাজিক যথা :— (১) অন্যের সহিত তার চিন্তার বিনিময়, (২) অন্যের সমালোচনা, (৩) আদেশ দান, (৪) অনুরোধ জ্ঞাপন, (৫) ভয় প্রদর্শন, (৬) প্রশ্নোত্তর। এইরূপে দেখা যায় যে শিশু ক্রমে স্বগতোক্তি ত্যাগ করে নীরবে চিন্তা করতে শিখছে এবং প্রয়োজনমত অন্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছে।

শিশুমন যেমন বিকশিত হতে থাকে, তার শব্দ-সম্ভারও সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ হতে থাকে। ক্রমে সে নানা চিহ্ন ও সঙ্কেতের দ্বারা নিজের মনের ভাব

প্রকাশ করতে পারে এবং এই সঙ্কেতগুলি অবশেষে হয়ে দাঁড়ায় লিখন, পঠন, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত। ভাষার বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা ক্রমে ক্রমে শিশু যে রসের আস্বাদ পায় তা হতেই ভবিষ্যতে তার সাহিত্যরসের গোড়াপত্তন হয়ে থাকে। স্মিথ (M. K. Smith) কোন্ বয়সে শিশু কত কথাবার্ত্তা বলে তারই একটি পরীক্ষা করেন, নীচে সেই বিবৃতিটি দেওয়া হলো। এই সঙ্গে তুলনার জন্য বাবুয়া ও টুকুরও শব্দ-সম্ভারের একটি বিবৃতি দেওয়া হল।

স্মিথের বিবৃতি ঃ

মাস		শব্দ
১২	—	৩
১৫	—	১৯
১৮	—	২২
২১	—	১১৮
২৪	—	২৭২
৩৬	—	৮৯৬
৪৮	—	১৫৪০
৬০	—	২০৭২
৭২	—	২৫৬২

দ্রষ্টব্য—স্মিথ ৯ জন শিশুকে পরীক্ষা করে একটি সাধারণ হার নিরূপণ করেছেন। এই পরীক্ষার কথা "Measurement of the Size of General English Vocabulary through the Elementary Grades and High School, Genetic Psychology Monographs (1941), 24 : 311—345, পুস্তিকাতে পাওয়া যাবে।

বাবুয়া ঃ—

৯	—	৩
১০	—	৫
১১	—	৮
১২	—	১৩
১৫	—	৪৬
১৮	—	৯৭ বা বেশী
২১	—	২৭৫
২৪	—	৯৭২ বা বেশী

ক্রিয়াপদ	—	১৪৭
বিশেষণ	—	৯১
জীব-জন্তু-পাখী	—	৮৪
মানুষের নাম	—	৮৮
খাবারের নাম	—	৭৩
গল্প ইত্যাদি	—	৬৫
খেলনা ইত্যাদি	—	৫৮
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	—	৩৩
গাড়ী	—	৩২
গাছ, ফুল ইত্যাদি	—	৩২
জামা, কাপড়, প্রসাধন	—	৩৮
বিবিধ	—	২৩১
	মোট—	৯০২

টুকু ঃ—

মাস	শব্দসম্ভার	বিশেষ্য	সর্ব্বনাম	ক্রিয়াপদ	বিশেষণ	অব্যয়
১২	৫	৪	—	১	—	—
১৪	২০	১৫	—	২	১	—
১৬	৫৪	৩৯	—	৯	২	৪
১৮	১০৯	৮২	—	১৪	৯	৪
২০	১৯৭	১৬২	—	২২	৯	৪
২১	২০৯	২০৪	—	৫০	২৮	৮
২২	৩৬০	২৬২	১	৬১	২৮	৮
২৩	৪৩২	৩১৯	২	৭৫	২৮	৮
২৪	৭৬৬	৫৭০	৮	১১৫	৬০	১৩
৩০	৮৫২	৫৮৩	১৩	১৪৫	৯০	২১
৩৬	১১১২	৭০৯	১৮	২২০	১২৯	৩৬

শিশুর কথন-ভঙ্গীতে কোন ত্রুটি আছে কিনা তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। বেশ চার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অনেক শিশু প্রত্যেক শব্দ পরিষ্কার করে বলতে পারে না। কোন কোন শিশুর তোৎলামির দোষও থাকে। তাদের বিকৃত উচ্চারণ শুনে কোনমতেই উপহাস করা উচিত নয়। যেমন আমাদের সুব্রতর কথা বলি। প্রত্যেক বৎসর শরৎকালে আমাদের ছেলেমেয়েরা অভিনয়াদির দ্বারা অতিথিবর্গের মনোরঞ্জন করে থাকে। এক বৎসর স্থির হলো যে "সাত ভাই চম্পা" নামক গল্পটি অভিনয় করা হবে। সুব্রত হতে চাইলো রাজা। পাঁচ বৎসরের সুশ্রী ছেলেটি রাজপুত্রের মতই সুন্দর, কিন্তু সে বড় তোৎলা। এমন করে অভিনয়ের পালা ঠিক করা হলো যাতে রাজাকে বেশী কিছু বলতে হবে না কেবল সাজপোশাক পরে দুই একটি আদেশ দিতে হবে। দিন পনেরো ধরে অভিনয়টি অভ্যাস করা হলো, সুব্রত মোটামুটি বেশ ভালই অভিনয় করলো। অভিনয়ের দিন তার মা তাকে মাথায় পাগড়ী বেঁধে, গোলাপী রং-এর বেনারসী ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে নয় বছরের মঞ্জুদিদির সঙ্গে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলে কিন্তু স্কুলে এসেই অন্যান্য অভিনেতাদের পিঠে গুম্ গুম্ করে কিল মেরে, নিজের জামাকাপড় খুলে ফেলে ছত্রাকার করে ফেললো। মঞ্জুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার মঞ্জু?" সে কেবলই হাসে। আমি তো নিরুপায়, লোকজন সবাই এসে গেছেন, এখন উপায় কি? প্রথমে ভাবলাম হয়তো সুব্রতর সাজপোশাক পছন্দ হয় নি, কাজেই সেগুলি

বদলে দিতে চাইলাম। তাতে সে আমার চুল টেনে, হাতটা নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে বলে, তাড়াতাড়ি সুব্রতকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলাম। অনেক করে পিঠে হাত বুলিয়ে, আদর করে, কোলে নিয়ে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম যে সুব্রত অঝোরে কাঁদছে, কান্নার মধ্যে কোথায় যেন একটা দুঃখ লুকিয়ে আছে। আবার মঞ্জুকে ডেকে বললাম, "যাও হলঘর থেকে তোমার মাকে ডেকে আনো।" মায়ের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম যে সুব্রতর ভাইবোনেরা তাকে তোৎলা বলে ক্ষেপিয়েছে, আর ওর বিকৃত উচ্চারণ-ভঙ্গিমা অনুকরণ করে এমনই ঠাট্টা করেছে যে সুব্রত আর কোনমতেই অভিনয় করবে না। সত্যি করে ওর মাও যেন একটু দ্বিধা বোধ করছিলেন "কেনই বা তোৎলা ছেলেকে অভিনয় করতে দেওয়া—বাদ দিলেই তো হতো।" কিন্তু আর তো দেরী করা চলে না। অভিনয়সূচী সম্পূর্ণ অদলবদল করে "সাত ভাই চম্পা"টি সব শেষে দেওয়া হলো এবং প্রায় এক ঘণ্টা সুব্রতকে কোলে নিয়ে শান্ত করে অভিনয়ে নামানো হলো। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, রাজার ভূমিকায় যে কোন শিশুই অভিনয় করতে পারতো, কেননা প্রত্যেক অভিনয়াংশ প্রত্যেক শিশুরই মুখস্থ ছিল কিন্তু সুব্রতকে এই ক্ষেত্রে বাদ দিলে তার প্রতি যে অবিচার করা হতো তা হতো সত্যই অমার্জ্জনীয়।

তোৎলামির নানা কারণ আছে, তার মধ্যে মানসিক উদ্বেগ একটি বিশেষ কারণ। অনেকে পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে তোৎলামি করে। অনেক শিশু আবার অপরিচিত স্থানে এসে এক রকম হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং তার জন্যও কথাবার্ত্তা জড়িয়ে যায়। লাজুক শিশুকে সকলের সামনে আবৃত্তি করতে বললে সেও তোৎলামি করতে পারে। এই সব পরিস্থিতির উপরে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে, এমনও দেখা যায় যে শিশুর আগ্রহ অন্যদিকে সঞ্চালিত হয়েছে বলে তার ভাষার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। হাসি বলে একটি দশমাসের মেয়ে হাঁটা-চলার আগে বেশ পরিষ্কার করে কথা বলতে পারতো। এগারো মাস বয়সে সে হাঁটতে সুরু করে, এমন মজা পেলো যে সে সারাদিনই বাগানে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষার বিকাশগতিও মন্দীভূত হয়ে এলো। হেঁটে বেড়াবার আনন্দ পুরাতন হয়ে গেলে তার কথার স্রোত আবার স্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পেলো। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু ভাষা ব্যবহারের সুযোগই পায় না, কেননা সে তার প্রয়োজনগুলি ব্যক্ত করবার পূর্ব্বেই

জননী তার অভাব অভিযোগ মিটিয়ে দেন—এতেও শিশুর ভাষাবিকাশ ব্যাহত হয়। যারা আজন্ম বধির তারা স্বভাবতঃই মূক। বেশ ছোটতেই শিশুর গলার শব্দ শুনে ও ব্যবহার দেখে সহজেই বোঝা যায় যে সে মূক। মূক ও বধির শিশুদের জন্য প্রায় সকল দেশেই স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং এই ব্যবস্থার যত বেশী প্রসার হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

প্রচলিত ভাষায় আমরা যাদের 'ন্যাটা' বলি অর্থাৎ যারা বাম হস্ত ব্যবহার করে তারাও সচরাচর সাধারণ শিশুদের তুলনায় দেরীতে কথা বলে। যেমন আমাদের অনিল—বাঁ হাতে লেখে বলে বাড়ীতে নিত্যই তাকে তাড়না করা হয়। ডান হাতে লিখতে গেলে তাকে লেখার উপরেই এত মনঃসংযোগ করতে হয় যে যে চিন্তা ও লেখার মধ্যে সে যোগাযোগ রাখতে পারে না, ফলে তার কথা যায় জড়িয়ে, লেখার গতি হয় মন্দীভূত এবং তাকে স্বল্পবুদ্ধি মনে করে তার পিতামাতা বিরক্তি প্রকাশ করেন। স্কুলে তাকে বাঁ হাতে লেখার জন্য কিছুই বলা হয় না কাজেই সেখানে সে কাজে বা কথায় পিছিয়ে পড়ে থাকে না। স্কুলের কাজে ও বাড়ীর কাজে এমন বিষম পার্থক্য লক্ষ্য করে অনিলের মা আমার সঙ্গে একদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে বাঁ হাতে লেখায় বা কাজ করায় কোনও দোষ নাই, অস্বাভাবিকত্বও নাই; বরঞ্চ শিশুটির স্বাভাবিক ক্ষমতা অন্য খাতে প্রবাহিত করলে তার সমূহ ক্ষতি হতে পারে। অনিলের মা এখন থেকে অনিলকে বাঁ হাতেই কাজকর্ম করতে দেন; ফলে শিশুটি যে বেশ বুদ্ধিমান এমন পরিচয়ও আমরা পেয়েছি।

এ কথা বলা আবশ্যক যে শিশু-শিক্ষায়তনে যেভাবে ভাষাশিক্ষা দেওয়া হয় তা পুঁথিগত নয়, কাজেই সেখানে শিক্ষা স্বভাবজ। ভাষাশিক্ষার প্রধানতঃ তিনটি দিক আছে—(১) বুঝতে ও বলতে শেখা, (২) পড়তে শেখা এবং (৩) লিখতে শেখা। কথা বুঝতে ও বলতে শেখা শিশুর জীবনে যে ভাষা-শিক্ষার প্রথম সোপান একথা বলাই বাহুল্য। সেইজন্য শিশু-শিক্ষায়তনে কথা শুনতে ও বলতে প্রচুর সুযোগ না পেলে শিশুর ভাষা-শিক্ষা ব্যাহত হওয়ারই সম্ভাবনা। তাই গান, গল্প, ছড়া ও কবিতার সাহায্যে এবং নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের দ্বারা শিশুকে অনর্গল কথা শুনতে ও বলতে সুযোগ দিতে হবে, তাহলে সে অল্পদিনের মধ্যেই কথিত ভাষায় নিঃসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হবে। এই বয়সে শিশুর অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকলে, তার ভাষাশিক্ষা সহজ ও সরস হয়ে উঠবে। শিশুমনের এই সুপরিণতির জন্য চাই প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ যোগ, তারই ফলে শিশু কেবল সাহিত্যরসের

সচ্ছলতায় খুশি হবে না, একদিন সে চাইবে রসের উচ্ছলতা এবং তখনই আমরা বুঝবো যে শিশুর ভাষাশিক্ষা সার্থক হয়েছে।

গ্রন্থসূচী :—

Charles E. Skinner & P. L. Harriman—Child Psychology.

A. L. Gesell—The Mental Growth of Pre-School Child.

J. Piaget—The Language and Thought of the Child.

J. M. Fletcher—The Problem of Stuttering.

Mary M. Shirley—The First Two Years.

Arthur T. Jersild—Child Psychology.

প্রতিভা গুপ্ত—সমাজ ও শিশুশিক্ষা—সপ্তম অধ্যায়—প্রাক্ প্রাথমিকস্তরে লিখন, পঠন ও গণনাশিক্ষা

———

সপ্তম অধ্যায়

শিশু পর্য্যবেক্ষণে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা
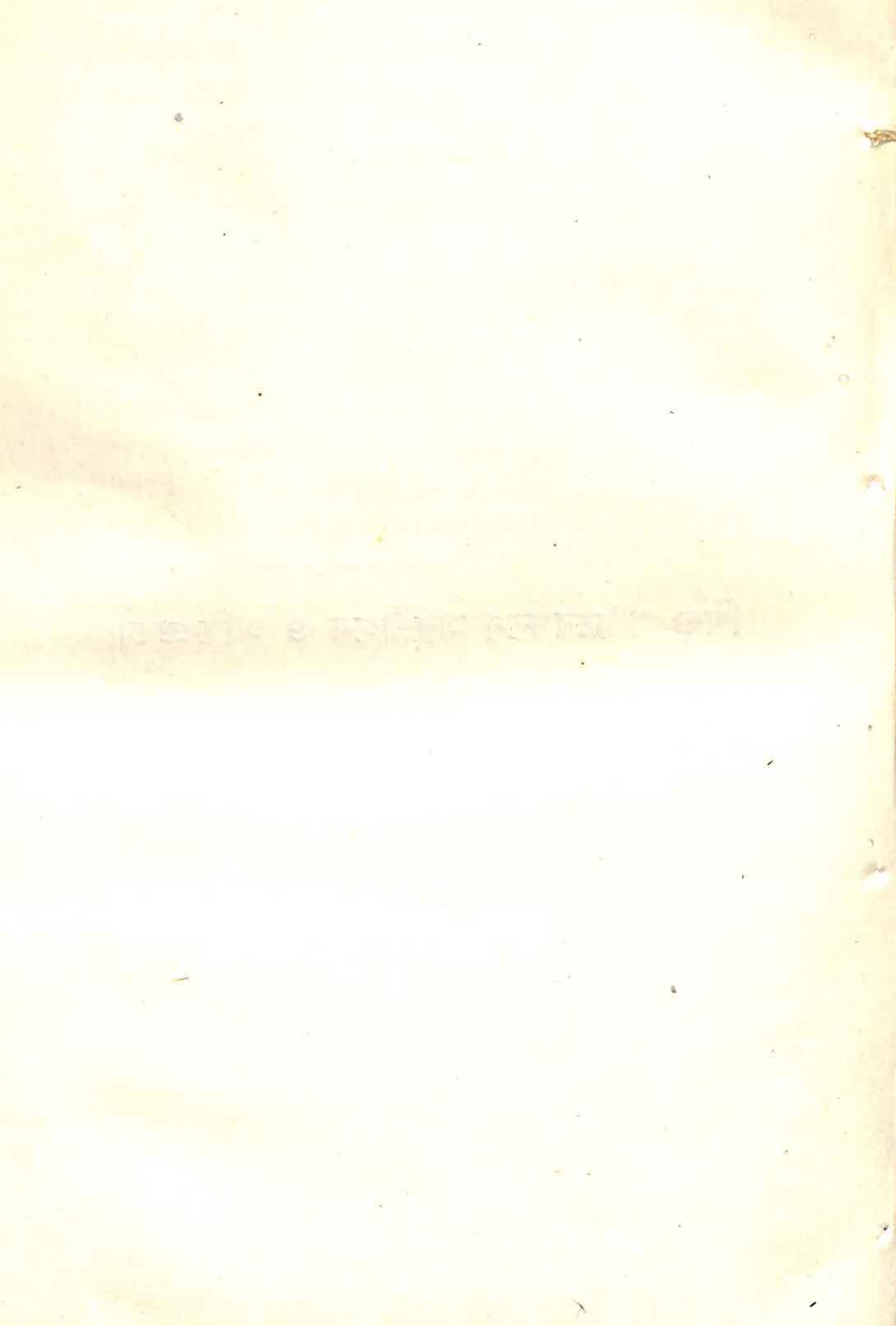
শিশু পর্য্যবেক্ষণে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা

জন্মকালে শিশুর কি কি মৌলিক সহজাত সম্পদ থাকে সে বিষয়ে পূর্ব্বে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিশু-শিক্ষায়তনে এই সহজাত ক্ষমতাগুলি কিভাবে উন্মেষিত হয়ে ক্রমে পরিণতি লাভ করে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা কি উপায়ে সেগুলির বিকাশ ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারেন, এই অধ্যায়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই। অনেক সময়ে বহু অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী যে সকল প্রশ্ন করেন তাতে সহজেই বোঝা যায় যে, "কর্ম্মমাধ্যমে-শিক্ষা", "পুস্তকহীন-শিক্ষা" কিম্বা "খেলার মাধ্যমে-শিক্ষা" প্রভৃতি গূঢ় অর্থপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নাই, অথচ এ সম্বন্ধে জানতে তাঁদের আগ্রহ অসীম। সেইজন্য মনে হয়, শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করলে শিশু-শিক্ষানুরাগী সকলেই বিভিন্নরূপে উপকৃত হবেন এবং নূতন শিক্ষাপদ্ধতিগুলিকে কার্য্যকরী করে তুলে শিশু-শিক্ষাকে আনন্দময় ও সার্থক করে তুলবেন।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, শিশু-শিক্ষায়তনে পুঁথিগত বিদ্যার কোন বিশিষ্ট স্থান নাই, অথচ দুই হতে ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত শিশুরা বিদ্যালয়ে কি শিখবে, কি করবে এ সম্বন্ধে পিতামাতা ও অভিভাবকগণের কৌতূহল হওয়া অতি স্বাভাবিক। তাঁদের অবগতির জন্যও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কার্য্যক্রম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

আমরা সকলেই জানি যে, শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল ও অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস। জন্মের পর হতে তার জাগ্রত অবসরটুকু খেলাধূলাতেই কাটে, কিন্তু কেবলমাত্র সাময়িক আনন্দলাভের জন্য সে খেলে না। তার জীবনের একটি গোপন উৎস ও কর্ম্মপ্রবাহের সন্ধান পাওয়া গেছে এই খেলার ভিতরে—তাই শিশুর জীবনে খেলা হলো পরম গুরুত্বপূর্ণ এবং চরম তাৎপর্য্যময়।

লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, শিশু তার প্রত্যেক অভিব্যক্তিতেই নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্য ও আবেগময় পার্থক্য বজায় রেখে চলে। এই বয়সে ভাষার সাবলীল গতি তার থাকে না, কাজেই জীবনপথে যে-সকল বিস্ময়কর ও নিত্যনূতন তথ্যের সে সন্ধান পায় সেগুলি ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করতে না পেরে সে খেলার মাধ্যমে ব্যক্ত করে। খেলাই হলো তার ভাষা, এরই

সাহায্যে সে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করে এবং নিজের পরিবেশে তার নিজস্ব সত্তা কি, তারও একটা যথাযথ বিচার করতে শেখে। বাস্তবের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র রক্ষার প্রচেষ্টা শিশুজীবনের একটি জটিল দায়িত্ব—কেবলমাত্র খেলার সাহায্যে শিশু তার বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য-সূত্রটি খুঁজে বার করে। এইজন্য শিক্ষাবিদগণ শিশুর জীবনের খেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে খেলার সাহায্যেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলে মনে করেন।

জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিশু যে ভাবে বৃদ্ধি পায় এমনভাবে আর কোন সময়ে তার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। এই সময়ে তার সম্পূর্ণ বিকাশধারা মূলতঃ তার আবেগ অনুভূতির যথাযথ প্রয়োগ ও প্রসারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। কাজেই যদি বলা যায় যে শিশুর আবেগ ও অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশের উপরেই তার সমগ্র জীবনগতি নির্ভর করে তাহলে নিতান্ত ভুল বলা হবে না।

শিশু যে কত রকমে আত্মপরিতৃপ্তির পথ খোঁজে তার ইয়ত্তা নাই। মনের যে ইচ্ছা বা আবেগের স্বাভাবিক তৃপ্তির উপায় নাই সেগুলিকে সে খেলার সাহায্যে তৃপ্ত করে। ফ্রয়েডপন্থীরা বলেন যে, খেলা হলো আত্মতৃপ্তির একটা নির্দ্দোষ পথ। যেমন, যে ছেলের অনেকগুলি পিঠে খাওয়ার ইচ্ছা ছিল অথচ মা দেন নি, সে খেলার সময়ে অনেক পিঠে তৈরী করে "খাওয়া খাওয়া" খেলে। এই কল্পনাবিলাসে তার বঞ্চিত মন তুষ্ট হয়। (১)

শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবন-ধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রকাশ হলো খেলা। মানসিক অসুস্থ (neurotic) ছেলেদের একটা লক্ষণ হলো যে তারা খেলতে পারে না। মেলানি ক্লাইন (Melanie Klein) এরূপ বহু শিশুকে চিকিৎসার দ্বারা স্বাভাবিক পথে মুক্তি দিয়েছেন। এই অসুস্থ শিশুরা খেলার সাহায্যে তাদের মনের অনেক বিরোধ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে অবশেষে মানসিক যন্ত্রণা ও অশান্তি হতে মুক্ত হয়।

খেলার মাধ্যমে শিশুর কল্পনা নানাদিকে বিস্তারের পথ খুঁজে পায় এবং তার অহং বৃদ্ধির পরিতৃপ্তি ঘটে। এতে তার দেহ মন সুস্থ ও সবল হয়। ছোট ছেলেমেয়েরা সর্ব্বদা বড় হতে চায়। সে স্বপ্ন দেখে "বাবার

---

(১) " The child who actully is allowed less cake than he would like, may provide (in his play) an unlimited supply of make-believe cake." Educational Psychology. Gates and Jersild P. 206.

মত বড়" হওয়ার। বড়দের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা তাকে মুগ্ধ করে তাই সে বড়দের অনুকরণ করে থাকে, এমন কথাই বলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল। (২)

প্রসঙ্গক্রমে দুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। চার বৎসরের মিষ্টু একদিন পুতুলের চোখে মুখে বেশ করে সাবান ঘষে, গালে ঠাস্ করে একটি চড় মেরে বললো, "আবার কাঁদছো? চোখে জল দাও না, চোখ আর জলবে না।" দুই তিনবার একই খেলার পুনরাবৃত্তি দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মিষ্টু খুকুর চোখে সাবান দিচ্ছ কেন?" মিষ্টু বললো, "মা যে আমার চোখে সাবান দিয়েছে, আমি যে কত কেঁদেছি।"

একবার গ্রীষ্মের ছুটির পর লক্ষ্য করা গেল যে বিশ্বনাথ, পাঁচ বৎসর বয়স তার, একটি পুতুলকে বালি চাপা দিচ্ছে এবং আবার পুতুলটিকে বালি থেকে বের করে ঝেড়ে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নিচ্ছে। বারবার একই খেলা খেলতে দেখে মনে একটি আশঙ্কা হলো—বুঝি বা এই শিশুটি কোন প্রিয় বস্তু হারিয়েছে। শিশুর পিতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল যে ছুটির মধ্যে বিশ্বনাথের মা মারা গেছেন। বাড়ীতে অন্য কোন মহিলা না থাকায় সারাদিন তাকে তেলকলের পাশে বসিয়ে রাখা হয়। দোকান থেকে ছুটি হলে, পিতা তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যান।

ছয়মাস পরে আবার লক্ষ্য করা গেল যে, বিশ্বনাথ যখন তখন কাপড় জামা ভিজিয়ে ফেলে। একদিন খেলার সময়ে দেখা গেল যে সে কয়েকটি কাঠের টুকরো খাটের উপর শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, ঐ কাঠের টুকরোগুলি তখন তার ছেলেমেয়ে। কিছুক্ষণ পরে একটি কাঠের টুকরো উঠিয়ে খুব জোরে মাটিতে ঠুকে সে বললো, "দুষ্টু ছেলে আবার বিছানা ভিজিয়েছ।" কাপড়জামা বারবার নষ্ট হয়ে যায় বলে ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করলেন। জানা গেল যে শিশুটির মূত্রাশয় সুস্থ নয়। সেই সঙ্গে আরও জানা গেল যে তার পিতা আবার বিবাহ করেছেন। শিশুর আচরণে সহজেই বোঝা যেতো যে আদর-যত্নের অভাবে শারীরিক ও মানসিক নানা কষ্টে সে নিতান্তই অভিভূত হয়ে পড়ছে। পিতাকে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়াতে তিনি কিছুদিন পরে বিশ্বনাথকে তার পিসিমার কাছে পাঠিয়ে

(২) "Some psycho-analysts have tried to see a sexual symbolism in children's play. This, I am convinced is utter moonshine. The main instinctive urge of childhood is not sex, but the desire to become adult or perhaps more correctly the will to power." *Education.* Bertrand Russell. P. 98.

দেন এবং ক্রমে চিকিৎসার গুণে ও স্নেহ-যত্নে তার শরীর ও মনের প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। এইভাবে অনেক সময়ে বিচক্ষণ ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুর খেলার মাধ্যমেই তার সুকুমার মনটির পরিচয় পান এবং প্রয়োজনানুসারে তাকে জীবনপথে নির্দ্দেশ দিতে পারেন।

মনের গহনে কোথায় কোন্ অস্বস্তি বা সমস্যা লুকিয়ে আছে কেবল তার সংবাদ নেওয়া নার্সারী স্কুলের একমাত্র কাজ নয়। যাতে নিজস্ব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে শিশুর সুসঙ্গত ও সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটে এর জন্যও নার্সারী স্কুলে প্রকৃষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যায়। নিজের পরিবেশের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়ার পূর্ব্বেই শিশু-মন পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, এমনতর বৈষম্য প্রায়ই দেখা যায়। যাতে এইরূপ বৈষম্য না ঘটে, তার জন্য প্রতিদিন শিশু তার পরিবেশের মধ্যে যা দেখে, সেই সকলের উপরেই শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলার দায়িত্ব হলো শিশু-শিক্ষায়তনের। একটি উদাহরণ দিই, আমাদের শিশুনিকেতনের চারিপাশে প্রচুর উন্মুক্ত স্থান আছে। এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশে শিশুরা প্রত্যহই গাছ, পাতা, ফুল, ফল, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সংগ্রহ করে সে সকল সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করে। একদিন সকালবেলায় বাগানে খেলতে খেলতে শিশুরা লক্ষ্য করলো যে কার্পাস গাছে ফল ফেটে সাদা তুলো বার হয়ে আছে। তারা দৌড়ে গিয়ে দিদিমণিকে ডেকে আনলো, সঙ্গে সঙ্গে আরও দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে দৌড়ে এলো। পার্থ ও সুরঞ্জন বললো, "দিদিমণি আমরা অনেকদিন আগে রেণুদিদির সঙ্গে তুলোর বীচি পুঁতেছিলাম। কি মজা, কত তুলো হয়েছে।" এইখানে বলা ভালো যে রেণুদিদি আমাদের এখানে একজন শিক্ষণাধীন ছাত্রী ছিলেন। তাঁর শিক্ষণকালে একটি শিশু প্রশ্ন করে, "দিদিমণি কি করে কাপড় হয়?" তখন তুলো হতে কিভাবে কাপড় তৈরী করা হয় তারই একটি পরিকল্পনা রচনা করে রেণুদিদি শিশুদের বস্ত্র-প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে পাঠ দেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে বীজ-পোঁতাও ছিল একটি অন্যতম কাজ।

আগ্রহভরা উৎসুক কণ্ঠে ছেলেমেয়েরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো, "দিদিমণি এই তুলো নিয়ে কি হবে?" "আমরা কি কাপড় বুনবো?" "যা! বোকা, আমরা কি কাপড় বুনতে পারি?" "দিদিমণি, কারা কাপড় বোনে?" সেইদিনই তুলো সংগ্রহ করে প্রত্যেক শিশুর হাতে কিছু কিছু দেওয়া হলো এবং বীজ ছাড়িয়ে, কেবলমাত্র হাতে করে গুটিয়ে দেখানো হলো যে খুব সরু করে তুলো পাকাতে পারলে সূতো তৈরী হয় এবং সেই সূতো তাঁতে বুনে কাপড় প্রস্তুত হয়। পরদিন তক্‌লি ও চরখা ব্যবহার করে সূতো কাটার

প্রকৃত উপায়টিও তাদের দেখানো হয়। তারপরে একটি পিঁড়ির উল্টো দিকে খুব কাছে কাছে পেরেক ঠুকে সহজ বুননের উপযোগী একটা যন্ত্র প্রস্তুত করা হলো। এই ছোটো তাঁতটীর উপরে প্রথমে রঙীন কাপড়ের ফালি দিয়ে, পরে তিন রঙের সুতো দিয়ে শিশুরা জাতীয় পতাকা বোনে। এর পরে একদিন বাজারে বেড়াতে গিয়ে তাঁতী কি করে কাপড় বোনে, টানা পোড়েন কাকে বলে, সচরাচর কত বড় ও লম্বা কাপড় বোনা হয়, দোকানে কি ভাবে কাপড় জামা সাজিয়ে রাখে তাও তারা দেখে আসে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমাদের বাগানে শিমূল গাছে ফুল ফুটতে সুরু করে। যথাক্রমে লাল শিমূল ফুল সংগ্রহ করা হলো। প্রকৃতি পাঠের জন্য কাগজ কেটে পঞ্জিকা প্রস্তুত করে শিশুদের লিখন পঠন চললো এগিয়ে। পঞ্জিকাতে লেখা হলো কবে শিশুরা প্রথম শিমূল ফুলের কুঁড়ি দেখেছে, কবে ফুল ফুটেছে, কবে ফল ধরেছে, তারপরে কোন্ দিন ফল ফেটে তুলো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের চারিধারে। শিমূল তুলো সংগ্রহ করে কার্পাস তুলোর পাশে রাখা হলো—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তাই বা কি, এসব বেশ ভালো করে আলোচনা করা গেল শিশুদের সঙ্গে। তারপরে আমরা সকলে মিলে একটি পরিকল্পনা করে—কার্পাস তুলো দিয়ে তৈরী করলাম কতকগুলি লেপ আর শিমূল তুলো দিয়ে তৈরী করলাম বালিশ, গদি ইত্যাদি। এইভাবে পুতুলদের বাৎসরিক শয্যা-সম্ভার প্রস্তুত করে শিশুরা প্রচুর আনন্দ পেলো।

একবার বর্ষার সময়ে দেখা গেল যে লিলিফুল গাছের গোড়ায় নরম, সুন্দর রেশমী গুটিপোকা ঘুমিয়ে আছে। এতদিন শিশুরা জানতো যে গুটিপোকা গাছের পাতা খেয়ে গাছ নষ্ট করে দেয়। আমি একদিন তাদের বললাম যে, "ছেলেবেলায় আমরা কাগজের বাক্সে গুটিপোকা বন্ধ করে রাখতাম। প্রত্যেক দিন তাদের লিলি গাছের পাতা খেতে দিতাম, ময়লা পরিষ্কার করে কিছুক্ষণ রোদে রাখতাম। তারপর একদিন পোকাগুলি গুটি বেঁধে ঘুমিয়ে পড়তো। তখন তারা আর খাওয়া দাওয়া করতো না। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গুটিগুলি প্রজাপতি হয়ে উড়ে যেতো।" এই বলে পাতাগুলি উল্টিয়ে দেখলাম যে তখনও পাতার নীচে কিছু কিছু সাদা ডিম লেগে আছে আর গাছের গোড়ায় গোড়ায় আছে অসংখ্য রেশমী গুটিপোকা। আমার ছেলেবেলার কাহিনী শুনেই কমল বললো, "দিদিমণি আমরাও প্রজাপতি করবো।" আবার আর একটি প্রকৃতিপাঠের নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত হলো। শিক্ষিকার সাহায্যে শিশুরা নিজেদের খাতায় দৈনিক বর্ণনা

লিখতে সুরু করলো। এই সমস্ত পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করতে আমাদের মোট আঠারো দিন লেগেছিল। এরই উপরে ভিত্তি করে লেখাপড়া, দিনপঞ্জীর পাতা বদলানো, চিত্রাঙ্কন, কথোপকথন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করা হলো। মহা উৎসাহ ও সমারোহের সঙ্গে প্রজাপতিগুলিকে বাগানে মুক্তি দিয়ে এই পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি, এই তত্ত্বটি শিশুর মনে অপরিমেয় বিস্ময় ও অসংখ্য প্রশ্ন জাগায়। প্রজাপতি আমাদের জীবনে কোন্ কাজে লাগে এই তথ্যটি শিশুকে জানিয়ে দিলে সে তার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে শিখবে। শিশুর জিজ্ঞাসার অন্ত নাই, এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য চাই সন্ধানী দৃষ্টি ও সহানুভূতিশীল হৃদয়। বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে তবেই শিশুর কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু মনটিকে তৃপ্ত করা যায়, সেইজন্য শিশুশিক্ষার কাজে চাই গভীর সংবেদনশীল মন ও নিরলস সাধনা।

বিকাশধর্ম্মী জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি যাতে নিপুণ হয়ে ওঠে, এর জন্য চর্চ্চার আবশ্যক। কেননা, বহির্জগৎ হতে জ্ঞান গ্রহণ করেই আমাদের জীবন গড়ে ওঠে, এবং এই জ্ঞান আমরা গ্রহণ করি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে। কাজেই ইন্দ্রিয়গুলির গ্রহণশক্তি ও ধারণশক্তি যতই সবল হবে বহির্জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা ততই সহজ হয়ে উঠবে। একথা সত্য যে, প্রত্যেক সুস্থ শিশু দেখতেও পায়, শুনতেও পায়। সে অনুভবও করে, অনুভূতির ফলে কাজও করে কিন্তু শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত দেখা, শোনা, অনুভূতি ও কাজের মধ্যে একটি নিগূঢ় অর্থ খুঁজে পেলে তবেই তার অনুভূতি ও কাজ হয়ে ওঠে আরও সত্য, আরও সরস। অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জীবন বিকাশের মূলে আছে শিক্ষা এবং শিক্ষার মূলে আছে ইন্দ্রিয়বোধ চর্চ্চা। প্রকৃত শিক্ষার এইটিই হলো গোড়ার কথা।

শিশুশিক্ষায়তনে এই বিষয়টি মনে রেখে শিশুর জীবনধারাকে পরিচালিত করা উচিত। সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু চায় কাজ। এই কাজের দ্বারাই ইন্দ্রিয়বোধ চর্চ্চা সার্থক হয়। আমরা যে কোন আখ্যাই দিই না কেন, শিশু তার খেলা বা কাজ থেকে কোনমতেই নিরস্ত হবে না। তাহলে শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে তার খেলাকেই কেন্দ্র করে শিক্ষা দিতে হবে। এই নূতন ধরনের শিক্ষার জন্য চাই নূতন রকমের সাজ সরঞ্জাম। বস্তু সম্পর্কে শিশুর কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না এবং কল্পনার চক্ষে সহসা কোন বিমূর্ত্ত বস্তুর ছবিও সে এঁকে নিতে পারে না, কাজেই তাকে শিক্ষা দিতে হলে

তার প্রত্যেক কাজটি তার কাছে যেন প্রকৃত হয়ে ওঠে তারই চেষ্টা করতে হবে। অবাধ খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুচিত্ত কিভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং এইরূপ খেলাধূলার জন্য কি কি উপকরণ প্রয়োজনীয় ও সহজলভ্য, তা আমার "সমাজ ও শিশুশিক্ষা" গ্রন্থে বিশদরূপে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচনার বিষয় হলো এই যে কি ভাবে শিশুকে শিক্ষাসম্ভাবনায়-পূর্ণ খেলাধূলাতে আকৃষ্ট করা যায়, যাতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের আলোকে তার মনটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

একদিন লক্ষ্য করা গেল যে, কাপড়ের পুতুলগুলি বড় ময়লা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মাসে নূতন খেলনা কিনে দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নাই। সেইজন্য শিক্ষিকাগণ পরামর্শ করে বাড়ী থেকে কিছু নূতন ও কিছু পুরাতন কাপড়ের টুক্‌রা সংগ্রহ করে আনলেন। তারপর এক শুক্রবারের সকাল বেলায় সব পুতুলগুলির ছেঁড়া কাপড় জামা খুলে ফেলে সেগুলিকে পুতুলের বাড়ীর দোতালায় শুইয়ে রাখা হলো। মঞ্জু খেলতে এসে বললো, "এমা কি বিচ্ছিরি—এদের একটাও জামা কাপড় নেই।" শিক্ষিকা যে প্রয়োজনবোধ (motivation) জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা সার্থক হলো। মঞ্জুর কথা শুনে অনেক ছেলেমেয়ে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এলো এবং পুতুলদের দুরবস্থা দেখে তারাও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো। তখন শিক্ষিকা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে কথাবার্ত্তা স্থরু হলো।

চাঁদ—"ইস্ পুতুলটা কি ময়লা।"

দিদিমণি—"কি করলে পরিষ্কার হবে বলো তো?"

হেনা—"চান করালে।"

মঞ্জু—"দিদিমণি চান করাবো?"

অনিল—"কমল আর আমি জল আনবো দিদিমণি?"

দিদিমণি—"চল কলতলায় গিয়ে স্নান করাই।

ছেলেমেয়েরা পুতুল ক'টি তুলে নিল। তারপরে টবে জল ভরা হলো, সাবান এলো, তোয়ালে এলো, সবাই মিলে পুতুল ও তাদের জামা কাপড়গুলিকে ঘসে, মেজে, আছড়ে পরিষ্কার করে তুললো।

স্নানের সময়েও অবিশ্রান্ত ভাবে কথাবার্ত্তা চলছে—

"কানের পাশে ধোও।"

"আঙ্গুলগুলো কি নোংরা।"

"এমা! পেটটা চুপসে গেছে।"

"গলাটা নড়ছে।"

"ওমা! রং উঠে গেল।"

দিদিমণি পা ছুটো পরিষ্কার করতে পারছি না।"

"দিদিমণি দাঁত মেজে দেবো?"

হো হো করে হাসে শিবানী,—"দাঁত কই যে মাজবে?"

"দিদিমণি এবার কি নিয়ে খেলবো, সব যে ভিজে গেল?"

এ সব কথাবার্ত্তা থেকে শিশুকে কত কি যে শেখানো যায় শিশুঅনুরাগী মাত্রেই সে কথা জানেন। পুতুলটিকে স্নান করাতে গিয়ে স্নানের মূল্য কি এবং কি ভাবে স্নান করতে হয়, এভাবে শিশুর সম্যক জ্ঞানলাভ হয়। তুলোয় ভরা পুতুল জলে পড়লে চুপসে যাবে, কাঁচা রং উঠে যাবে—পাকা রং ওঠে না, এ সম্বন্ধেও আলোচনা করা যায়। আত্মকেন্দ্রিক শিশু সব শেষে বলে উঠলো, "এবার কি নিয়ে খেলবো, সব যে ভিজে গেল।" শিক্ষিকা তৎক্ষণাৎ বললেন, "আজ কি বার?"

জবাব এলো—"আজ শুক্রবার।"

"কাল কি বার?"

"কাল শনিবার।"

"তার পর দিন?"

"তারপর দিন রবিবার।"

"কবে আবার স্কুলে আসবে?"

"সোমবারে।"

"তাহলে শনি, রবি তো ছুটি থাকবে, অমিয়দাদাকে (পরিচারক) বল, পুতুলগুলি রোদে দিয়ে শুকিয়ে রাখতে—কাপড় জামাগুলি তোমরাই দড়িতে টাঙ্গিয়ে দাও।" "অমিয়দাদা" যে কেবলমাত্র শিক্ষায়তনের পরিচারক নয়, সে যে তাদের আমোদ প্রমোদের বহু ব্যবস্থা করে এবং তার উপরে নির্ভর করলে যে সোমবারে শুষ্ক পরিষ্কার পুতুলগুলি পাওয়া যাবে এ শিক্ষাও তাদের দেওয়া হলো। সমস্ত জীবনের মধ্যে শিশুর নিজের স্থানটি কোথায়, কতখানি কাজ সে নিজে করতে পারে, কখন তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়—নিজের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সকল মনুষ্যের সহিত তার সম্বন্ধটি কি—শিশু শিক্ষায়তনে এই সহজ সত্যটি ফুটিয়ে তোলা আমাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

সোমবার-দিন যথাসময়ে শিশুরা পরিপূর্ণ আগ্রহে পুতুলগুলির খোঁজ করলো। অমিয়দাদা পুতুলগুলি এনে দেখাতে তাদের মুখে যে খুব বেশী উৎসাহ দেখা দিল তা নয়। পুতুলের মুখের রং উঠে গেছে, পরণে জামা

কাপড় নাই, হাত পাগুলি শুকিয়ে চুপসে গেছে কেমন যেন সব বিশ্রী। "দিদিমণি আমরা কি নিয়ে খেলবো—সব যে বিচ্ছিরি হয়ে গেছে?" তখন দিদিমণির সঙ্গে আবার কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা স্বরু হলো—কি করলে পুতুলগুলিকে আবার শিশুসমাজে বার করা যায়। পুতুলের শাড়ী চাই, জামা চাই, চোখ আঁকা চাই, চুলগুলি নিয়ে নূতন করে বেণী বাঁধা চাই—আরও কত কি। সংগৃহীত ছিট, রেশম ও পশমের টুকরো আনা হলো এবং সেই থেকেই আমাদের শিশু শিক্ষায়তনে সীবনশিক্ষার ব্যবস্থা হলো। কাপড়ের টুক্‌রো মাপা, কাটা, সহজ সেলাই থেকে স্বরু করে পশম বোনা পর্য্যন্ত কাজ এইভাবে এগিয়ে চলেছে। এই "পুতুল খেলার" আগ্রহটিকে ঘিরে শিশুজীবনের নানা দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে আমাদের সম্মুখে—কোন্ শিশুর কোথায় ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ লুকিয়ে আছে, কে বহু আদর যত্নে মানুষ হচ্ছে—এ সবেরই সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে।

এই সকল খেলাধূলার সাহায্যে শিক্ষিকা সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখেন যে কি উপায়ে, কোন্ প্রণালীতে শিশুকে ক্রমে ক্রমে লেখা পড়া ও কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই শিক্ষাদান প্রণালীকে নিতান্তই সামান্য বলে মনে হতে পারে বটে কিন্তু কাজটি যত সহজ বলে মনে করা হয় এমন সহজ নয়। পুতুলের জামা কাপড় সেলাইকে ভিত্তি করে আমরা কয়েকটি ছয় বৎসরের শিশুকে নিজেদের জন্য ছোট ছোট পশমের জামা বুনতে উৎসাহ দিই। যতদূর সম্ভব সহজ নমুনা সংগ্রহ করে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতিতে শিশুরা বুনতে থাকে তাদের জামা। প্রত্যেক শিশু যাতে শিক্ষিকার সামান্যতম সাহায্যে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও ক্ষমতায় সীবনশিক্ষা করতে পারে এই ছিল আমাদের লক্ষ্য। ফলে বহুক্ষেত্রে যে সেলাই-এর সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় নি একথা বলাই বাহুল্য। এতে আমাদের কোন ক্ষোভ ছিল না, কেননা পাঁচ, ছয় বৎসরের বালক বালিকার পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটি জামা প্রস্তত করতে পারাই তো পরিপূর্ণ সাফল্যের কথা। একদিন শিশুরা সগর্ব্বে নিজের নিজের জামা হাতে করে বাড়ী গেল, মা বাবাকে দেখাবে বলে। পরদিন উজ্জ্বলা স্কুলে এসেছে—মুখটি তার বড় বিষণ্ণ। "কি উজ্জ্বলা মা কি বল্লেন? মায়ের জামা পছন্দ হয়েছে?" উজ্জ্বলার চোখ দুটিতে জল টল্ টল্ করছে, "মা বলেছেন—এ কেমন জামা বুনেছিস্? ফোঁড়গুলো ঠিক নেই?" আমাদের আকাশচুম্বী গর্ব্ব তৈলহীন প্রদীপের মত দপ্ করে নিভে গেল। কি করে বোঝাই এর ব্যর্থতা—কি আপ্রাণ পরিশ্রম করে এই শিশুটি তার হাতের তৈরী প্রথম

জামাটি তুলে ধরেছিল জননীর সামনে পরম আগ্রহে, একান্ত বিশ্বাসে? কোথায় এর সান্ত্বনা? উজ্জ্বলার হয়তো মনে হলো, "দিদিমণিরা তাহলে তাকে ঠিক জিনিষটি শেখান নি, নতুবা তার মা কেন তার কাজ অগ্রাহ্য করবেন?" শিশুদের মনে আমরা নিরন্তর এই দ্বন্দ্ব দেখতে পাই।

প্রতি শুক্রবারে আমাদের একটি আসর হয়—সারা সপ্তাহে যে গান, ছড়া বা কবিতা শিশুরা শিখেছে সেগুলি আবৃত্তি বা অভিনয় করে তারা পরস্পরের মনোরঞ্জন করে এই আসরে। একদল শিশু অভিনয় করে, অন্যেরা স্থির হয়ে বসে শোনে, পরে সপ্রশংস তালি দিয়ে গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করে। সচরাচর এই সকলের আয়োজনে শুক্রবারের সকাল বেলাটি অতিবাহিত হয়, ফলে বড়দের লেখা বা অঙ্ক কষা হয় না। বাড়ী যাওয়ার সময়ে প্রায়ই শোনা যায়—"আজ লেখাপড়া কিচ্ছু হলো না।" প্রথমে ভাবতাম বুঝি বা ছেলেমেয়েরা এত বেশী লেখাপড়া করতে ভালবাসে যে একদিনও তার ব্যতিক্রম হলে তাদের কষ্ট হয়। পরে নানা কথাবার্ত্তায় জানা গেল যে বাড়ী গেলে পরেই মা জিজ্ঞাসা করেন, "আজ কি শিখেছ, কি পড়েছ?" শিশু ঠিকমত কোন জবাব দিতে পারে না। তৎক্ষণাৎ শিশুকে মা বলেন, "স্কুলে কেনই বা যাওয়া, কেবলই তো খেলা"—শ্রান্ত, ক্লান্ত শিশুকে তখনই শ্লেট নিয়ে "অ, আ" লিখতে বসতে হয় কেননা সেই সময়েই তো জননীর যা কিছু অবসর। দেখে শুনে মনে হয় আমাদের হাতে যেন কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি শিশুকে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক গলাধঃকরণ করিয়ে পরীক্ষায় পাশ করানোই হলো আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই শিশুকাল হতে ঊর্দ্ধশ্বাসে, দ্রুতবেগে, দক্ষিণে, বামে দৃক্‌পাত না করে পড়া মুখস্থ করা ছাড়া আর কোন কিছুরই অবকাশ আমাদের শিশুরা পায় না।

আমাদের নূতন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে গুণগ্রাহী পিতামাতার সংস্পর্শেও যে আমরা আসিনি একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। বিতানের যখন ছয় বৎসর পূর্ণ হলো তখন তার মা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাকে স্কুল থেকে নিয়ে গেলেন। কোন্ গতানুগতিক শিক্ষাপ্রণালীর যাঁতাকলে শিশুর সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলি পিষ্ট হবে, সেই দুঃখময় পরিণাম থেকে শিশুকে কি করে রক্ষা করা যায় এসম্বন্ধে বহু জনক জননীকে ব্যস্ত হতে দেখেছি। অমিতাভ এসেছে আমাদের কাছে আড়াই বৎসর বয়সে—এখন তার পাঁচ বৎসর বয়স। পরম আগ্রহে তাঁর পিতা বল্লেন, "এবার ছোটটিকেও দেবো—বড়টি এমন চালাক চতুর হয়েছে—বেশ হয়েছে।" যে সকল পিতামাতা এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেন—লক্ষ্য করে দেখেছি যে যানবাহনের অসুবিধা সত্ত্বেও ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র উপেক্ষা করে নিয়মিতভাবে
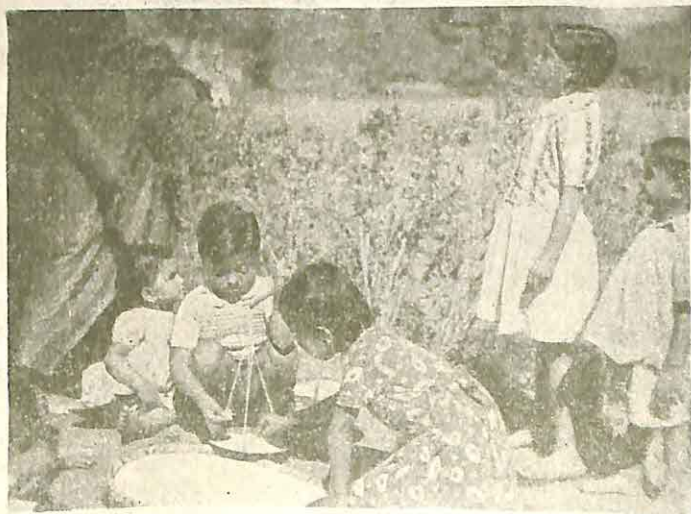
বনভোজন
বাগান থেকে টোমাটো তুলছে
চাল ডাল মাপছে
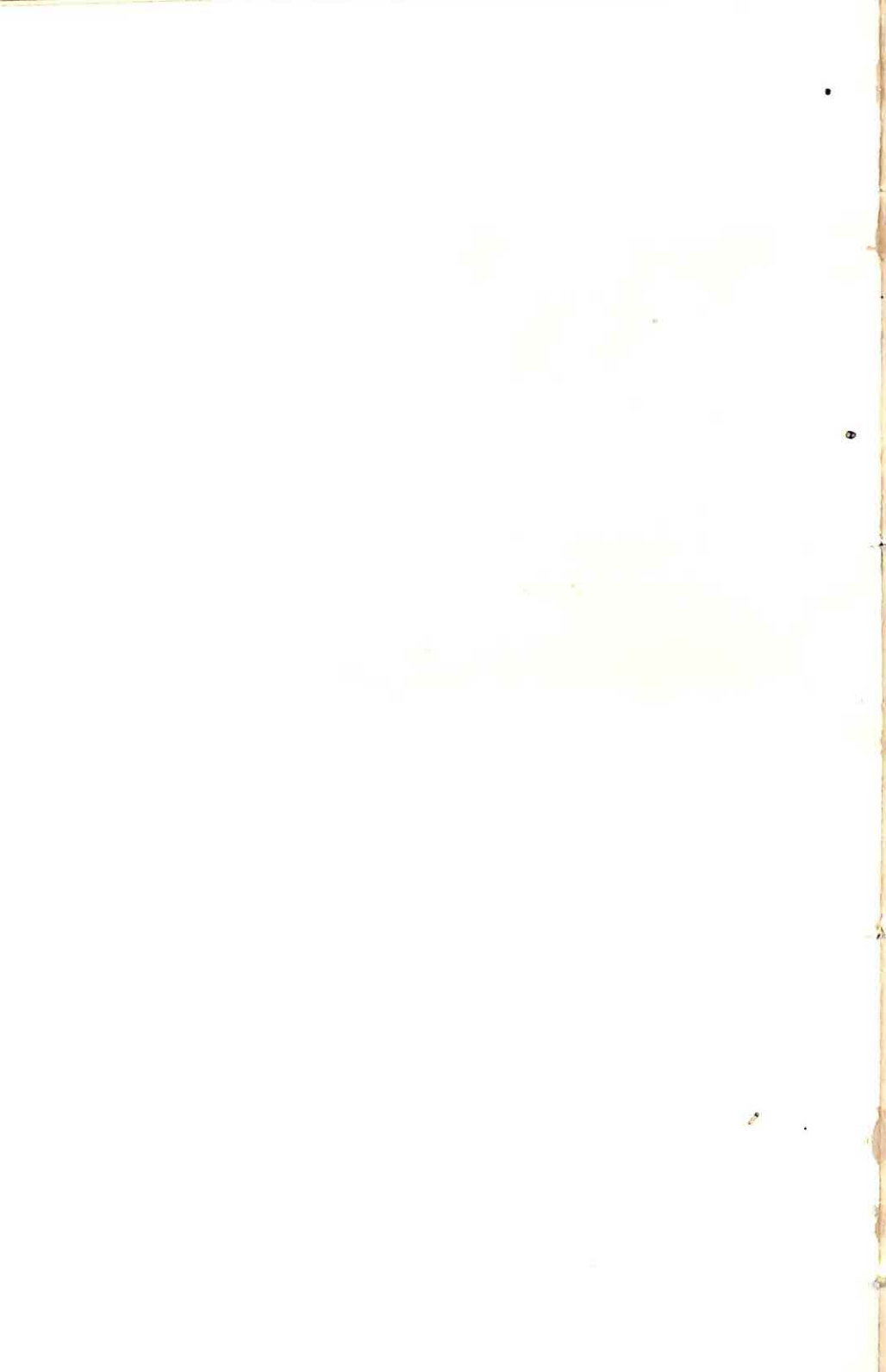
সন্তানকে শিক্ষায়তনে পৌঁছে দিয়ে যান। পিতামাতার এই সহযোগিতায় এবং শিশুদের সজীব কর্ম্মতৎপরতায় ও চিত্তস্ফূর্তি লক্ষ্য করে মন আশায় ভরে ওঠে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপক চর্চ্চাকে আমরা দীর্ঘকাল অস্বীকার করেছি। জড় জগতের উপর অধিকারলাভ করাই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য এবং অধিকৃত জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করা হলো বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আজ বিজ্ঞান শিক্ষাকে গ্রহণ করতেই হবে একথা আমরা বুঝেছি এবং সেইজন্য হাত পাততে হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির কাছে। প্রগতিশীল জগতে বিজ্ঞানের যে প্রবল আধিপত্য—তাকে অস্বীকার করলে বস্তুজগতের উপরে আমাদের কোনমতে অধিকার জন্মাবে না এবং পদে পদে আমরা পিছিয়ে পড়বো বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে—একথা তো আজ স্বীকার না করে উপায় নাই। গুরুদেব আক্ষেপ করে বলে গেছেন, "বাইরে বিশ্বে সকলদিকেই মার খেয়ে মরছে ভারতবাসী, তারা কৃতিত্ব পেলো না।" একথা যেন সত্য না হয়ে ওঠে, আজ শিক্ষাবিদ মাত্রেরই তা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল যে বিজ্ঞান শিক্ষা অতি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে বিষয়টি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আজ আমরা দেখছি যে কত সহজে শিশু-শিক্ষায়তন থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে উঠতে পারে। শিশুশিক্ষার উপকরণের মধ্যে উদ্যান হলো একটি প্রধান উপাদান। উদ্যানের মধ্যে কত যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নাই। বড় ছেলেমেয়েদের সকলেরই একখণ্ড করে নিজস্ব জমি আছে—এটি হলো শিশুর ব্যক্তিগত পরীক্ষার ক্ষেত্র। বীজ হতে ফুল, ফুল হতে ফল—এই যে জীবনের পরিণতি—বাগানের কাজে এ শিক্ষা যত সহজে দেওয়া যায় এমন আর কোন ক্ষেত্রেই হয় না। প্রতি ঋতুতে শিশুদের হাতে দেওয়া হয় উপযুক্ত ফুলের ও সবজীর বীজ। তারা জমি তৈরী করে, বীজ বুনে জল ছিটিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকে প্রথম নবীন অঙ্কুরটির জন্য। দুদিন পরে দেখা গেল সুভাষ মাটি খুঁড়ে দেখছে, গাছ কতদূর বড় হলো। "এতদিন হয়ে গেল এখনও কেন গাছ বের হলো না দিদিমণি?" এমন প্রশ্ন শিশু প্রায়ই করে থাকে। তার সময়ের জ্ঞান বড়ই অল্প, দুদিন তো অনেক সময়, এতদিনে তো গাছ বার হওয়া উচিত! কখনও বা চারা গাছ পুঁততে দেওয়া হয়, কোন শিশু খেলতে খেলতে চারার কথা ভুলেই যায়, হঠাৎ মনে পড়তে দৌড়ে এসে দেখে তার চারা ক'টি শুকিয়ে গেছে, তখন তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। কেউ বা উৎসাহের আতিশয্যে এমনই জল ঢালে যে কখনও বীজ যায় পচে, কখনও বা

চারা যায় মরে। এইভাবে নানা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরে শিশুরা শেখে যে গাছের বৃদ্ধির জন্য চাই উপযুক্ত মাটি, আলো, বাতাস, জল, উত্তাপ ইত্যাদি। একদিন তারা লক্ষ্য করলো যে, ফুলের টবের নীচে চাপা পড়ে ঘাসের রং হয়েছে পিঙ্গল। আর একদিন তারা দেখলো যে দিদিমণির ঘরের ভিতরে যে লতাগাছটি টবে বড় হয়েছে, সেটি মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বার হয়েছে। লতাটিকে ঘুরিয়ে পশ্চিম মুখে রাখা হলো, আবার তুদিন পরে লতাটি ঘুরে গেছে, কি আশ্চর্য্য! মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া যায় কেঁচো, গুব্‌রে পোকা, উইএর ঢিপি, পিঁপড়ের গর্ত্ত, ইঁদুরের বাসা আরও কতকি! ক্রমে যেমন কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে এগিয়ে চলে, তেমনি ধাপে ধাপে শিশুদেরও প্রকৃতিপাঠ চলে এগিয়ে।

এ বৎসর অনেক ভুট্টা লাগানো হয়েছিল আমাদের বাগানে। টিয়া, শালিখ, কাঠবেড়ালী, পিঁপড়ে ও বাঁদরের হাত থেকে রক্ষা করে শিশুদের মাঝে মাঝে ভুট্টা সিদ্ধ করে খেতে দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রে অন্যান্য প্রাণী কি ভাবে জীবন ধারণ করে, গাছের শত্রু কারা এ সম্বন্ধেও শিশুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হয়। তারপরে বাগানে হলো টমাটো, পালংশাক, বেগুন—এইবার বনভোজন হবে। সুরু হলো কাজের পালা—কি খাওয়া হবে, চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা কোথায় পাওয়া যাবে—মার কাছে চাইবে কিনা—শিশুদের কলগুঞ্জনে শ্রেণীকক্ষ মুখরিত হয়ে রইলো তুই সপ্তাহ।

এই বনভোজন উৎসবটিকে কেন্দ্র করে কি ভাবে আমাদের "পুস্তকহীন শিক্ষা" অগ্রসর হয়েছিল তারই একটি ব্যাপক বর্ণনা দিতে চাই। প্রথমে সিদ্ধান্ত হলো যে বড়দলের ছেলেমেয়েরা চিঠি লিখবে শিক্ষায়তনের প্রত্যেক শিশুর জননীকে—তাতে কি লেখা হবে তাও শিশুরাই স্থির করলো। একটি চিঠির নমুনা দিই ঃ—

মা,

১৬ই মাঘ আমরা চড়ুইভাতি করবো। মা আমাদের চাল, ডাল আর পয়সা দিও। চাল আর ডাল দিয়ে খিচুড়ী হবে। পয়সা দিয়ে মিষ্টি, ঘি, লবণ, মশলা কিনবো।

হেনা

এই সঙ্গে ছেলেমেয়েরা আমাদেরও একটি চিঠি দিল ঃ—

দিদিমণিরা,

আমাদের ইস্কুলে চড়ুইভাত হবে। এইজন্যে চাঁদা দেবেন।

ম্যানেজার—বাবুয়া, অনিল।

বনভোজন

সবজী কাটছে
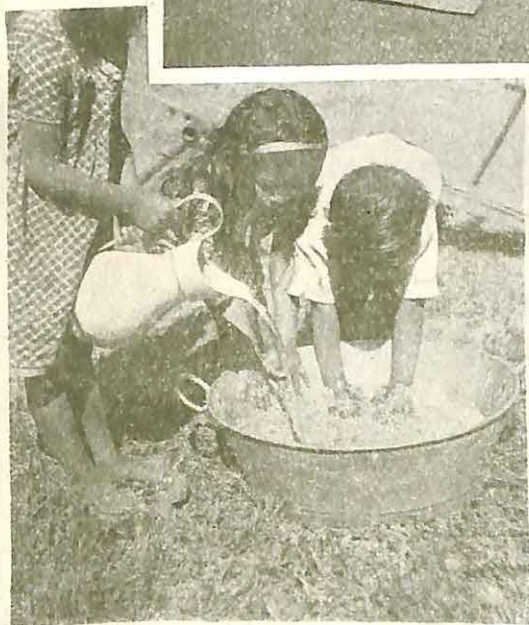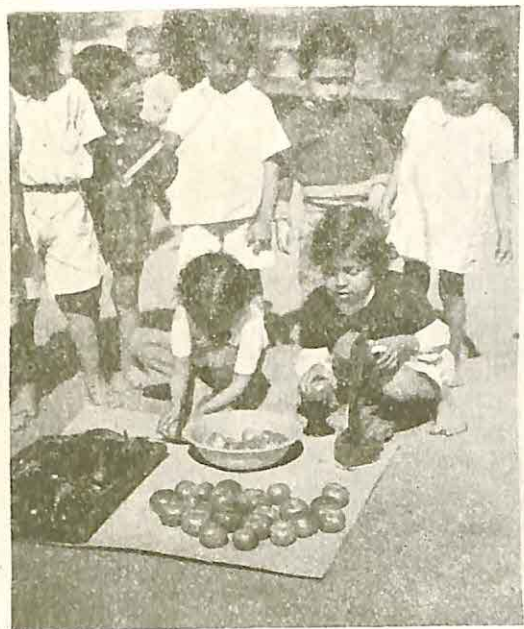
চাল ধুচ্ছে

এইবার শিশুরা দলে দলে ঠোঙ্গায় করে, পুঁটলিতে বেঁধে, থলিতে ভরে চাল, ডাল আনতে লাগলো। আগেকার দিনে শিক্ষিকা এগুলি নিজে গুছিয়ে তুলে রাখতেন। আমরা কিন্তু শিশুদের হাতেই সব জিনিষ দিলাম। প্রত্যেকদিন যত চাঁদা ওঠে, যত চাল ডাল আসে তার হিসাব রাখতে ভার দিলাম বড়দলের ছেলেমেয়েদের উপরে। তারা আমাদের সাহায্যে প্রত্যহ বোর্ডে এইরূপ সংবাদ লিখে বিজ্ঞপ্তি দিত :—

সোমবার—

চাল—২ পোয়া
ডাল—৩ পোয়া

৫ পোয়া বা ১ সের ১ পোয়া—

	টাকা	আনা
শ্যামলী	—	২
প্রদীপ	—	৪
দিদিমণি	১	০
	১ —	৬ আনা

তারপরে যখন বনভোজনের দিন আগতপ্রায় আবার ছেলেমেয়েরা বোর্ডে লিখে দিল :—

শোন, শুক্রবারে চড়ুইভাতি হবে। টিফিন আনবে না।

মঞ্জু

আমাদের খিচুড়ী, তরকারী, ভাজা, টক রান্না হবে, মিষ্টিও হবে।

সবিতা

এবারে বাগানে গিয়ে টমাটো, পালংশাক ও বেগুন তোলা হলো। ঘরে এসে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে দেখা গেল যে টমাটো উঠেছে ৩ সের ২ পোয়া ১ ছটাক, পালংশাক উঠেছে ২ সের ১ পোয়া আর বেগুন উঠেছে ২ সের ১½ ছটাক।

এইভাবে সমস্ত চাল, ডাল, সবজী, টাকা, পয়সা মাপা ও গোণা হলো। এইবারে চাই বাসনপত্র, পাতা, গেলাস, আসন, লবণ, তেল, ঘি, মশলা। তারও হিসাব রাখা হলো :—

কমল ও অনিলের উপরে ভার পড়লো বাসনপত্র রাখার, তারা লিখলো :—

অমিয় দাদা দিয়েছে—বঁটি—২ টা
খুন্তি—১ টা
দিদিমণি—ডেক্‌চি—২ টা
কড়া—১ টা

---

৬ টা

উমা ও শিবানীর হাতে ভার দেওয়া হলো পাতা ও গেলাস ধুয়ে গোছ করে রাখবার জন্য। তারা দুজনে দিদিমণি ও পরিচারকের সাহায্যে কাজটি সুসম্পন্ন করলো এবং খাওয়ার আগে গীতা, মঞ্জিমা, গোপা ও সমীর পাতা এবং আসনের ব্যবস্থা করলো। আলপনা দেওয়া, পানসাজা, তরকারী কোটা, ধোওয়া, রান্না ও পরিবেশনে যথাসাধ্য সাহায্য করে শিশুরা উৎসবটিকে আনন্দ মুখরিত ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুললো।

এখন এই উৎসবটিকে উপলক্ষ্য করে শিশুরা কি শিখলো—এটিই হলো আমাদের বিবেচনার বিষয়। আমরা জানি যে উৎসবের মূল কথাটি ব্যবহারিক নয়। উৎসব মানুষকে তার প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবন থেকে মুক্তি দেয়, তার জীবনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। উৎসবের দিনে আমরা সকল সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়ে সকলের জন্য আমাদের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিই। এরই সাহায্যে আমরা শিশুদের যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক শিক্ষা দিয়ে থাকি তা কত সহজেই তারা উপলব্ধি করতে পারে। স্বচ্ছন্দ, আনন্দময় পরিবেশে, বিবিধ কাজকর্ম্ম ও কলাকৌশলের মাধ্যমে তারা হয়ে ওঠে নিয়মনিষ্ঠ, তাদের মধ্যে আসে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ, তারা আরও শেখে যে যৌথভাবে দায়িত্ব গ্রহণ না করলে অনেক কাজই সুসম্পন্ন হতে পারে না।

উৎসবের মাধ্যমে লেখাপড়া এবং গণনা শিক্ষাও আমাদের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল। সে বিষয়েও এখানে আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে যে শিশুর মধ্যে প্রয়োজনবোধ না জাগলে কেন তাকে লেখা, পড়া বা অঙ্ক শেখানো হবে? এই বনভোজনের উপলক্ষ্যে অতি সহজেই সেই প্রয়োজনবোধটি জাগ্রত করা যায়। প্রত্যেকটি জিনিষ মেপে গুণে রাখার প্রয়োজন, জননীকে বা দিদিমণিদের চিঠি লিখে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা—এ সকল যেমন মজার খেলা তেমনি শিক্ষাপ্রদ। কত জিনিষ সংগ্রহ করা গেল, সংগৃহীত অর্থ হতে কি কি দ্রব্য কেনা হলো—এতো প্রত্যেক শিশুরই নিত্যকার অভিজ্ঞতা। মাস পয়লাতে জননীর ভাণ্ডারে যে সকল জিনিষ তিনি গুছিয়ে রাখেন, সেগুলি কোন্ শিশু
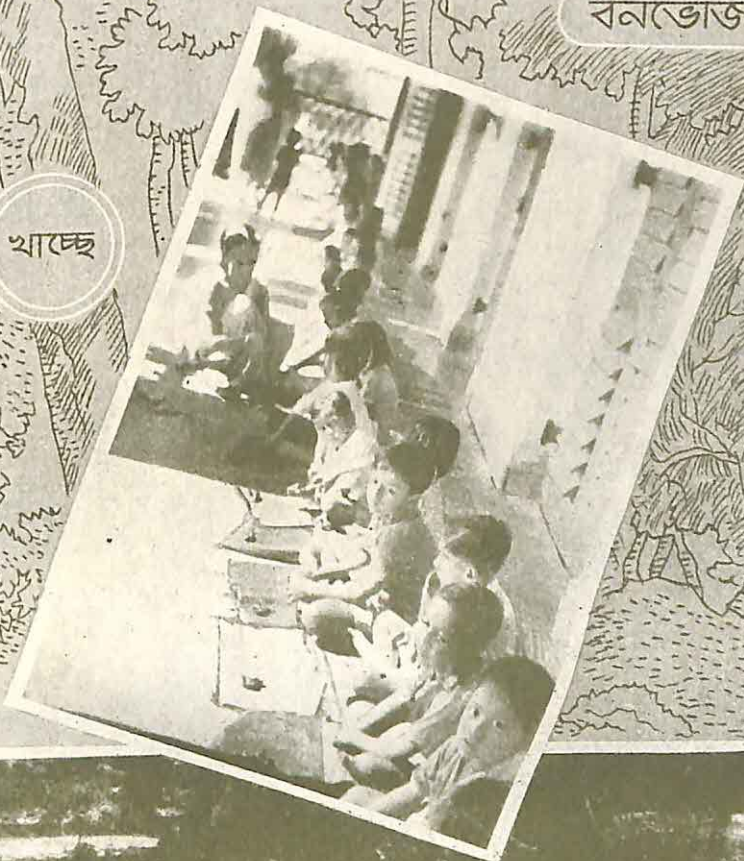
বনভোজন
খাচ্ছে
খাওয়ার পরে বিশ্রাম করছে

না নেড়ে চেড়ে দেখতে ভালো বাসে? প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় বাজারের হিসাব নেওয়া, তরিতরকারী গুছিয়ে রাখা—তাজা, নূতন ফল বা সবজী দেখে আনন্দ প্রকাশ করা—এও শিশুর প্রত্যেকদিনের জানা কথা। এই সকলের সে দর্শকমাত্র ছিল এতদিন, এই বনভোজনের উপলক্ষ্যে আজ সেই সব অভিজ্ঞতা তার কাছে বাস্তবরূপে ধরা দিল।

আরও সহজ কয়েকটি উদাহরণ দিই। বাগানে "সি-স" (See-Saw) বা ঢেঁকিতে দুলতে গিয়ে শিশুরা একদিন বুঝতে পারলো যে দুইদিকে সমান ওজনের শিশু না বসলে ঢেঁকি ঠিকমত ওঠে বা নামে না। এই উপলব্ধি থেকেই সুরু হলো কার কত ওজন তা জানতে হবে এবং আমাদের ওজনের যন্ত্রটিতে নিয়মিতভাবে তারা নিজেদের ওজন নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। ওজন নেওয়া থেকেই সুরু হলো দোকানের খেলা। বেচাকেনার কাজ শিশুদের অতি প্রিয় খেলা। "এক পয়সার নুন দাও তো।" দোকানী এক মুঠো নুন তুলে দিল। তারপরে আর একজন এসে বললো "এক পয়সার নুন দাও তো।" প্রথমজনকে বেশী দেওয়াতে বিক্রেতার লবণের ভাণ্ডার তখন শূন্যপ্রায়। দ্বিতীয়জনকে তাই অল্প একটু লবণ দিতে হলো। এর থেকেই সুরু হলো বিবাদ। "ওকে কেন বেশী দিলে? আমিও তো একটা পয়সা দিয়েছি।" এই উপলক্ষ্যেই ওজনের প্রয়োজনীয়তা কি, বাজারে কি ভাবে ওজন করে—তা বুঝিয়ে শিক্ষিকা "ওজনের খেলা" সুরু করেছিলেন।

বনভোজন উৎসব মাধ্যমে শিশু মুদ্রার ব্যবহার ও ওজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে এবং যোগ, বিয়োগের প্রক্রিয়াগুলিও মোটামুটিভাবে শিখেছে। উৎসবের পরিসমাপ্তিতেই এই শিক্ষার সমাপ্তি হলে সমস্ত পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হবে। এখন চলবে পুনরালোচনা ও পৌনঃপুনিক চর্চ্চা। যথা—শিশুদের হাতে নানা রং-এর কাগজের চাকৃতি দেওয়া হলো, মাটির গুলি দিলেও চলে। ধরে নেওয়া হলো যে হলুদ চাকৃতিগুলি হবে পয়সা, সাদাগুলি হবে আনা, লালগুলি হবে দুয়ানি, সবুজগুলি হবে সিকি ও কালোগুলি হবে আধুলি। এবারে এক টাকায় কত পয়সা, কত আনি, কত দুয়ানি, কত সিকি, ও কত আধুলি তা নানাভাবে শিশুকে জানাতে হবে, এবং তারই সাহায্যে একটি চিত্র প্রস্তুত করে শ্রেণীকক্ষে টাঙ্গিয়ে রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া নানা মূল্যের প্রকৃত মুদ্রা একত্র করে যে একটি টাকা পাওয়া যায় তারও চর্চ্চা করতে হবে এই সময়ে। এই সমস্ত চর্চ্চা কেবল খেলার মাধ্যমেই হওয়া চাই। যেমন, আমরা সকলে রেলগাড়ীতে করে বেড়াতে যাব, টিকিট কিনতে হবে, কুলিভাড়া দিতে হবে—সকলে নিজের নিজের থলিতে এক টাকার রেজকী

নিয়ে নাও। এতে দেখা যাবে কেউ নিয়েছে ৬৪টি পয়সা, কেউ বা নিয়েছে ১টি সিকি, ২টি আনা, ১টি দুয়ানি আর ১টি আধুলি এইভাবে নানা জনে নানা মূল্যের মুদ্রা দিয়ে ১টাকা পূর্ণ করেছে।

ওজন-শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা চলতে পারে। দোকানের খেলায় বালির স্তূপে বালি মেপে, ছেলেদের জলখাওয়ার গেলাসে জল মেপে শিশুদের সের, পোয়া ও ছটাকের জ্ঞান দেওয়া যায়। দোকানের খেলায় কত সহজে শিশুরা যোগ, বিয়োগ গুণ ও ভাগ শেখে, তা আমরা অনেকেই জানি। বিক্রেতাগণ ক্রেতা শিশুদের এইভাবে রসিদ দিতে পারে ঃ—

	টাকা	আনা	পয়সা
সমু—১৩ আনা সের হিসাবে ২ পোয়া চিনির দাম	০	৬	২
৮ আনা সের হিসাবে ১ পোয়া আটার দাম	০	২	০
২ আনা সের হিসাবে ১ পোয়া লবণের দাম	০	০	২
	০	৯	০

সমু নিজের হিসাব মিলিয়ে দেখবে যে তার থলিতে ছিল ১৪ আনা পয়সা। তার থেকে ৯ আনা পয়সা বাদ দিয়ে দেখবে তার কত পয়সা বাকী আছে।

১৪ আনা
৯ আনা
———
৫ আনা বাকী

এখন তার ৫ আনা পয়সা বাকী আছে।

সমস্যামূলক অঙ্ক ছয় সাত বৎসরের ছেলেরা কি ভাবে শেখে তারও একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি ভাল হয়। শিক্ষিকা ক্রেতাদের দলে মিশে বিক্রেতাকে বল্লেন, "দু সের নুন দাও তো?" শিশু অবলীলাক্রমে তার দাঁড়িপাল্লায় ২ সের বালি মেপে দিয়ে হেসে বললো "দিদিমণি কেবল নুন খাবেন।" হিসাবের বেলায় কিন্তু মুস্কিল বেধে গেল। দামের টিকিটে লেখা আছে ১ সের লবণের দাম ২ আনা। তাহলে ২ সের লবণের দাম কত? প্রথমে ১ সের লবণের উপরে একটি দুয়ানি রাখা হলো পরে আর১ সের লবণের উপরে আর একটি দুয়ানি রেখে দেখানো হলো যে দুই সের লবণের দাম চার আনা। এইভাবে এক সেরের দাম দুই আনা হলে তিন সেরের দাম কত, চার সেরের দাম কত? প্রশ্নোত্তরের দ্বারা গুণের প্রক্রিয়াটি সহজেই শেখানো যায় এবং গুণ যে যোগেরই দ্রুততর রূপ সেটিও বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অন্য পক্ষে, ১ সের লবণের মূল্য ২ আনা হলে ½ সের বা

২ পোয়ার দাম কত? এই নিয়মে বিয়োগ ও ভাগের প্রক্রিয়াটিও সহজ উপায়ে শেখানো যায়। বলা বাহুল্য, শিক্ষার এই স্তরে আমরা মুদ্রা বা ওজনের প্রচলিত চিহ্নগুলি ব্যবহার করি না কেননা এই সময়ে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিশুকে প্রত্যক্ষ মুদ্রা ও অঙ্কের প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সহজভাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। বিমূর্ত্ত সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বে গণনার প্রয়োজনীয়তা ও তার ব্যবহারিক মূল্য বুঝতে পারাই হলো এই স্তরে অঙ্ক শিক্ষার লক্ষ্য। "অঙ্ক জিনিষটা যে ব্যবহারের জিনিষ, খাতায় আঁক কষে, ছেলেরা সে কথাটা ভুলে যায়। এই জন্যেই অঙ্কের পরে অনেক ছেলের বিতৃষ্ণা জন্মে। খাতায় যেটা কষলো সেটাকেই যদি বিচিত্র করে বস্তুর দ্বারা কষে তবে অঙ্ক তাদের কাছে সজীব হবে ওঠে। গণিতের নিয়মে কৃত্রিম দোকান রাখা, কাঠের ইট দিয়ে কৃত্রিম ঘর তৈরী, স্কুল ঘরের দরজা কড়ি বরগার পরিমাপ, এমন কি চড়ুইভাতির আহার্য্যের উপকরণের হিবাব ঠিক করা প্রভৃতি অঙ্ককে হাজার রকমের খেলায় ও হাতের কাজে পরিণত করা যায়।" (৩)

এই সকল খেলা ধূলার ফলে যে জগৎটা শিশুর কাছে অদ্ভুত ও রহস্যঘন, তার আবরণ ধীরে ধীরে খসে পড়ে। তার নিজের অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করে দেখে সে তার জ্ঞান ও ধারণাকে স্থায়ী করে তোলে। এমনই কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমাদের বাগানে একটি ছোট চৌবাচ্চাতে অনেকটা বালি আছে। এই বালির স্তূপে কত যে খেলার অবতারণা হয় তার ইয়াত্তা নাই। কোনদিন গড়ে উঠলো "কালীঘাটের নদী" তাতে ভেসে চলেছে কাঠ বোঝাই নৌকা, কোনদিন গড়ে ওঠে বাজার, কোনদিন বা সহর। একদিন পাঁচ বৎসরের বাবুয়া সন্ধ্যাবেলায় মায়ের সঙ্গে গেছে লাইব্রেরীতে বই আনতে। লাইব্রেরীর বারান্দায় রয়েছে দামোদর পরিকল্পনার একটি মডেল। বাবুয়া মায়ের আঁচল টেনে বললো, "মা এটা কি?" সহজ ভাষায় মা বুঝিয়ে দিলেন দামোদর পরিকল্পনার মডেলটি—কেমন করে নদী থেকে কাটা হবে খাল, বাঁধা হবে নদী, জমা করা হবে নদীর জল, আবার বইয়ে দেওয়া হবে সেই জল। চাষ বাস হবে, লোকে খেতে পাবে। নদীর জলের তোড়ে বের হবে বিদ্যুৎ, আর তাতেই জ্বলে উঠবে আলো। বাড়ীতে বাড়ীতে ইলেকৃট্রিক বাতি জ্বলবে, কল কারখানায় কাজ চলবে বিদ্যুতের জোরে। খালগুলি কাটতে, নদীর জল ঘুরিয়ে দিতে কত লোকজন জমা

(৩) মনোবিকাশের ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ।

হয়েছে তারা কোথায় থাকে, কেমন ভাবে থাকে, বাবুয়া সবই খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে মাকে।

পরদিন বেলা দশটায় বাবুয়া এসেছে নার্সারী স্কুলে। চোখ দুটি তার উজ্জল, ঠোঁট দুটি কাঁপছে আগ্রহে, "জান, কাল আমি দামোদরের মডেল দেখেছি, দেখবে কেমন করে তৈরী করতে হবে?" দৌড়ে গিয়ে নিজের জুতা ও টিফিনের কোটা যথাস্থানে রেখে বাবুয়া খেলার মাঠে বালির স্তূপে গিয়ে বসলো। আমি চুপ করে দেখছি। মাথায় মাথায় কি ফন্দি আঁটছে এই শিশুটি। বাগান থেকে একটা ডাল ভেঙ্গে এনে বালিতে কাটলো দাগ, খুরপী দিয়ে গভীর করে কাটলো আঁকা বাঁকা খাল। তারপরে বালতি করে জল এনে বইয়ে দিলো খালে। কিন্তু জল তো বয় না—বালিতে শুষে নেয়! কি হবে? আবার এদিক ওদিক দেখে বাবুয়া—নজরে পড়লো একখণ্ড রবারের নল। বাগানে জল দেওয়ার হোস পাইপের একখণ্ড পড়ে আছে আমাদের আবর্জ্জনা স্তূপে। দৌড়ে গিয়ে বাবুয়া নিয়ে এলো পাইপটি, বসিয়ে দিল খালের গর্ত্তে, তারপরে ডাক দিলো আরও পাঁচটি ছেলে মেয়েকে, "অনিল, সমু, মঞ্জু, এস নলের ওপরে অনেক করে বালি চেপে দাও।" সবাই মিলে ছোট ছোট বালতি করে ঝুরো বালি চাপা দিতে লাগলো। কিন্তু এদিক ওদিক থেকে একটুখানি কালো রবার তবুও উঁকি মারে। মহা মুস্কিল, সমুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল যে ভিজে বালি চাপা দিলেই রবার ঢাকা পড়বে ঠিক। বেশ চাপ চাপ ভিজে বালি দিয়ে গোটা নলটি চাপা দেওয়া হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, "সমু কি করছো?" সমু বললো, "আমি তো রাজমিস্ত্রী, ফাটা সারাচ্ছি।" তারপর খুরপীটা কর্ণিকের মত করে ভিজে বালির উপরে ঘসতে লাগলো।

এদিকে বাবুয়া নলের এক প্রান্তে এক মস্ত গর্ত্ত খুঁড়েছে—দামোদরের জল জমা হবে বলে। অন্য প্রান্তে নলের মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে ফুলঝারির লোহার নল, তাতেই সবাই মিলে ঢালছে বালতির পর বালতি জল। দামোদরের জলে দেশ হয়ে উঠবে শস্য-শ্যামলা—কিন্তু বাবুয়ার খালের পাশে তো কেবলই বালি! বাগান থেকে এলো ডালপালা, এল জবা করবী ফুল, জমা হয়ে উঠলো ইট কাঠ! বেলা দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে দামোদরের স্রোতে বাবুয়ার দেশ হয়ে উঠেছে সবুজ—তার মধ্যে বাড়ী, দোকান, মন্দির, বাগান, পুকুরে মাছ, মাঠে ধান, বাড়ীর মাথায় ইলেক্‌ট্রিকের তার, কোনটাই বাকী নাই। এইভাবে গড়ে উঠছে ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক।

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আমরা দুটি বড় ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একটিকে আমরা প্রধান স্থান দিয়ে বলেছি যে শৈশবের শিক্ষা হবে প্রধানতঃ ব্যক্তি-

কেন্দ্রিক। স্যার পার্শী নান (Sir Percy Nunn) শিক্ষার এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যকেই সকল উদ্দেশ্যের শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। অন্য ভাগটিকে আমরা বলি সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জেমস্ রস্ (James Ross) শিক্ষার এই সমাজকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যকেই প্রধান বলে স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ, এই দুইয়ের সমন্বয়ই হলো বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য। গান্ধীজী বলেছেন এই সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে শিশুর জন্ম হতেই। শিশু-শিক্ষালয়ে এই শিক্ষার জন্য যে সুযোগ দেওয়া হয়, তার বহু উদাহরণ এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। নিজের পরিবেশের বাইরেও যে একটি জগৎ আছে, তার সঙ্গে শিশুর কি ভাবে পরিচয় ঘটে তার একটি উদাহরণ দিই। একদিন সকাল বেলায় আমাদের শিক্ষায়তনে বেড়াতে এলেন কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা। ছেলেমেয়েরা জানতে চাইলো তাঁরা কে, কোথা থেকে এসেছেন এবং কেনই বা এসেছেন। গড়ের মাঠে ছোট ছোট ইংরাজ শিশু তারা অনেকেই দেখেছে, তারা কি খায়, কি পরে, কি খেলা খেলে, কি করে এদেশে এসেছে, কেমন করেই বা ফিরে যাবে—সবই আলোচনা করা হলো। উজ্জ্বলা বললো, "দিদিমণি আমি কখনও জাহাজ দেখিনি।" ব্যবস্থা করে চারদিন পরে সকলে মিলে জাহাজঘাটে বেড়াতে যাওয়া হলো। জাহাজঘাট, কালীঘাট ষ্টেশন ঘুরে বাড়ী ফিরতে সকাল বেলাটা কেটে গেল। ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো শিশুর দল।

তার পরের দিন সকালবেলা থেকেই বড় ভীড়। ট্রেনিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছেন স্কুলের কাজ দেখতে। বিশেষ করে আগ্রহ তাঁদের জানতে কেমন করে হয় "পুস্তকহীন শিক্ষা"। দশটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত চলেছে অবাধভাবে খেলাধূলা,—ছেলেমেয়েরা কল্পনার রঙীন পাল উড়িয়ে কালীঘাট ষ্টেশন থেকে রেলগাড়ী চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে, সেখানে থেকে ট্রামে করে ফিরে এসেছে তাদের স্কুল বাড়ীতে আবার কলেজ বাসে করে বেড়াতে গেছে জাহাজঘাটে।

খেলা শেষে মাদুর পেতে ডেস্ক সাজিয়ে, "লেখাপড়া" সুরু হলো। দিদিমণি খবরের কাগজ থেকে কেটে এনেছেন এইচ, এম, এস, সিলোন (H. M. S. Ceylon.) জাহাজের ছবি—জাহাজের পাশেই আছে বন্দরঘাটের পুলিশের নৌকা। এই জাহাজটাই তারা গতকাল বেশ ভাল করে দেখে এসেছে। ছবিটা সামনে ধরতেই মুখ খুলে গেল সকলেরই—এমনকি ছোট্ট হেনারও। তাদের ভ্রূক্ষেপও নাই যে সামনে ঝুঁকে রয়েছে অনুসন্ধিৎসু বিশ পঁচিশটি বাইরের লোক। আলাপ আলোচনা শেষ হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ

আঁকলো জাহাজের ছবি, কেউ বসলো লিখতে খাতায়। সমু, বয়স তার পাঁচ পূর্ণ হয়েছে, একেবারে নিজের চেষ্টায় যা লিখেছে তারই নমুনা তুলে দিলাম এখানে :—

"আমরা জাহাজ দেখেছি। বিলাতের জাহাজ দেখেছি। জাহাজে করে মাল আসে। সাহেবরা ঠাণ্ডা দেশে থাকে। ক্যাপটেন সাহেব জাহাজ চালিয়ে এনেছেন। জাহাজে ছোট ছোট ঘর আছে। তাতে লোকেরা থাকে। জাহাজে কামান দেখেছি। নৌকা দেখেছি। জাহাজ ফুটো হয়ে গেলে জল ঢোকে। তখন লোকেরা নৌকা করে বাঁচে। আমরা ৪৭ জন ছেলে মেয়ে গিয়েছিলাম।" এইভাবে এগিয়ে চলেছে পুস্তকহীন শিক্ষা আর বেড়ে উঠছে শিশুদের সামাজিক ও ভৌগলিক জ্ঞান।

একজন অতিথি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছবিটাতে জাহাজের মাঝখানে একটা কালো দাগ দিয়েছো কেন?" অমিত বললো, "ওটা তো হলো মাল নেবার দাগ। জাহাজে মাল ভরলে জাহাজ অতদূর পর্য্যন্ত ডুবে যাবে, বেশী ডুবে গেলে মাল কমাতে হবে, না ডুবে গেলে আরও মাল দিতে হবে। আর কি করে মাল নামায় জানো? ক্রেনে করে। এই গোল গোল দাগগুলো জাহাজের গায়ে এঁকেছি কেন জানো? এগুলো হলো জান্‌লা—জাহাজের ঘরে ঘরে বাতাস ঢুকবে বলে।" পাঁচ বছরের অমিতের মধ্যে জেগে উঠেছে ভবিষ্যতের বক্তা।

"দিদিমণি, সাহেবরা কি করে পথ চিনতে পারলো?" প্রশ্ন করে শিবানী। আমি বললাম, "তোমরা কি করে পথ চিনে স্কুলে আস বলতো? আবার আমাদের কথোপকথন স্থরু হলো। মানচিত্র কিভাবে গড়ে ওঠে এবং তার ব্যবহারই বা কি জানতে হলে এই তো আমাদের প্রকৃষ্ট স্থযোগ। ভারতের রেলপথের মানচিত্র সমেত একটি দেওয়ালপঞ্জী ঝুলছিল দেওয়ালে—সেটিকে নামিয়ে আনলাম, মানচিত্রটি দেখিয়ে বোঝানো হলো যে কোন্ পথ ধরে সাহেবরা এসেছেন আমাদের দেশে। তারপর সংগ্রহ করলাম কিছু ইঁট, কাঠ ঘাস, পাতা, বালি ; আবার খেলা স্থরু হলো। একটা ছোট বাড়ী তৈরী করে বললাম, "ধর এটা আবদুলদাদার (পরিচারক) বাড়ী। আবদুলদাদার বাড়ী থেকে কলেজবাড়ী কোন্‌দিকে—?" তৈরী হলো দোতালা কলেজবাড়ী—আবদুলের বাড়ীর উত্তর দিকে। "কলেজবাড়ী থেকে গেট বাড়ী?"—তৈরী হলো ছোট গেটের বাড়ী, অমনি তার সামনে খড়ি দিয়ে মঞ্জু এঁকে দিল ট্রাম লাইন। "আচ্ছা আবদুল দাদার বাড়ীর সামনে আর কি আছে বলতো?—"কেন আমাদের ইস্কুল বাড়ী"—, তৈরী হলো আমাদের ছোট দোতালা বাড়ী।

তারপরে এলো সোনামণির বাড়ী (কলেজের পরিচারকের মেয়ে)। এই সময়ে কমলাদিদি (শিক্ষিকা) হস্টেলে যাচ্ছিলেন, তাঁকে দেখে আরতি বললো, "কমলাদিদির বাড়ী করবে না?" ইস্কুলবাড়ী থেকে রাস্তা এঁকে যাওয়া হলো কমলাদিদির বাড়ী পর্য্যন্ত—তৈরী হলো কমলাদিদির বাড়ী। তারপরে আর একটি গেটের বাড়ী—এই ফটক দিয়ে চেতলা অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে। "এখনও আর একটি বাড়ী বাকী আছে।" "কোন্‌টা দিদিমণি?" "কেন—যে বাড়ীতে কলেজের দিদিমণিরা থাকেন।" গড়ে উঠলো হস্টেলের দোতালা বাড়ী, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর ইত্যাদি। রাস্তা এঁকে বাড়ীগুলিকে জুড়ে দেওয়া হলো—তারপরে মাঝে মাঝে যে সব মাঠ আছে—তাতে ঘাস ছড়ানো হলো—পিচবোর্ড কেটে গাছ তৈরী করে যথাযথ স্থানে বসিয়ে দেওয়াও হলো। খেলার মাঠে গাছ থেকে দোলনা ঝুলানো হলো—যাবতীয় খেলার জিনিষপত্র সাজানো হলো। পুতুলের বাড়ীর খাট, বিছানা, চেয়ার চৌকি তুলে নিয়ে অনিল "হস্টেল বাড়ীতে" সাজিয়ে দিল। মঞ্জু আপত্তি তুলতেই অনিল বললো, "বারে, দিদিমণিরা তো ওখানে শোয়।" এরপরে ট্রামলাইন ধরে কথাবার্ত্তা স্থুরু হলো—কে কোন্ দিক থেকে আসে, কি করে দিক নির্ণয় করা যায়, কার বাড়ী কোন্ রাস্তার উপরে, ইত্যাদি। এবারে শিক্ষিকা বললেন, "কোন্‌টা কার বাড়ী কি করে জানবো?" সবিতা বললো, "দিদিমণি নাম লিখে দেবো?" স্থুরু হলো নামগুলি লেখা। খাতাতে ছবি আঁকা হলো—আর তাতেও লেখা হলো তাদের বাড়ীর নাম, রাস্তার নাম, কলেজের দিদিমণিদের নাম, কোন পথে মোটর গাড়ী আসে, কোন পথে বাস চলে ইত্যাদি। এইভাবে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে তারা যেমন পথ চিনে স্কুলে আসে আবার বাড়ী ফিরে যায়, তেমনি সাহেবরাও পথ চিনে এদেশে এসেছেন আবার পথ চিনে বাড়ী ফিরে যাবেন। শিশু-নিকেতনে ভাষা ইতিহাস, ভূগোল, গণনা প্রভৃতি বিষয় প্রত্যক্ষ কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হলে কত শীঘ্র এবং কত সহজে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় তার নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পেয়েছি বলেই নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে কর্ম্মমাধ্যমে শিশুর শিক্ষার প্রচলন যত বেশী হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করা হলো তাতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিশুর একটি জিজ্ঞাসু মনকে গড়ে তোলা, তার আগ্রহকে ঘিরে তাকে পরিচিত পরিবেশটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শিশু যে কল্পনারাজ্যে বাস করে একথা বহুদিন পূর্ব্বেই শিক্ষাবিদগণ মেনে নিয়েছেন এবং তারই ফলে গল্প, ছড়া, কবিতা সৃজনাত্মক-

কাজ, সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অনেক প্রগতিশীল শিশু-শিক্ষায়তনেই হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসু মনটিকে তৃপ্ত করবার জন্য যে বাস্তব জগতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আবশ্যক এই সত্যটি অনেক ক্ষেত্রেই উপলব্ধি করা হয়নি। ইলেকট্রিক বাতিটি কেন জ্বলে ওঠে, কল দিয়ে কেন জল পড়ে, টেলিফোনে কেন কথা বলা যায়, মোটরগাড়ী কি করে চলে, গরমকালে স্নান করলে কেন ভাল লাগে, পুলিস কেন রাস্তায় হাত দেখায়, আগুনে মোম গলে যায়, কাঁচ গলে কি? পাখী কেন ওড়ে, সাবান দিয়ে কাপড় ধুলে কেন ময়লা বার হয়—এ সবেরই উত্তর শিশু পেতে চায়। তাকে প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, পর্য্যবেক্ষণ করবার প্রচুর সুযোগ ও সুবিধা দিলে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নগুলির সঙ্গত সমাধান সে নিজেই খুঁজে পায়। শিশুর কল্পনার জগৎ ও বস্তু জগতের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করাই হলো আজ শিশু-শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে শিশু-শিক্ষাপ্রণালী কোন প্রকার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে নি বললে অত্যুক্তি হবে না। এর নানাবিধ কারণ আছে। প্রথমত, এতদিন পর্য্যন্ত শিশু-শিক্ষার জন্য আমাদের কোন প্রয়োজনবোধ হয় নি। দ্বিতীয়তঃ যে সকল ক্ষেত্রে শিশুশিক্ষার নানা প্রচেষ্টা চলেছে সেখানেও উপযুক্ত শিক্ষিকা, উপকরণাদির অভাবে প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সাধারণ বিদ্যালয়ে কি ভাবে কর্ম্মমাধ্যমে শিশু-শিক্ষা প্রচলন করা যায় তারই কয়েকটি উদাহরণ দিলে আশা করি শিক্ষকগণ উপকৃত হবেন।

(ক) **রথের মেলা**—রথের ছুটির পূর্ব্বদিন শিশুদের নিয়ে মেলায় যাওয়া হবে। ছুটির পরদিন রথের ছুটি কেন হয়—সে সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা চাই। এই কথোপকথনের সারাংশ শিশুরা খাতায় লিখবে।

কবিতা—"আমায় কিন্তু জাগিয়ে দিয়ো কালকে রথের মেলা।"

হাতের কাজ—পরিকল্পনা—একটি রথের মেলার আয়োজন।

সময়—এক সপ্তাহ

উপকরণ—(১) খাবারের দোকান
(২) পুতুলের দোকান
(৩) গহনার দোকান
(৪) খেলনার দোকান
(৫) পুতুল নাচের ব্যবস্থা

লিখন, পঠন ও গণনা—

(১) পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখবে।

(২) প্রত্যহ রথের মেলা সম্বন্ধে যে সকল কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে লিখবে।

(৩) কোনদিন পরিকল্পনার কাজ সুরু ও শেষ হলো, তার একটি পঞ্জিকা রেখে শিশুরা তারিখ, দিনের নাম, মাসের নাম ও সাল শিখবে।

(৪) মেলা-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবে।

(৫) উৎসবের উপযুক্ত সঙ্গীত ও নৃত্য শিখবে।

মেলার দিন—(১) গৃহসজ্জা ও উৎসবের আয়োজন করবে।

(২) মিষ্টান্ন ও খাদ্যাদি প্রস্তুতে সাহায্য করবে।

(৩) অতিথি-অভ্যাগতজনকে আমন্ত্রণ জানাবে।

(৪) ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখবে।

(৫) নৃত্য ও সঙ্গীতাদির দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করবে।

(খ) ডাক ঘর—(১) শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করবার জন্য শিক্ষিকা নিজে কিংবা অন্য কোন শিশু-শিক্ষায়তনের সাহায্যে প্রত্যেক শিশুর সহিত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করবেন।

(২) পিওন সেই চিঠিগুলি শিশুদের হাতে পৌঁছে দেবে।

(৩) পিওন সর্ব্বসাধারণের জন্য কি কাজ করে সে সম্বন্ধে পিওনের কাছ থেকে শুনবে।

(৪) নিকটের ডাকঘর দেখতে যাওয়ার জন্য পোষ্টমাষ্টারের নিকট হতে লিখিত অনুমতি চাইবে।

(৫) ডাকঘর দেখতে যাবে।

(৬) চিঠি ভিন্ন অন্য কি প্রকারে সংবাদ সরবরাহ করা হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

হাতের কাজ—(১) চিঠির বাক্স তৈরী করবে, কখন চিঠির বাক্স খালি হবে তার নির্দ্দেশ লিখবে, সংগৃহীত চিঠিগুলি প্রকৃত ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসবে।

(২) বিভিন্ন মূল্যের টিকিট সংগ্রহ করবে।

(৩) বিদেশে কোন আত্মীয়স্বজন থাকলে তাঁদের চিঠি লিখবে ও তাঁদের দেওয়া চিঠিগুলি জমা করবে।

(৪) পিওনের কাপড়জামা তৈরী করবে।

(৫) পিওনের থলি তৈরী করবে।

(৬) ডাকঘর তৈরী করে (ডেস্ক চেয়ার দিয়ে) খাম পোষ্টকার্ড বিক্রির খেলা হবে।

(৭) বিভিন্ন উপায়ে সংবাদ প্রেরণ সম্বন্ধে মডেল তৈরী করবে বা ছবি আঁকবে।

কবিতা— "ছোট-খাট পিওন আমি।"

লিখন, পঠন ও গণনা—ডাকঘর সংক্রান্ত সকল আলোচ্য বিষয়ই লিখবে। সুবিধা হলে শিক্ষিকা বরাবরের জন্য খাম, পোষ্টকার্ড ও টিকিটে ভরা একটি বাক্স রাখবেন এবং স্কুলের যাবতীয় প্রয়োজনে এখান থেকেই চিঠির সরঞ্জাম কেনা হবে। শিশুরা হিসাব রাখবে। চিঠির বাক্স খালি করার নির্দ্দেশ লিখতে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ঘড়ি দেখতে শিখবে।

(গ) **পুতুল নাচ**—আগ্রহের সঞ্চার করতে হবে উপযুক্ত একটি গল্পের দ্বারা। গল্পটি বলবার সময়ে শিক্ষিকা নানাজাতীয় পুতুলের সাহায্যে শিশুদের মনোরঞ্জন করবেন।

হাতের কাজ—(১) উপযুক্ত পুতুল, গহনাপত্র ও জামাকাপড় প্রস্তুত করবে।

(২) অভিনয় মঞ্চের ব্যবস্থা করবে, তার জন্য চিত্রাঙ্কন, সেলাই ইত্যাদি করতে হবে।

(৩) পুতুলনাচের দিনে উৎসবায়োজনে আলপনা দেওয়া, ফুল দিয়ে সাজানো ইত্যাদি করা হবে।

লিখন, পঠন গণনা—

(১) গল্প শুনবে, বলবে ও লিখবে।

(২) গল্পকে নাট্যে রূপান্তরিত করবে।

(৩) সকলে গল্পটিকে পড়বে।

(৪) অভিনয় অভ্যাস করবে।

(৫) পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠাবে।

(৬) অভিনয়-মঞ্চ ও পুতুলের সজ্জাদি প্রস্তুতকালে গজ ফিতে ব্যবহার করতে শিখবে। ঘরটি কত বড় মেপে দেখবে, কয় সারি আসন পাতা হবে, এক সারিতে কয়জন বসবে—সর্ব্বশুদ্ধ কতজন বসবে—যোগ ও গুণের প্রক্রিয়ার অভ্যাস হবে।

(ঘ) **স্টেশন**—আগ্রহ সঞ্চারের জন্য শিক্ষিকা শিশুদের নিকটস্থ কোন স্টেশনে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সম্ভব হলে ট্রেনে করে কোন দ্রষ্টব্য স্থান বা বিষয় দেখাতে নিয়ে যাবেন। শিশুরা রেলগাড়ীতে চড়ে কোথাও বেড়াতে গেছে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। তারপরে তারা একটা স্টেশন তৈরী করতে চায় কিনা তাও জিজ্ঞাসা করবেন। স্টেশন তৈরী করতে হলে কি কি উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে তার আলোচনা করবেন। শিক্ষিকার সাহায্যে শিশুরা খাতায় লিখবে।

হাতের কাজ—কাঠের বাক্স, দেশলাই বাক্স, কাগজের বাক্স সংগ্রহ করা হবে। এই সকলের সাহায্যে যাত্রীবাহী, মালবাহী, ছোট লাইনের ও বড় লাইনের গাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করবে। লেভেল ক্রসিং, টারণ-টেবিল, সিগন্যাল, টেলিগ্রাফের তার, টিকিটঘর কোনটাই বাদ যাবে না। নিজেদের জন্য টুপি তৈরী করে শিশুরা গার্ড বা ড্রাইভার সাজবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য খাবারের দোকান, খাবারওয়ালা, পানিপাঁড়ে ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে। মাটির গরু, ছাগল ভেড়া ইত্যাদি তৈরী করে রেললাইনের দুই পাশে সাজিয়ে দেবে। ছোট ছোট বাড়ী, গাছ প্রভৃতি তৈরী করবে, নদী, খাল বিল ও উপযুক্ত ও সহজ উপায়ে দেখাবে।

লিখন, পঠন ও গণনা—যানবাহন সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা হবে এবং সে সম্বন্ধে লেখা হবে। নানাপ্রকারের যান বাহনের ছবি সংগ্রহ করা হবে। রেলপথ আলোচনাকালে শিশুদের মাইল সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যায় এবং পরিমাপের সহজ অঙ্কের সহিত পরিচয় করানো যেতে পারে।

আমরা জানি, ফুলের মত জীবনের ধর্ম্মও বিকশিত হয়ে উঠে পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলা—ধরণীমাতার সকল সম্পর্ককে অস্বীকার করে ফুলের পক্ষে ফুটে ওঠা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জগৎকে অস্বীকার করে মানুষের পক্ষেও পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। এই জীবনকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার কাজ। যে সকল উদাহরণ এই অধ্যায়ে দেওয়া হলো সেগুলি শিশুশিক্ষিকাকে কেবল প্রেরণা দেওয়ার জন্য, তিনি আপনার ধ্যান ও জ্ঞানের দ্বারা শিশুদের প্রয়োজনানুসারে নবতর শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলবেন—আমরা এমনই আশা করি। বর্ণিত পরিকল্পনাগুলি অনুশীলন করলে দেখা যাবে

যে শিক্ষার মধ্যে শিশু যেন অমৃতরসের সন্ধান পায় তারই জন্য নিরন্তর একটি সাধনা চলেছে। এই সকল খেলাধূলার মধ্যে আমরা সহজেই খুঁজে পাই ভবিষ্যতের কবি, কর্ম্মী, বক্তা, বৈজ্ঞানিক ও জননেতাকে। কোন্ শিশু প্রকৃতপক্ষে স্নেহের অভাবে মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, একগুঁয়ে হয়, মারামারি করে, এসকলেরও সত্য পরিচয় পাওয়া যায় এই সকল অবাধ মেলামেশা ও কাজকর্ম্মের সাহায্যে। কোন্ শিশু লাজুক, কে নিষ্ঠুর, কে সহৃদয় তারও নিদর্শন আমরা সহজেই পাই—এই সকল ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে।

শিশুর অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য না রাখাই শিশু-শিক্ষায়তনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর জন্য প্রয়োজন একটি অকৃত্রিম পরিবেশ যেখানে একান্ত নিরাপত্তায়, স্নেহময়ী ও বিচক্ষণ শিক্ষিকার সুষ্ঠু পরিচালনায় শিশু নিজের ইন্দ্রিয়শক্তির চর্চ্চা করবে। সে সন্ধান করবে, চিন্তা করবে, কাজ করবে এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব চেষ্টায় সেই অভিজ্ঞতা ও কাজের বর্ণনা দেবে তার নিজের ভাষায়, নিজের হাতে গড়া কাজে।

শিশুর শরীর ও মন যাতে সুষমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সমাজ ও জগতকে সুন্দরতর ও সুখময় করে তোলে তা আমাদের সকলেরই লক্ষ্য—সেইজন্য জীবনের আরম্ভ হতেই শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে কর্ম্ম ও প্রেমের সম্মিলনেই গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস, সুস্থ ও স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রেরণায় জেগে ওঠে জীবনীশক্তি ও সুসংযত জীবন-নিষ্ঠা। সমগ্র জীবনসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই মহৎ জীবনকে উপলব্ধি করা হয় সহজ ও সম্ভব।

গ্রন্থসূচী :—

Lillian De Lissa—Life in the Nursery School.

E. R. Boyce—Infant School Activities.

Play in the Infants School.

E. Brideoake—Arithmetic in Action
&
J. D. Groves

E. G. Hume—Learning and Teaching in the Infants School.

M. Thorburn—Child at Play.

A. V. Daniel—Activity in Primary School.

প্রতিভা গুপ্ত—সমাজ ও শিশুশিক্ষা

অষ্টম অধ্যায়

জীবন বিকাশে শিশুর নানা সমস্যা ও সমাধানের উপায়
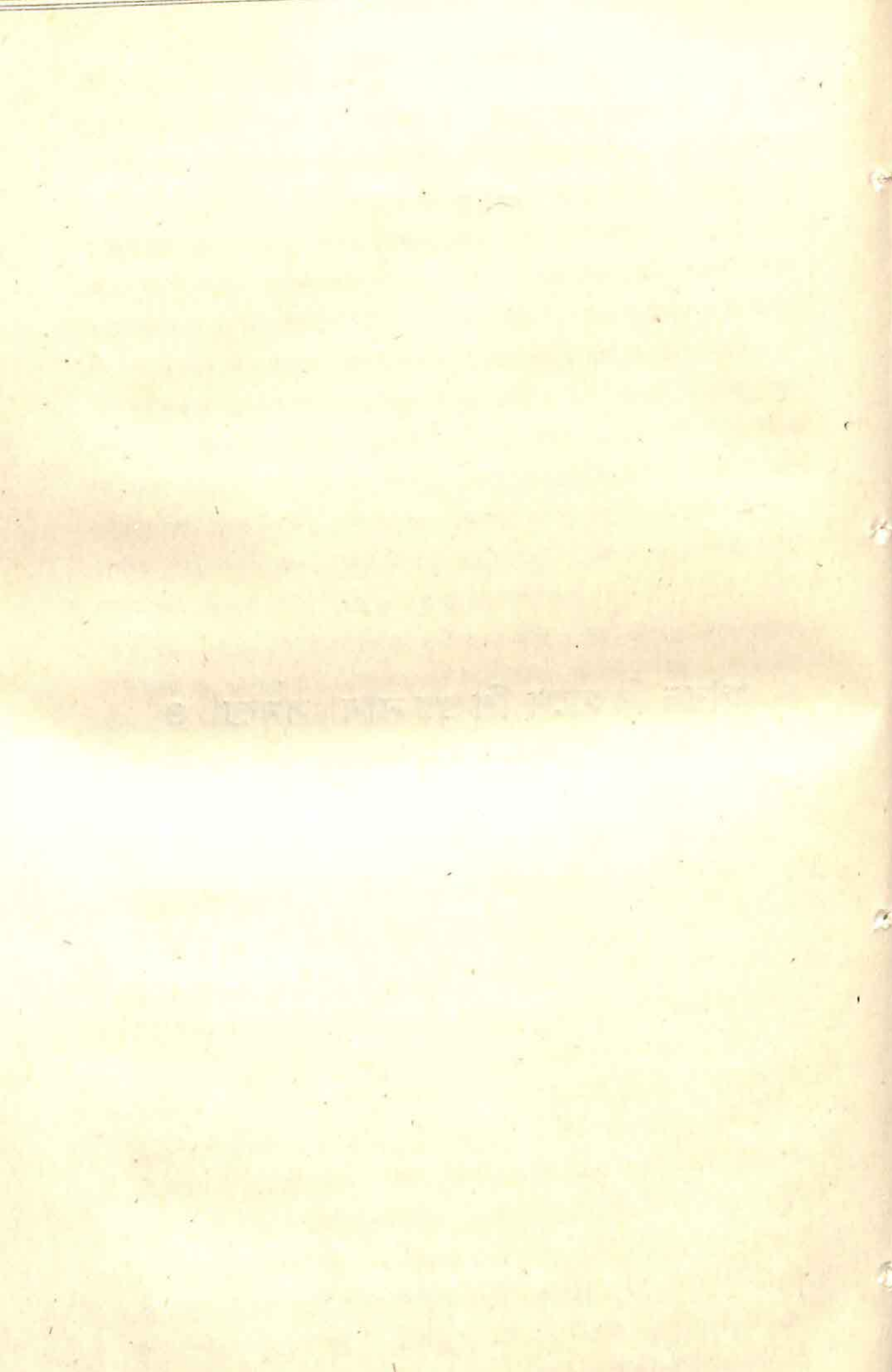
জীবন বিকাশে শিশুর নানা সমস্যা ও সমাধানের উপায়

শিশুর জীবন সমস্যাগুলি আজ বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করে বিশেষজ্ঞগণ একরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই সমস্যাগুলি বহুলাংশেই মানসিক ও আনুভূতিক বিকারের ফল, অথচ আপাতদৃষ্টিতে শিশুর দুর্ব্বোধ্য ব্যবহারে মনে হয় সে বুঝি শরীরে অসুস্থ কিংবা স্বভাবের দুষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে হাঁপানী, বারোমাস সর্দ্দি, শয্যামূত্রের অভ্যাস, অস্বাভাবিক চঞ্চলতা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ কেবলমাত্র শরীরের দুর্ব্বলতা বলেই গণ্য করা হয়, কিন্তু এই সকল উপসর্গ যে মানসিক অসুস্থতারও লক্ষণ হতে পারে, এই কথাটি আমাদের অনেকেরই জানা নাই।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে যদি একবার রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়, তাহলে রোগীকে ঔষধপত্রাদির সাহায্যে নিরাময় করে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু মানসিক অসুস্থতার লক্ষণগুলি এমনই বিচিত্র এবং ব্যাধির সূত্রটি খুঁজে পাওয়া এতই কঠিন যে আজকাল শিক্ষাবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ এবিষয়ে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। অনেক সময়েই দেখা গেছে যে মনের নানা ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ কোন কারণে নিরুদ্ধ ও নির্য্যাতিত হওয়াতে শিশুর বা রোগীর মনে একটি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতিগুলি কি, কেনই বা সেগুলি নিগৃহীত ও অবদমিত হয়েছে এবং কিভাবে শিশুচিত্তের কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে তাদের একটা গৌরবোজ্জল ব্যাপ্তির মধ্যে মুক্তি দিতে পারা যায় এই সকল তথ্য সন্ধানে মনোবিকলনবাদিগণ (Psychiatrist) তৎপর হয়েছেন।

ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার সমস্যা আজ নূতন নয়। এই দায়িত্ব অল্পবিস্তরভাবে পিতামাতা চিরকালই স্বীকার করে এসেছেন, কিন্তু আজকাল যেন এই সমস্যাটি খুব বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। গৃহে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে সভাসমিতিতে সর্ব্বত্রই ছেলেমেয়েদের আচার আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ শোনা যায়। এসকলের কারণ কি, এটি ভাববার সময় আজ এসেছে। সব জায়গাতেই শুনতে পাওয়া যায় ওরা অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত, অসামাজিক, অভদ্র এবং লেখাপড়ায় ওদের তিলমাত্র মন নাই। এসব কি জন্মগত ত্রুটি, না কেবল বর্ত্তমান যুদ্ধোত্তর পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ফল?

যে মানুষ শৈশবে স্নেহ ভালবাসায় ভরা নিরুদ্বেগ, নিঃশঙ্ক জীবন যাপন করেছে, সে উত্তরকালে অতি সহজেই ভদ্র ও মধুর স্বভাবের পরিচয় দেয়, এমন কথাই মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। বৃহত্তর জগতের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব্বে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত শিশু সাধারণ ক্ষেত্রে পিতামাতার কাছেই থাকে। এই বয়সের মধ্যেই তো তার স্বভাবে বাঞ্ছিত আচার আচরণের রঙ ধরার কথা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না কেন? আজ যে সকল কিশোর, কিশোরীর জীবনকে আমরা ব্যর্থ মনে করছি, সেই ব্যর্থতার মূল সন্ধান করতে হবে অনেক গভীরে, কেননা তার ইতিহাস যে বহু পুরাতন।

আমরা জানি যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নিতান্ত এক নূতন পরিবেশে। সে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিমাত্র নিয়ে আসে তার মূলধন স্বরূপে এবং তাদেরই সাহায্যে সে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। এই বয়সে চেতন অচেতনের সঙ্গে তার এমন একটি অন্তরঙ্গতা, এমন একটি প্রীতির বন্ধন হয় যে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে সে সকলকে চিনতে ও জানতে চেষ্টা করে। সমাজের মাপকাঠিতে তার আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, একথা তার জানা নাই। তার চোখে আছে অপরিমেয় বিস্ময় আর তার মনে আছে অপরিসীম কৌতূহল। সব জিনিষই সে পরখ করে দেখতে চায়, বুঝতে চায় সব কিছু নেড়ে চেড়ে। এইভাবে সমস্ত বহির্বিশ্ব তার ইন্দ্রিয়দ্বারে এসে আঘাত করে। এই সকল পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে শিশুর অন্তর্জগতে কতকগুলি অভিজ্ঞতা স্থান পায়। কিন্তু সেগুলি শিশুর মনোজগতে সঞ্চিত হয়ে থাকে না। সেখানে নিরন্তর একটা গ্রহণ ও বর্জ্জনের পালা চলতে থাকে। কেননা নিত্যকালের বহির্বিশ্বটির তুলনায় শিশুর অন্তর্লোকটি নিতান্তই স্বল্পপরিসর, কাজেই পরিহার্য্য অংশকে বাদ দিয়ে তার মন কেবল অপরিহার্য্য অংশই গ্রহণ করে। অপরিহার্য্য অংশগুলিও চেতনলোকে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, কেননা নিত্যনূতন জ্ঞানে তার সজীব মনটি নিয়তই পূর্ণ হতে থাকে, সেইজন্য গভীর চিত্তভূমিতে অর্থাৎ মনের অবচেতন ও অচেতন অংশে গিয়ে তারা স্থান পায়। বস্তুজ্ঞান প্রথম যখন চিত্তভূমির চেতনলোকে প্রবেশ করে তখন মনে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, ক্রমে যখন তার প্রচণ্ডতা স্তিমিত হয়ে আসে তখন শিশুর মনের ধ্যান-ধারণা একটা রূপান্তর গ্রহণ করে। এর পরে যখন তার পুরাতন অভিজ্ঞতাগুলি আবার চেতনস্তরে এসে আত্মপ্রকাশ করে, তখন দেখা যায় তাদের অন্যরূপ, তারা তখন চিত্তের জারকরসে জারিত হয়ে মূলীভূত হয়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতেই হয় মানবমনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ ও উদ্গতি।

শিশুমনের স্ফুট অস্ফুট, সূক্ষ্ম সুকুমার তারগুলিতে যে বিচিত্র ঝঙ্কার বাজে সেই সুরটি আমাদের মনে সর্ব্বদা ধরা দেয় না। শিশুর তালে তাল রেখে চলবার অবসর আমাদের নাই। আজ এই দারুণ অভাব, অনটন ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিনে শিশুর পরীক্ষামূলক কাজকর্ম্মে সহযোগিতা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শিশুর মন অপূর্ণ বলেই যে সে সদা চঞ্চল, এটাই যে তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, একথাও আমরা মানি না—কাজেই তার প্রত্যেক প্রকাশভঙ্গীকে সময়ের অপচয় মনে করে নিরন্তর নানা বাধার সৃষ্টি করে থাকি। এইভাবেই সূচনা হয় শিশুর ও পূর্ণবয়স্কের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান, যার ফলে শিশুর বিশ্বাসনিষ্ঠ স্বভাবটি ক্ষুণ্ণ হয়। ক্রমে ক্রমে সে আমাদের কাছে হয়ে ওঠে দুর্ব্বোধ্য।

বহু সহস্র বৎসরের সামাজিক বিবর্ত্তনের ফলে যে সভ্যযুগে আজ আমরা বাস করছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে শিশুকে অনেক অভিজ্ঞতাই আহরণ করতে হয়। একখণ্ড প্রস্তরকে শিল্পী যেমন হাতুড়ির আঘাতে ক্রমে ক্রমে সুন্দর মূর্ত্তিতে পরিণত করেন, তেমনি শিশুর আদিম প্রবৃত্তিগুলি তার নিজস্ব পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে সামাজিক রূপ ধারণ করে। এই সময়ে শিক্ষানীতি, সমাজবিধি ও আইনশৃঙ্খলার নাগপাশে তার হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধা দেওয়া উচিত নয়, কেননা এতে ভাবের প্রবাহগুলি ব্যাহত হয়ে শিশুচিত্তে এক বিরাট বিক্ষোভের আবর্ত্ত সৃষ্টি করে এবং তারই ফলে তার মনের তলদেশটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে। পূর্ণবয়স্ককে মেনে নিতেই হবে যে শিশু গৃহের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িত, গৃহপরিবেষ্টনেই তার চরিত্রের উন্মেষ, গৃহ হতে তাকে দূরে রাখলে গৃহধর্ম্মই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যাতে পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদান প্রদানে, হাস্য-পরিহাস্যে, কথোপকথনে শিশু স্বাভাবিকরূপে বিকাশলাভ করতে পারে, এমন আনুকূল্য করাই হলো পূর্ণবয়স্কের কর্ত্তব্য।

জন্ম হতেই শিশুর আচরণ কোন্ পথে আঘাত পেয়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে। নবজাত শিশু সময়মত আহার ও বিশ্রাম করতে এবং স্বাভাবিকভাবে মলমূত্রাদি ত্যাগ করে সুস্থ শরীরে বৃদ্ধি পেতে চায়। এই তিনটি জৈব প্রয়োজনেই সে পায় নানাপ্রকার বাধা এবং তাতেই তার ব্যক্তিত্ব প্রতিরুদ্ধ হয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। জন্মের প্রথম নয়মাস কাল শিশুর প্রধান খাদ্য হলো মাতৃদুগ্ধ। অনেক সময়ে মাতার অপুষ্ট দেহ হতে শিশু যথেষ্ট আহার পায় না কিংবা উপযুক্ত আহার্য্যের অভাবে মাতৃদুগ্ধ শিশুর উপযোগীও হয় না। এমন ক্ষেত্রে শিশু হয় স্বল্পাহারে,

না হয় উদরাময়ে কষ্ট পায়। যে শিশু এইভাবে তার জন্মগত অধিকার হতে বঞ্চিত হয়—তার স্বভাবের মাধুর্য্য যে নষ্ট হয়ে যাবে, বা বঞ্চনাক্লিষ্ট মনে হিংসার ও ক্রোধের সঞ্চার হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি ? ঠিক সময় পানাহারে শিশুকে পরিতৃপ্ত করা যে তার দেহমনের জন্য নিতান্তই প্রয়োজনীয়, একথা গৃহস্থ-পরিবারে অনেকেরই জানা নাই। গৃহস্থালীর কাজে জননী এমনভাবে জড়িয়ে থাকেন যে স্তন্যদানের সময়ে তিনি যে স্থির, ধীর ও শান্ত হয়ে শিশুকে তৃপ্ত করবেন এমন অবসরও তাঁর হয় না এবং যেটুকু সময় তাঁকে শিশুর জন্য ব্যয় করতে হয় সেটুকু সময় যেন অপব্যয় করা হলো বলেই তিনি মনে করেন। শিশুর আনুভূতিক ক্ষমতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সে জননীর এই ব্যস্ত-সমস্ত ভাবটি অতি সহজেই অনুভব করে এবং তিনি যে কোনমতে কাজ সেরেই তাকে ফেলে চলে যাবেন, এই আশঙ্কার বীজ এখন হতেই তার মনে উপ্ত হয়। নিরাপত্তাবোধ জীবনবিকাশের একটি প্রধান উপাদান। বহুক্ষেত্রেই এই উপাদানের অভাবে শিশুর মনে একটি ক্লিষ্টভাব থেকে যায়। চাকুরীর অজুহাতেই হোক বা সংসারের দাবীতেই, হোক, জননী যদি শিশুসন্তানকে একটি ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের অঙ্গ বলে মনে করেন, তাহলে ভবিষ্যতে যদি সেই শিশু তার প্রাপ্য স্নেহযত্নের অভাব অন্যক্ষেত্রে ও বিভিন্ন উপায়ে পূর্ণ করতে চেষ্টা করে তাহলে—অপরাধী কে ?

নয়মাস বয়সের পরে ক্রমে ক্রমে শিশুর স্তন্যপানের অভ্যাস কমে আসে। এই সময়টি শিশুর জীবনে একটি সঙ্কটময়কাল। জননীর কোলের উত্তাপ, আলিঙ্গন, কথাবার্ত্তা ও সাহচর্য্য হতে বঞ্চিত হয়ে সে নিজেকে বড় অসহায়বোধ করে। এখানে মা ও সন্তান—এই উভয়কে অবলম্বন করে যে বাৎসল্যরসের প্রবাহ, সেই প্রবাহে একটা ছেদ পড়ে। ক্ষুধা ও ভোগবাসনা মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। এই দুই প্রবৃত্তির নিগ্রহে শিশু বিহ্বল হয়ে পড়ে, তাই তার মধ্যে এই সময়ে আক্রোশ-পরায়ণতা প্রকাশ পায়। যাতে সে এই সঙ্কটময় কাল সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারে এর জন্য চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বহু যত্ন ও সাবধানতার সহিত তার জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে পরম আদরে শিশুদেবতাকে তুষ্ট করতে হবে। কিন্তু সেই যত্ন ও পরিচর্য্যা করবার আমাদের শিক্ষা বা অবসর কোথায় ? যখন আমরা মনে করি যে শিশু মাতৃদুগ্ধ ভিন্ন অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের উপযুক্ত হয়েছে তখন আমরা তাকে সহজেই পূর্ণবয়স্কের পর্য্যায়ে ফেলি। সকলের সঙ্গে সমানভাবে ঝালমশলা দিয়ে তার জন্য রান্না হয়, অনেক রাত্রে তাকে টেনে তুলে খাওয়ানো হয় এবং তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়িও করা হয়। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে অন্নব্যঞ্জন এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে,

কিন্তু তাও আমরা ক্ষমার চক্ষে দেখি না। শিশুর খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে এত রকম অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় যে মনে হয় আহার করা বুঝি একটি অস্বাভাবিক কাজ, অনাহারে থাকাই বুঝি স্বাভাবিক। বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু এমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে আহার করে যে সেই পরিবেশটির উপরে তার একটা বিতৃষ্ণা জন্মায় এবং তারই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় আহার্য্যের উপরে। (১)

নিদ্রার বেলাতেও দেখি প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটে থাকে। শিশুর ঘুমের যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় ও ছন্দ আছে—এই সত্যটি প্রায়ই আমাদের লক্ষ্যের অগোচরে থেকে যায়। সে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে ঢলে পড়লে তবেই জননীর সেদিকে দৃষ্টি পড়ে। শিশুর ঘুম হওয়া চাই শান্ত ও আরামদায়ক পরিবেশে এবং সম্পূর্ণ নির্ভাবনায়। ছেলেবেলা থেকেই তার মনে অন্ধকারের ভয়, ভূতের ভয়, একা থাকার ভয় বা পিতামাতার অনুপস্থিতির ভীতি যেন কোনমতেই সঞ্চারিত হতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। এই বয়স থেকে শিশুর মনে অহেতুক ভীতির সঞ্চার হলে অনেক সময়েই সেই ভয় কাটে না এবং পরে সে নানা অসুবিধায় পড়ে।

শুতে যাওয়ার সময়ে সব শিশুই মায়ের সঙ্গ চায়—গান, গল্প, ছড়া শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঢলে পড়তে কোন্ শিশুর না ভালো লাগে? অথচ সন্ধ্যাবেলায় জননীর কোথায় সেই অবসর? ঘরসংসারের কাজে তিনি তখন এত ব্যস্ত থাকেন যে সংসারের গতি থামিয়ে দিয়ে শিশুর মনোরঞ্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ম্মক্লান্ত পিতার তখনই যা একটু অবসর—সেই সময়টুকু শিশু-সন্তানের জন্য ব্যয় করা অনেকেরই মনে থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে সন্তানকে আদর করে ঘুম পাড়াতে মায়ের মন চাইলেও, কোন্ দোহাই দিয়ে গৃহকর্ম্ম স্থগিত রাখবেন তিনি? গৃহের প্রাণকেন্দ্র যে শিশু, যাকে ঘিরে গড়ে ওঠে আমাদের সকল কর্ম্মব্যঞ্জনা—তারই জীবন বিকাশে পিতামাতার পূর্ণ সাহায্যের অভাব থেকে যায়।

জন্মকালে দৈহিক প্রক্রিয়ার উপরে শিশুর কোন অধিকার থাকে না। সে প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই মলমূত্রাদি ত্যাগ করে, কাজেই এই সকল বিষয়ে

১"অবাধ খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ"—অধ্যায়ে কানুর দৃষ্টান্ত দেখুন।
—সমাজ ও শিশুশিক্ষা—প্রতিভা গুপ্ত।

দ্রষ্টব্য :—এই অধ্যায়ে যে শিশুদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের নাম প্রয়োজনমত বদলে দেওয়া হয়েছে।

তার সুঅভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে সম্পূর্ণ পিতামাতার উপরে। ঠিক কোন্ বয়সে শিশু সম্পূর্ণ একাকী শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে তা বলা সহজ নয়। প্রত্যেক শিশুরই ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার উপরে এই অভ্যাসটি নির্ভর করে। খুব অল্প বয়সে তাকে তাড়না করেও কোন লাভ নাই, কিন্তু বেশী বয়স পর্য্যন্ত তার শিশুর মত আচরণ করাও উচিত নয়। মনে হয়, দুই হতে আড়াই বৎসরের মধ্যে সুস্থ ও সাধারণ শিশুর এই অভ্যাসটি বেশ ভালোভাবেই গড়ে ওঠে। অভ্যাসটি যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য চাই অসীম ধৈর্য্য ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। শয্যাবস্ত্রগুলি ময়লা হলো বলে কিংবা ঘর-দ্বার ধুতে হবে বলে অনেক সময়েই শিশুকে তার অনাবধান ব্যবহারের জন্য তাড়না করা হয়। এ তাড়না হতেই সুরু হয় শিশুর দুশ্চিন্তা—অবহেলা, অপমান ও ক্ষমাহীন সংঘাতে দেখা দেয় তার মানসিক অশান্তি। সভ্য-সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য তার তো চেষ্টার ত্রুটি নাই, তবুও যদি তার কোন অপরাধ ঘটে, তাকে ক্ষমার চক্ষেই দেখা উচিত, স্নেহহীন বিচারের দ্বারা তাকে পদে পদে বিদ্ধ করে তার জীবনকে বিড়ম্বিত করে তোলা উচিত নয়।

আহার, নিদ্রা ও মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসটি বেশ ভালোভাবে গড়ে উঠলে পর, তবেই সচরাচর শিশুরা শিক্ষায়তনে আসে। আমরা জানি যে রাগ, দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি প্রক্ষোভগত আচরণ সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর মধ্যে সহজেই প্রকাশ পায়। শিশুকেন্দ্রে শিক্ষিকা যদি সর্ব্বদাই সজাগদৃষ্টিতে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাহলে তিনি নানা উপায়ে তাদের বিক্ষোভজনিত ব্যবহারগুলিকে উন্নতির পথে চালনা করতে পারবেন। প্রত্যেক শিশু যখন প্রথমে শিশুকেন্দ্রে আসে, তখন শিক্ষিকা তার সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জেনে নেবেন। যেমন শিশুটি সচরাচর কার সঙ্গে খেলা করে? তার খেলার সঙ্গীরা তার চেয়ে বয়সে বড় হলে তারা হয়তো তাকে সর্ব্বদাই অনুকম্পার চক্ষে দেখে, তেমনি সে নিজে যদি সঙ্গীদের অপেক্ষা বড় হয় তাহলে ছোটদের উপর অত্যাচার করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আবার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধূলা করলেও যদি তার জননী সদাসর্ব্বদা তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, কলহ-বিবাদের মীমাংসা করে দেন তাহলে সে হয়তো হয়ে পড়েছে পরমুখাপেক্ষী। পিতামাতা ভিন্ন অন্য কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর সঙ্গে বাস করেন কিনা, করলে তার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধে কিরূপ—এ সকল তথ্য জানতে পারলে শিক্ষিকার পক্ষে শিশুকে পরিচালনা করা সহজ হবে। শিশুটির স্বাস্থ্য, বয়স, পূর্ব্ব-ইতিহাস প্রভৃতিও জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষিকা বুঝতে পারবেন যে শিশুটি শিক্ষা-কেন্দ্রের অন্য শিশুদের বা শিক্ষিকাগণের সহিত কিভাবে মেলামেশা

করবে। সকলের প্রতি তার অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যবহারের কারণটিও তাঁর চক্ষে সহজেই ধরা দেবে।

শিশুনিকেতনে নানা ধরনের ছেলেমেয়ে আসে। এদের মধ্যে অধিকাংশ জনেরই ব্যবহার সহজ ও সুন্দর। এই অধ্যায়ে তাদের বিষয় কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সব ছেলেমেয়েদের মনে কোন না কোন প্রতিরুদ্ধ বেদনার পরিচয় পাওয়া যায় তাদেরই কথা এখানে বলবো। দুই, আড়াই বৎসরের বয়সের শিশুদের মধ্যে একটা নেতিভাবমূলক (negativism) ব্যবহারের প্রকাশ দেখা যায়। বলা হলো, "মণি এবারে খাবে।" শিশু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "মণি খাবে না।" অনেক পিতামাতা আমাকে এসে বলেছেন, "আপনাদের এখানে আসার আগে খোকন বেশ কথা শুনতো, এখন সব কথাতেই অবাধ্য, সব তাতেই 'না'।" বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ আচরণের নানা কারণ দেখিয়ে থাকেন। প্রথমতঃ, দুই বৎসর বয়স হতে শিশু ক্রমে ক্রমে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সুরু করে, তার হাঁটা চলার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং নব নব অভিজ্ঞতায় তার সুকুমার মনটি পূর্ণ হতে থাকে। কাজেই এখন থেকে তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ইচ্ছা বেশ সুস্পষ্ট হয়। এই সময়ে তার ব্যক্তিত্বের উপরে হস্তক্ষেপ হলে সে প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। একটা উদাহরণ দিই—বাড়ী মেরামত হবে, দেওয়ালে ভারা বাঁধা হয়েছে, আড়াই বৎসরের রাণা মজুরদের সঙ্গে ভারা বেয়ে উঠছে। ভীতা, ত্রস্তা জননী তৎক্ষণাৎ রাণাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে নিষেধ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গিয়ে তাকে নামিয়ে আনলেন। তার পরদিন পিতামাতা দুজনেই আমাকে এই ঘটনাটি উল্লেখ করে বললেন যে, "রাণা ভয়ানক দুরন্ত হয়েছে তার দিকে একটু নজর রাখবেন।" রাণাদের দোতালা বাড়ী, সারাদিনের মধ্যে বোধ হয় পঁচিশ-বার সে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে, কাজেই বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা যে অন্যায়, সেই বোধই তার মধ্যে জন্মায় নি। এছাড়া রাণা কতদূর উঠতে পারে, ধৈর্য্য ধরে দেখলে দেখা যেতো যে, সে তার ক্ষমতা অতিক্রম করে কখনই সিঁড়ি বেয়ে উঠতো না। তার সঙ্গে যে মজুররা ছিল তাদেরও স্বাভাবিক হিতাহিত জ্ঞান আছে—কাজেই এই ক্ষেত্রে পিতামাতার যে আকুলতা তাতে তাঁদের নিজেদেরই দুর্ব্বল চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তারপর যে ভারা বেয়ে শিশু উঠতে পেরেছে, সেই ভারা বেয়ে তাকে নামতে দিলে শিশুর মধ্যে কৌতুকবোধ জাগতো, পিতামাতার নিকটে "বাহাদুরী" নেওয়াও তো শিশুর পক্ষে আমোদজনক। কিন্তু জোর করে তাকে নামিয়ে আনতে তার মধ্যে বিদ্রোহাচরণের প্রথম বীজটি বপন করা হলো, এবং অঙ্কুরেই তার আত্মবিশ্বাসের মূলটিও নষ্ট করা হলো।

দ্বিতীয়তঃ, এই বয়সে অনেক নূতন অভিজ্ঞতার মর্ম্ম শিশু বুঝতে পারে না, অনেক কাজে সে তখনও দক্ষতালাভ করে নি, অনেক কাজ সে একাকী করতে চায়, অথচ সম্পূর্ণ সুযোগ পায় না। এই অসুবিধাগুলি সে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। তার মনে একটা সাড়া জাগে, সে খুব বড় করেই বলতে চায়, জলস্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়ে বলতে চায় কিন্তু কথা দিয়ে তো সেই ইচ্ছার অভিব্যক্তি দেওয়া যায় না তখন তার ব্যবহারে একটি নেতিবাচক ভাব দেখা দেয় এবং একটি মাত্র প্রবল "না" দিয়ে সে তার সমস্ত মনের ইচ্ছাটি ব্যক্ত করে।

বলপ্রয়োগ করে এই বিদ্রোহাচরণ দূর করা যায় না। একটি চিত্রের মধ্যে থাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ, সমগ্র ছবিখানির পক্ষে তার প্রত্যেকটি অপরিহার্য্য, বিচ্ছিন্নভাবে সেই অংশগুলির যেমন কোন মূল্য নাই, তেমনি শিশুকে তার আচরণ হতে পৃথক করে দেখলে চলবে না—তার বিদ্বেষাচরণের সমগ্র কারণটি খুঁজে বার করে তবে তার মানসিক অবস্থা বিচার করতে হবে। দেবী ও সেপাই তিন বৎসর বয়সে স্কুলে আসে। তারা জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন। প্রথমদিন বেলা সাড়ে বারোটার পরে, বিনা আপত্তিতেই তারা মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দেখা গেল, তারা বাড়ীতে দুই আড়াই ঘণ্টার উপরেই ঘুমায়, কেননা অন্য শিশুরা আড়াইটার পর বাড়ী চলে যাওয়ার পরেও তারা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। তাদের বাড়ী থেকে লোক এসেছে নিতে, সে দূরে গাছতলায় বসে আছে, শিক্ষিকা অন্য ঘরে বসে কাজ করছেন, এমন সময়ে দেবীর ঘুম ভাঙ্গলো। দেবী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে সেপাইও কাঁদতে সুরু করলো। এই সামান্য ঘটনার ফল কি হলো দেখা যাক। তার পরের দিন দুই ভাই-বোনে হাত-ধরাধরি করে আসছে এবং চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এক সুরে বলছে "আজ আমরা ঘুমাবো না—আজ আমরা ঘুমাবো না।" তাদের ছেড়ে সকলে চলে যাবে, আর তারা একা পড়ে থাকবে জনশূন্য বিদ্যালয়গৃহে, এই আশঙ্কায় তাদের শিশুচিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে কোনই লাভ নাই। আশঙ্কার অঙ্কুরটি যতক্ষণ না সমূলে উৎপাটিত হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিশুকে জোর করে সেই কাজটি করানো অনুচিত, কেননা এতে কেবল তাকে জেদী করে তোলাই সম্ভব।

এমনও দেখা যায় যে কোন কোন শিশু বড় সহজেই কাঁদে। কেউ প্রত্যেক কাজে "বাহবা" না পেলে কাঁদে, কেউ বা হাত পা ছড়িয়ে কেঁদে খেলনা, খাবার বা দুই একটি পয়সা আদায় করে, কেউ সামান্য আছাড় খেলে কাঁদে, কেউ বা খেলায় হেরে গেলে কাঁদে। এই অকারণ ও সহজ কান্নার কত যে কারণ আছে তার ইয়ত্তা নাই সেই কারণগুলি নির্ণয় করতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে

যে শিশুর শরীর অসুস্থ কিনা, কেননা দুর্ব্বল শরীরে বড় সহজেই কান্না পায় তারপরে তার পিতামাতার সঙ্গে আলাপ করে জানতে হবে যে তাঁরা অতি সহজেই শিশুর "বায়নাগুলি" মেনে নেন কিনা—যে শিশু বায়না ধরে কেঁদে সহজেই জেতে, সে জানে যে কেঁদেই সে সব কাজ উদ্ধার করে নিতে পারবে। এই অকারণে কান্নার স্বভাবটি শৈশবেই শুধরে ফেলা উচিত, নতুবা বয়স হলে শিশু জিদ ও বায়না ধরে এমন অনর্থের সৃষ্টি করবে যাতে তার শরীর ও মনের উপরে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ছাপ পড়বে। শিশু যখন জিদ করে, তখন মারধোর করা উচিত নয়, এতে হিতে বিপরীত ঘটে। সেই সময়ে দেখতে হবে যে শিশুর জিদ বা বায়নার মধ্যে যথার্থ কোন কারণ আছে কি না—যদি সে অহেতুক জিদ প্রকাশ করে, তাহলে তাকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। শিশু অন্যায় করেছে বলে তাকে তার পিতামাতা আর ভালোবাসেন না এমন ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। কেঁদে কেঁদে শিশু ক্লান্ত হলে, তাকে আদর করে জল খাইয়ে, মুখ ধুইয়ে শান্ত করলে সে হয় ঘুমিয়ে পড়বে না হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করবে।

অনেক শিশু নিজের কৃতিত্বের প্রশংসা শুনে এমনই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে প্রত্যেক কাজেই তাকে "বাহবা" না দিলে সে কেঁদেকেটে অনর্থ ঘটায়। শিশুর রূপ, গুণ বা ক্ষমতার অত্যধিক প্রশংসা না করাই ভালো। শিশুকে প্রত্যেক কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত একথা যেমন সত্য, অন্যের গুণ গ্রহণ করতে শেখানোও যে যথার্থ সামাজিক শিক্ষা, তাও তেমনি সত্য। সে কখনও কাজকর্ম্ম করে অন্যের প্রশংসাভাজন হবে, কখনও বা দর্শক হিসাবে অন্যের কাজে আনন্দ প্রকাশ করবে—এইরূপে শৈশব হতেই তার অহংবোধের একটি সীমা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

শিশু যাতে সহজেই রেগে না ওঠে সেদিকেও আমাদের সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। দাঁত ওঠার সময়ে বা খাওয়ার অনিয়মে শিশুর স্বভাব খিট্‌খিটে হয়ে যায়। বারবার রোগ ভোগ করলে বা বাড়ীতে অশান্তি দেখলে তার মনের স্বাভাবিক মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া দেখা যায় যে, স্নানের সময়ে জল নিয়ে খেলতে গিয়ে সে বাধা পায়, ভাত খেতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেললে সে বকুনি খায়, নিজে কাপড়জামা পরতে চায়, অথচ দেরী হবে বলে মা পরিয়ে দেন। কাজল, টিপ মুছে গেলে মা বিরক্ত হন। একটু বেশীক্ষণ খেলতে চায় শিশু, তাতেও সে আপত্তি শোনে—খাটের তলায়, আলমারীর পিছনে বা পকেটে দুই চারিটি টিকিট, কাঁচের টুকরো জমেছে বলে মা বিরক্তি প্রকাশ করেন। বাবার জিনিষে হাত দিলে চড় চাপড়টাও খায়। সত্য কথা বলতে কি, পিতামাতার অধৈর্য্য-

পরায়ণতা দেখে শিশু নিতান্তই বিহ্বল হয়ে পড়ে, সে মনে করে তার অস্তিত্বটাই বুঝি দোষের। যাঁরা তাকে এত ভালোবাসেন, তাঁরা তার প্রিয় খেলা বা খেলনাগুলিকে কেন স্নেহের চক্ষে দেখেন না—এই দ্বন্দ্ব তার আর কোনমতেই মেটে না। তার মনের কোণে জমতে থাকে বিরক্তি ও আক্রোশ, তারপর একদিন ধূমায়িত অগ্নির বিস্ফোরণ হয় বিপুল কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে। যে শিশু কেঁদেকেটে তার মনের দুঃখ প্রকাশ করে ফেলে সে তো মুক্তি পেলো, কিন্তু যে মনের মধ্যে আক্রোশ চেপে রাখে, সে ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় বিপদ সঞ্চয় করে রাখলো—কেননা, এই শিশুই হয়তো একদিন হিংসার বশবর্তী হয়ে পৃথিবীতে ধ্বংসের লীলাক্ষেত্র রচনা করবে।

শিশুনিকেতনে আর এক ধরনের ছেলেমেয়ে আসে যারা সব সময়েই আত্ম-প্রকাশ করতে সঙ্কোচবোধ করে। এইরূপ শিশুরা সর্ব্বদাই মনে করে যে তারা দুর্ব্বল, হীন ও অক্ষম। এই যে হীনমন্যতা, এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের অক্ষমতার জন্য নয়, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাবেই এমনতর ঘটে থাকে। শিক্ষিকা সযত্নে তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবেন নানা কাজকর্ম্মের মাধ্যমে, উৎসাহের দ্বারা খেলাধূলায় প্রেরণা দেবেন এবং তাদের সামাজিক গুণগুলি যাতে সহজেই বিকশিত হয়ে ওঠে এইজন্য নানা সহজ কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও তাদের উপরে ন্যস্ত করবেন। যেমন, অঞ্জলি বাস্তহারা বৃহৎ পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা। দেখতে শুনতে সে ভালো নয়, জামাকাপড় তার ছেঁড়া ও বিশ্রী, বেশীর ভাগ দিনই তার জলখাবার থাকে না—ভারী ভয়ে ভয়ে কেমন যেন দোষীর মত সে দিন কাটায়। একটু সুযোগ পেলেই খুব চুপি চুপি পাশের মেয়েটিকে সে চিমটি কাটে বা একটি পেন্সিল লুকিয়ে রাখে জামার নীচে। লক্ষ্য করা গেল যে, অঞ্জলির গানের গলাটি ভালো। অমনি তাকে গানের সময়ে দলের মূল গায়িকারূপে মনোনীত করা হলো। প্রথমে সে তো কোনমতেই একাকী গান গাইবে না কিন্তু বারবার উৎসাহ দেওয়াতে সে রাজী হলো। দিন কয়েক ধরে সে নাচে, গানে ও আবৃত্তিতে প্রথম ও প্রধান স্থান গ্রহণ করাতে ক্রমে ক্রমে তার আত্মপ্রত্যয় জন্মালো। এইভাবে শিশু-সমাজে সে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তার ব্যবহার হলো সহজ ও সাবলীল।

অকারণে মিথ্যা কথা বলে এমন দুই একটি শিশুও যে আমাদের শিশুনিকেতনে আসে না, এমন নয়। মিথ্যাভাষণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, শিশুদের সব মিথ্যাই যথার্থ মিথ্যা নয়। তাদের কল্পনা-প্রবণ সুকুমার চিত্তে যে রঙ সহজেই ধরা দেয়, সেই রঙ আমাদের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হয় না। তারা মানসক্ষে যাচা দেখে তাইতার বর্ণনা করে তাদের

অক্ষম ভাষায়, আর আমরা মনে কার শিশু বুঝি মিথ্যা বলছে। যে কথা আমাদের কাছে অসত্য বলে প্রতীয়মান হয়, বিচার করে দেখতে হবে যে তার মধ্যে কোন হীন প্রবঞ্চনার ভাব আছে কিনা। আত্মশ্লাঘা বা স্বার্থপরতার ভাবে যদি শিশু মিথ্যা কথা বলে, তবে তার ব্যবহার সত্যই দূষণীয়। তার মিথ্যাভাষণের মূল কারণটি কি শিক্ষিকাকে অতি সাবধানে খুঁজে বার করতে হবে। শিশুর কাছে ও সামনে অতি সাবধানতার সহিত কথাবার্ত্তা বলা উচিত। পিতামাতা ও অভিভাবকগণ নানাভাবে সত্যের অপলাপ করেন বলে শিশুরও কুশিক্ষা হয়। অভাব অনটনে ভরা সংসারে শিশু তার বঞ্চনা-ক্লিষ্ট ও অভাব-পীড়িত মনকে মিথ্যা কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করে। কাজেই প্রত্যেক মিথ্যার পশ্চাতে যে নির্দ্দিষ্ট কারণটি লুকিয়ে আছে, সেই বিশেষ কারণটি দূরীভূত করলেই শিশুর মিথ্যাভাষণের অভ্যাসও ক্রমে ক্রমে চলে যাবে।

কোন কোন শিশু আবার বড় নিষ্ঠুর হয়। কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী এমন কি অন্য শিশুদের উপরে দৈহিক আঘাত করতেও তারা ইতস্ততঃ করে না। এইরূপ ব্যবহারের দুই তিনটি কারণ আমার চোখে পড়ে। একটি হলো এই বয়সে শিশুর বেদনাবোধ বা মৃত্যুভয় যথেষ্ট জাগ্রত হয় না বলেই বোধ হয় তারা অন্যের কষ্ট সম্বন্ধে তেমন সচেতন নয়। দ্বিতীয়তঃ, গৃহে অন্য কোন বা নূতন শিশুর আবির্ভাবে তাকে হয়ত তার পূর্ব্বের মত যত্ন করা হয় না—এ ক্ষেত্রেও শিশু প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ, এই বয়সে শিশুর কৌতূহলস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র। সে প্রত্যেক জিনিষই নেড়ে চেড়ে দেখতে চায়, কীট-পতঙ্গাদির আচরণে কৌতূহল বোধ করে এবং সেইজন্যই সে তাদের টিপে, মেরে, ছিঁড়ে দেখবার চেষ্টা করে, কাঠি দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে, ধরতে না পারলে লাঠি দিয়ে মারে কিন্তু সেই পোকাই যদি বাক্সে করে শিশুকে দেখাশুনা করতে দেওয়া হয়, তা হলে সে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে পোকাটিকে খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে। মনে আছে, গ্রামোফোনের চোঙ্গের ভিতরে কে কথা বলছে দেখবার জন্য ছেলেবেলায় আমার দাদা একটি দামী যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলেন। কাজেই শিশু যে কৌতূহলাক্রান্ত হয়েই নানা জিনিষপত্র নষ্ট করে কিংবা কীটপতঙ্গের অনিষ্ট করে, একথা মনে করাই সমীচীন। তবে এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণের কারণ অন্বেষণের পর উপযুক্ত উপায়াদির দ্বারা তাকে দয়াদাক্ষিণ্য, সহানুভূতি ও স্নেহমমতা প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

শিশুকে শাসন করলে সে যখন নিষ্ক্রিয় অথচ প্রবল বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে তখন আমরা তাকে 'একগুয়ে' বলি। ছেলেবেলা হতে সামান্য কারণে

অতিরিক্ত শাসনের ফলে শিশু অনেক সময়েই একগুঁয়ে হয়ে যায়। একগুঁয়েমি দোষটি অবাধ্যতা হতেই প্রসূত, কাজেই শিশু অবাধ্য হয় কেন সেটাই প্রথমে বিচার করতে হবে। হয়তো যে সময়ে তাকে কোন আদেশ করা হলো, সেই সময়ে তার শরীর ও মন এমন ক্লান্ত হয়ে আছে যে নূতন কোন আদেশ মানবার তার আর শক্তি নাই। কিংবা হয়তো একসঙ্গে অনেকগুলি আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে সে কোনটাই ঠিকমত পালন করতে পারে নি। আমাদের আদেশের ভাষাও সে অনেক সময়ে ঠিকমত বুঝতে পারে না কিংবা বুঝতে পারলেও আদেশমত সম্পূর্ণ কাজটি করবার তার শরীর ও মনের পরিণতি হয় নি। পাঁচ বৎসরের সুভাষকে আধঘণ্টা চুপ করে বসে নীরস অঙ্ক কষতে বলা তার পক্ষে নিতান্তই শাস্তির সামিল, কাজেই সে যে অবাধ্য হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? বাপীর হাতে প্লাষ্টিকের খেলানাটি দিয়েই বলা হলো "দেখো ভাঙ্গে না যেন।" চোখের সামনে একথালা নাড়ু রেখে বুবুকে বলা হলো, "এখন পাবে না, বিকেলে খেয়ো।" এরূপ আদেশ রীতিমত অন্যায় ও নির্ম্মম। তারপরে দেখতে হবে শিশু আদেশটি ঠিকমত শুনেছে কিনা—তার সজীব মন নানা চিন্তায় হয়ে থাকে বিক্ষিপ্ত, নানা কৌতূহলে থাকে ভরা অথচ নিজের খেয়ালখুসী মত ঘুরে ফিরে বেড়ানোর স্বাধীনতা তার নাই বললেই চলে। পূর্ণবয়স্কের আদেশের ফাঁকে ফাঁকে সে কোনমতে নিজের ধ্যানধারণা অনুযায়ী খেলাধূলা করে তৃপ্ত হয়। যে শিশু বেশী কল্পনাপ্রবণ, তার মন বাস্তব জগতে বেশীক্ষণ বাঁধা পড়ে থাকতে চায় না আর তখনই লাগে সংঘাত। পূর্ণবয়স্কের সঙ্গে এই নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই শিশু ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে একগুঁয়ে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির আদেশ অমান্য করে। এরূপ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ কেমন তাও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। বাবা যদি আপিস থেকে এসেই শুনতে পান যে মণি মায়ের একটিও কথা শোনে নি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে মণির মায়েরও কোথাও গলদ আছে। তিনি হয়তো অত্যন্ত অধৈর্য্য, হয়তো গৃহস্থালির কাজে হয়ে থাকেন ক্লান্ত কিংবা অভাব অনটনে, কি গৃহ পরিজনের ব্যবহারে বিব্রত, কাজেই তাঁর সমস্ত বিরক্তি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় অসহায় শিশুটির উপরে। শিশুর অবাধ্যতার কারণ অন্বেষণে সমস্ত দিক বিচার করতে হবে তা না হলে তাকে সংশোধন করা মোটেই সম্ভব নয়।

শিশুরা সুযোগ পেলেই যাতে অন্যায় না করে এ বিষয়েও পিতামাতা ও শিক্ষিকাকে অবহিত হতে হবে। যেমন, মাস ছয়েক হলো আমাদের স্কুলের

চারিপাশের মাঠ পরিষ্কার করে, গাছের ডালপালা ছেঁটে নূতন বাগান তৈরী করা হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে এ সকল কাজে যোগ দেয়। একদিন সুভাষ, পান্না ও নির্ম্মল—তিনটি বেতের মত ডাল নিয়ে দৌড়ে এল অন্য ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করবে বলে। শিক্ষিকা তৎক্ষণাৎ বললেন, "চল ঝিলে মাছ ধরতে যাই, এই ডালগুলো দিয়ে বেশ ভালো ছিপ তৈরী করা যাবে।" আর একদিন অনুরূপ ঘটনাতে শিক্ষিকা ডালপালা দিয়ে ফুলবাগানের বেড়া তৈরী করতে উৎসাহ দিলেন শিশুদের। ধ্বংসাত্মক বা হিংসাত্মক ব্যবহারকে কিভাবে সৃজনাত্মক কাজে পরিণত করা যায়, এই দুই-একটি ঘটনা হলো তারই উদাহরণ।

অনেক ছেলেমেয়ে স্বভাবে বড় লাজুক, ইচ্ছা থাকলেও সহজে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলা করতে পারে না। যেমন ছিল আমাদের অনিল। মেয়েরা রান্নাবাড়ী খেলছে একমনে, এমন সময়ে অনিল এসে তাদের একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে পালিয়ে গেল। তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো মেয়েরা, "দিদিমণি, অনিল আমাদের ভাতের হাঁড়ি নিয়ে পালিয়েছে।" শিক্ষিকা অনিলকে ডেকে বললেন, "দেখ অনিল, মেয়েরা আজ ভালো বাজার করতে পারে নি, মাছ নেই, কপি কড়াইশুঁটি কিছু নেই, তুমি আজ এদের "বাবা" সাজো, বাজারের থলি নিয়ে বাজারে যাও, এই নাও পয়সা, এই নাও থলি। মঞ্জু, বাজার থেকে কি কি আসবে অনিলকে বলে দাও।" ব্যস্— আবার ভাতের হাঁড়ি চড়লো উনানে, বেশ জমে গেল খেলা।

শিশু যখন মনে করে যে তার পিতামাতা বা প্রিয়জন অন্য কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে বেশী ভালোবাসেন তখন তার আচরণে একটা রাগের ভাব প্রকাশ পায়। এই প্রকার বিরক্তি প্রকাশকে ঈর্ষা বলে। পরিবারের শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সমালোচনা করলে, নূতন ভাই বোন জন্মালে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের ফলে, কম মেধাযুক্ত শিশুকে মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তুলনা করে হাস্যাস্পদ করলে শিশুর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। ঈর্ষাপরায়ণ শিশু অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য প্রায়ই শৈশব অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। সে নূতন করে আঙ্গুল চুষতে বা বিছানা ভিজাতে সুরু করে। জামা-কাপড় পরতে পারে না, কথার অবাধ্য হয়, হঠাৎ রেগে ওঠে, লুকিয়ে ছোট ভাইবোনদের মারে, সরিয়ে দেয় বা বঞ্চিত করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করে।

তিন বৎসরের মুকুল একদিন দুপুরবেলায় তার ছয় মাসের ভাইকে কম্বল চাপা দিয়ে দেয়। মুকুল কেন ভাইকে চাপা দিল জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো, "ভাই কেন মার কাছে শোয়?" শিশুদের কল্পনামূলক খেলার মধ্যেও

এইরূপ ঈর্ষাপরায়ণতার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতী একটি পুতুলকে উনানের আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চায়, খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে সম্প্রতি তার একটি নূতন বোন হয়েছে। সেই বোনটিকে সে আগুনে পুড়িয়ে মেরে মায়ের স্নেহের উপরে আবার একাধিপত্য করতে চায়।

অনেক সময় পিতামাতার অসঙ্গত ব্যবহারের ফলে শিশুর মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তাঁরা নিজেরা জীবনে সাফল্যলাভ করবার জন্য একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। তাঁদের সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে কেবল তুলনামূলক আলোচনা শোনা যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে কে কাকে ছাড়িয়ে গেল, নিজেদের সন্তানগুলি অন্যদের তুলনায় হয় অত্যন্ত ভালো কিংবা নিতান্তই মন্দ, এইসব আলোচনার ফলে শিশুর মনে স্নেহপ্রবৃত্তির উন্মেষ না হয়ে ক্রমে ক্রমে অন্যকে অতিক্রম করবার ইচ্ছাই বলবতী হয়ে ওঠে, এবং এতে তার হৃদয়ের সুকুমার চিত্তবৃত্তি নিষ্পিষ্ট হয়ে ভবিষ্যতে সে যন্ত্রবিশেষ হয়ে পড়ে।

অবসাদজনিত ক্লান্তির ফলেও অনেক সময়ে শিশুর ব্যবহার হয়ে ওঠে অশান্ত। বিশেষ করে, বিদ্যালয়ে এমন উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। পরিবর্ত্তনের অভাবে একই ধরনের কাজ বা খেলা এমনই অরুচিকর হয়ে ওঠে যে পট-পরিবর্ত্তনের জন্য শিশু ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একই ধরনের অঙ্ক বা ভাষা-শিক্ষার পদ্ধতিতে, শিক্ষিকার একঘেঁয়ে গলার স্বরে তার মন অবসন্ন হয়ে যায়, সে তখন চায় নূতন কোন কাজ। সেই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সব শিক্ষিকার নজরে পড়ে না, তখন শিশু নিজেই উদ্যোগ করে নূতন কোন বিষয়বস্তুর অবতারণা করে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা তার এই আচরণকে অপরাধ বলে মনে করি। সে হয়তো কথার অবাধ্য হয়, কাজ করে না, হাই তোলে বা খেলা করে—ঠিক সেই সময়ে তার কাজের মধ্যে নূতন বৈচিত্র্যের সমাবেশ হলে সে পুনরায় উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে কাজে মন দেয়।

শিশুদের ব্যবহারে কোন প্রকার ত্রুটি বা ব্যতিক্রম দেখলেই যদি তাদের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে ধরে নিই তাহলে নিতান্তই অবিচার করা হয়। যে কোন বিকাশমান শিশুর মধ্যেই রাগ, মান ও অভিমানের প্রকাশ থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। শিশুর সামাজিক বিকাশের ধারা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সে জন্ম হতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবয়স্কের উপরে সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে। দুই হতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত সে অনেক সময়ে পূর্ণবয়স্কের আদেশ অমান্য করতে চায় এবং বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করে। তিন বৎসরের পরে সে ক্রমশঃ বড়দের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে। এই হলো পূর্ণবয়স্কের সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ। অন্যপক্ষে, সমবয়সী শিশুর প্রতি তার মনোভাব বড়ই বিচিত্র।

ছয় সাত মাস বয়স পর্য্যন্ত সে অপর একটি শিশুর উপস্থিতি বড় একটা লক্ষ্যই করে না, দুই বৎসর পর্য্যন্ত নিতান্ত উদাসীনভাবেই তার অস্তিত্ব মেনে নেয়। তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্য শিশুদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে এবং চার বৎসরের পর ক্রমে ক্রমে সে সকলের সঙ্গে খেলাধূলা করতে বেশ সুস্পষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে। কাজেই, একটি তিন বৎসরের শিশুকে সভামধ্যে একাকী একটি কবিতা আবৃত্তি করতে বললে সে যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে বা মায়ের কোলে অন্য একটি শিশুকে দেখে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাকে দুর্ব্বোধ্য শিশু (Problem child) বললে পূর্ণবয়স্কের অসহিষ্ণু স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

শিশুর চরিত্র গঠনে তার অন্ধ প্রবল প্রবৃত্তিগুলির মূলোচ্ছেদ করাই হলো সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—এরূপ ধারণা আজ আর নাই বললেও চলে। প্রবৃত্তিগুলি হলো স্বভাবের অঙ্গ, তাদের স্বীকার করে নেওয়াই উচিত এবং কল্যাণধর্ম্মের শাসনে তাদের নিয়ন্ত্রিত করাই হলো শ্রেষ্ঠ উপায়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসংস্কার প্রবন্ধে লিখেছেন, "ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষীর চাঞ্চল্য স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর। এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায় তবে—ইহাই একদিন চরিত্র ও বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতা সৃষ্টির প্রধান উপায়।" শাসনের নামে শিশুর চাপল্যকে স্তব্ধ করার অর্থ হলো প্রাণশক্তির মর্ম্মমূলে আঘাত করা,—গৃহে বা বিদ্যালয়ে যে বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করা হয় সেগুলির উদ্দেশ্য পীড়ন নয় কিন্তু সকলের মঙ্গলের জন্যই সেগুলি প্রচলিত করতে হবে। শিশুর সহিত যেখানে প্রাণের সম্বন্ধ থাকে সেখানে সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করা কঠিন নয়।

কবি বলেছেন, "ছেলেদের হাসি-কান্না প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই ; সেই ছুটিয়া চলা প্রাণের হাসি-কান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিষটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে—তার হাসি-কান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নহে। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোন বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে—"। শিশুর হাসিকান্নায় যখন সেই সহজ সুরটি বেজে ওঠে না তখন জানতে হবে যে শিশুর হৃদয়ে কোন এক গভীর দুঃখ স্তব্ধ হয়ে আছে। সেই দুঃখের ফলে

শিশুর মধ্যে যে ব্যবহারবিচ্যুতি দেখা যায় সেগুলিই হলো আধুনিক মনোবিদ-গণের বিশেষ গবেষণার বিষয়।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুর আচরণ সামাজিক না হয়ে ওঠে বরঞ্চ তার আবেগ অনুভূতি হয়ে ওঠে প্রবলতর, ব্যবহার আক্রোশপরায়ণ, হিংসাপূর্ণ ও বিকৃত—তখনই বুঝতে হবে যে তার পরিবেশ বা শিক্ষা, কোনক্ষেত্র হতেই সে প্রীতিজনক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই তার বিচারবুদ্ধি রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ, তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলির পরিণতি পিছিয়ে আছে এখনও সেই আদিম অবস্থায় এবং তার বয়স বাড়লেও তার মন রয়েছে অপরিণত। যে শিশুর দেহের বৃদ্ধি সুস্থ ও স্বাভাবিক, তার মনটি এমনভাবে বিকল হলো কি করে? এর উত্তর দিচ্ছেন মনোবিদগণ। মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলি কখনও নিবৃত্তিলাভ করে না, সেগুলি রূপপরিবর্ত্তন করে মাত্র। ফ্রয়েডের ভাষায় বললে বলা যায় যে, চেতনমানস আমাদের সম্পূর্ণ মনোজগৎ নয়। মনের কোন কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা চেতনলোকের মূল স্রোত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃহত্তর ও গভীরতর চিত্তভূমিতে, অর্থাৎ মনের অবচেতনে এবং অচেতনে গিয়ে স্থান পায়। এই আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রচলিত সমাজের দৃষ্টিতে দূষণীয়, সেগুলি সমগ্র চেতনমানসের সঙ্গে বিরুদ্ধতা করে, কেননা এই ইচ্ছা ও অনুভূতির মধ্যে স্থূলতা ও আবিলতা থাকলেও মানুষ সেগুলি পূর্ণ করতে চায় অথচ সেগুলি নিরুদ্ধ করে রাখাতে মন বিকৃত হয়ে ওঠে। যে শিশু বা ব্যক্তি মানসিক শক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ বিভিন্ন বিরুদ্ধ স্রোতকে একত্র ও সংহত করতে পারে না, সেই ব্যক্তিই মানসিক ব্যাধিতে কষ্ট পায়। চেতনমানসে এই নিরুদ্ধ কামনাগুলি কোন উপায়ে মুক্তি পেলেই তবে মানসিক বিকার আরোগ্য হয়।

শিশুর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তার আচরণেই তা বোঝা যায়। পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ভ্রাতা-ভগিনী ও বন্ধু-বান্ধবের উপরেই শিশুর বেশী বিরুদ্ধভাব থাকে, কেননা এঁরাই সচরাচর তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে থাকেন। গুরুজনদের বাধানিষেধের বিরুদ্ধে মনে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা সঞ্চিত হলেও সে নির্ভয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারে না; তাঁদের কথার অবাধ্য হওয়াও তার পক্ষে সহজ নয়; কেননা তাঁরা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, পরিচর্য্যাদির দ্বারা সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেন এবং স্নেহ-ভালোবাসার দ্বারা তৃপ্ত করেন। এছাড়া শিশু নিজেও তাঁদের ভালোবাসে, কাজেই তাঁদেরও দুঃখ দিতে তার মন চায় না। কিন্তু নিজের স্বাধীন ইচ্ছার প্রাবল্য এত বেশী যে তার গতি ব্যাহত হলে সে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ে। তার দুর্ব্বাধ্য প্রবৃত্তিসকল তখন প্রবল ঝড় তুলে চারিদিক তোলপাড় করে ফেলে। ভাবাবেশের এই আকস্মিক

আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত থাকে না তাই সে সহসা সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলে। পিতামাতা শিশুর এই অসহায় অবস্থা বুঝতে না পেরে শাসন, দমন ও পীড়নের দ্বারা শিশুর অবাধ্য প্রবৃত্তিগুলিকে পশুর মত সংযত করতে চান, কিন্তু বলের দ্বারা বলকে ঠেকিয়ে রাখা, কেবল উপস্থিত কাজ চালিয়ে নেওয়ার প্রণালী মাত্র। এতে হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবৃত্তিগুলি বীভৎস ও কদর্য্য হয়ে উঠে শিশুকে পাগল করে তোলে। অবিরত শাসনের দ্বারা পিষ্ট হয়ে, বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে তারা সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হতে পারে না এবং তখনই শিশু হয়ে ওঠে সমাজবিরোধী ও বিদ্রোহী।

রুদ্ধ অনুভূতির প্রবল উচ্ছ্বাসের সময়ে শিশুর সমস্ত আক্রোশটি গিয়ে পড়ে বাধাদানকারী ব্যক্তিটির উপরে। সে তখন চায় তাঁকে আঘাত করতে, একেবারে ধ্বংস করে দিতে, কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, কাজেই যে আঘাত সে পিতা বা মাতাকে দিতে চেয়েছিল, সেই আঘাত গিয়ে পড়ে তাঁদের প্রিয় বস্তুটির উপরে। মায়ের সংসার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে, তাঁর নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র ভেঙ্গেচুরে ফেলে তবেই শিশু শান্ত হয়। কিন্তু এতে ফল হয় মন্দ—জননীর শক্তি শিশুর শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। তিনি তার দুর্ব্ব্যবহারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেন না—তাকে কোন রকমে দণ্ড দেন। সেই দণ্ডের অভিজ্ঞতা যে মধুর নয় সে কথা শিশু ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে। সেইজন্য সে আর সহজে কান্নাকাটি করে না বা যথেচ্ছ ব্যবহারের দ্বারা আক্রোশ প্রকাশ করে না, তখন সেই আক্রোশপরায়ণতার সমস্ত রূপটি যায় বদলে। জননীর ব্যবহারের প্রতিবাদ সে জানায় অন্যভাবে—বিছানা না ভিজালে মা খুসী হন, কত যত্নে তিনি তাকে সময়মত মলমূত্রত্যাগ করতে শিখিয়েছেন, সেই সমস্ত যত্নের বিরুদ্ধে শিশুর অবচেতন মন প্রবল প্রতিবাদ জানায়। সে আবার বিছানা ভিজাতে সুরু করে, কাপড়জামা নষ্ট করে, নখ কামড়ায়—এই ভাবে সে বলতে চায়—চায় না সে এমন মাকে, চায় না সে তাঁর আদর ভালোবাসা—যে মা তার মনের গোপন ইচ্ছাটি বোঝেন না।

পাঁচ বছরের খুসী নখ কামড়ে কামড়ে পেটের অসুখ বাধিয়ে ফেলেছে। কোন প্রশ্ন করলেই সে এমন তোৎলামি সুরু করে, এমন ভীত চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যে দেখলে কষ্ট হয়। খুসীর মায়ের সঙ্গে আলাপ হলো—

"খুসীকে সকাল বেলায় কতক্ষণ পড়ান?" জননী হাসিমুখে জবাব দিলেন—"তা আর কতক্ষণ পড়াই, রান্নাঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘণ্টাখানেক হয়।"

"মার-ধোর করেন?"

"তাও হয় বই কি, হাতাটা দিয়ে দিই ছ্ এক ঘা বসিয়ে।"

"বিকেলে কতক্ষণ পড়ান ?"

"ইস্কুল থেকে গিয়েই বসে, তারপর ওর দিদি আসে, সেও বসে মাষ্টারের কাছে, খুসী জ্বালাতন করে বলে বাবু ওকে একটা হাতের লেখার খাতা কিনে দিয়েছেন, রোজ একপাতা করে লেখে।"

এই হলো একটি উদাহরণ। খুসী জানে মা-বাবার বিরুদ্ধে ভাষায় প্রতিবাদ জানানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ মনে মনে তার যে রাগ হয়, তাতে তাঁদের আঁচড়ে, কামড়ে আঘাত করতে পারলে তার মন তৃপ্ত হয়। এই ক্রোধের প্রকাশ তখন হয় অন্যভাবে, সে তখন কামড়াতে আরম্ভ করে নিজের নখ, কাপড়জামা ইত্যাদি এবং যখন আরও অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে তার এই প্রতিশোধপরায়ণতা তখন দেখা যায় যে সে তার কথাগুলি চিবিয়ে বলছে—অর্থাৎ সে তোৎলাচ্ছে। সে এখন আর মা বাবার জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেলে না অথচ সেগুলি নষ্ট না করলেও তার তৃপ্তি হয় না—তাই সে মার কাজের জিনিষটি লুকিয়ে রাখে, হাতাটি সরিয়ে রাখে, সেলাই-এর জিনিষপত্র এদিক ওদিকে ফেলে দেয়, কখনও বা চুরি করে।

গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে শিশুর অপরাধপ্রবণতা যে কিরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার প্রমাণ আমরা প্রতিনিয়তই পেয়ে থাকি। পরিবেশের কথা বলতে গেলেই শিশুর পিতামাতা ও ভ্রাতাভগিনীদের বিষয় আলোচনা করতে হয়। শৈশবে গৃহ শিশুকে কেবলমাত্র আশ্রয় দেয় তা নয় কিন্তু সমাজের অনুমোদিত আচার আচরণেও অভ্যস্ত করে তোলে। উপযুক্ত গৃহ-পরিবেশ শিশুর কাছে বৃহত্তর সমাজেরই ক্ষুদ্র রূপ। সমাজে সকলের সঙ্গে ভবিষ্যতে কিভাবে মিলে-মিশে থাকতে হবে তারই প্রাথমিক শিক্ষা হয় এখানে—রাগ, ভয়, ঈর্ষা, ভালোবাসা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিকে কিভাবে সুসঙ্গতরূপে দমন ও প্রকাশ করতে হয় তারও শিক্ষা হয় এই গৃহেই। (২)

বিমলকে বাড়ীতে সকলে পাগল বলে। বিমলের পিতার বিরাট ব্যবসা, তিনি সারাদিনই ব্যস্ত থাকেন তাঁর চূণ-সুরকীর আড়তে। মাতা দশটি সন্তানের জননী। আর্থিক অবস্থা উন্নত বলে তিনি গৃহকর্ম্মের ভার বিধবা ননদ

(২) "A child cannot at birth be charged with the self-responsibility which he may utimately claim and must ultimately bear. Family and school are institutions whose existence implies a joint responsibility in which parents and teachers have a share—preponderating at first then decreasing as the years pass and the lines of the child's individuality form and harden." Nunn.

ও দাসদাসীর উপরে দিয়ে দোতলায় সেলাইপত্র নিয়ে দিন কাটান। পরিবারে অর্থ আছে কিন্তু সুশিক্ষার অভাব। বাড়ীর বড় ছেলের বয়স এখন একুশ বৎসর, ম্যাট্রিক পাস করে নি। তারই হাতে ছোট ভাই-বোনেদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার। বিমল পিতামাতার অষ্টম সন্তান।

একদিন বিমলের পিতা তাঁর এই ৪ বৎসরের ছেলেটিকে সঙ্গে করে আমাদের শিশুনিকেতনে এলেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধ যে বিমলকে আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করে নিতেই হবে। সে বাড়ীতে সকলকে আঁচড়ায়, কামড়ায়, গায়ে থুথু দেয়, ভেংচি কাটে, অসভ্য কথাবার্ত্তা বলে, জিনিষপত্র ভাঙ্গে, অন্যের কাজ নষ্ট করে দেয়, শান্ত হয়ে এক মিনিটও বসে না—এক কথায় সে একটি মূর্ত্তিমান বিঘ্ন। এমন ছেলেকে আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করে নিতেই ভয় হলো। আমাদের এখানে বিরাট মাঠ আছে, তার ধারে আছে একটি পুকুর, দোতালা বাড়ী, দুই পাশে দুই বড় রাস্তা, সেখান দিয়ে ট্রাম বাস চলে—কোথায় কি করে বসবে তারই বা ঠিক কি? তবুও এমন দুষ্টু ছেলেকে দেখবার ও হাতে করে নেড়েচেড়ে তাকে শুধরানো যায় কিনা—এমন একটি প্রলোভন জাগলো মনে। পিতাকে বলা হলো যে মাত্র একমাসের জন্য তাকে নেওয়া যেতে পারে—ভবিষ্যতের জন্য কোনই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না।

প্রথামত, বিমলকে খেলাধূলার জন্য অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হলো, কিন্তু সে তো অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলবে না, কাজেই তাকে প্রায় সব খেলনাই পৃথক করে দেওয়া হলো, কাছে কাছে রইলেন একজন শিক্ষিকা। এই সময়ে বিমলের খেলার মধ্যে যে আক্রোশপরায়ণতা দেখা গেল তা রীতিমত বিস্ময়কর। সে সব ছোট পুতুলগুলির হাত পা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। একটি বড় পুতুলকে জলে ডুবিয়ে দিল। একটি শাড়ীপরা পুতুলের গায়ে থুথু দিয়ে, সেটির মাথাটা ঠুকে ঠুকে ভেঙ্গে ফেললো। আমরা তো অবাক হয়ে গেলাম ওর ব্যবহারে। বিমলের পিতার সঙ্গে আবার কথাবার্ত্তা হলো। ওর সম্বন্ধে সমস্ত কথা বেশ খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে মায়ের সঙ্গে বিমলের কোন যোগ নেই বললেও চলে। বিমল দুর্দ্দান্ত বলে মা তাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। সকালবেলায় পিসিমা খেতে দেন—তাও সে বাইরে বাইরে খেলা করে বলে অর্দ্ধেকদিন না খেয়েই স্কুলে আসে। তার প্রচণ্ড রাগ—বিরক্ত হলেই থালা, গেলাস, ঘটি, বাটি, ঘড়া, বাড়ীরগোছা চাবী সবই বাড়ীর পাশের পুকুরটিতে ফেলে দেয়। বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে। একবার একটা একশো টাকার নোট তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তার দোকান থেকে ছোলাভাজা কিনে খেতে যায়। দোকানী নোটটি তার বাবাকে ফিরিয়ে দেয়। স্কুলের পর

বাড়ী ফিরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে ওপরে যায় না। বড় ভাই বোনেরাই তাকে শাসন করে, তাকে জিনিষপত্র কিনে দেওয়াও তাদেরই কাজ।

এই সব কথা শুনে আমাদের ভয় হলো যে হয়তো তাকে আমরা কোনমতেই সাহায্য করতে পারবো না—আমাদের সময়ের অপচয় হবে মাত্র। এছাড়া আমাদের আরও ৫৯টি ছেলেমেয়ে আছে তাদের প্রতিও অন্যায় করা হবে হয়তো। কিন্তু পিতার একান্ত অনুরোধে কিছুতেই বিমলের নাম কেটে দেওয়া গেল না। বিমল যখন থেকেই গেল, তখন তাকে মানুষ করার দায়িত্বও নিতে হলো। প্রথমে তার বুদ্ধির পরিমাপটি কত তা পরীক্ষা করে জানা গেল যে বিমলের বয়স ৪ হলেও তার বুদ্ধির পরিণতি হয়েছে ৫ বৎসরের ছেলের মত অর্থাৎ বিমল রীতিমত বুদ্ধিমান। বিমলেরপরিবেশের সঙ্গে আমাদের একরূপ পরিচয় হয়েছে, এখন তার বুদ্ধি সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, এখন দেখা যাক সে শরীরে সম্পূর্ণ সুস্থ কিনা। ডাক্তারবাবু তাকে বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন যে সামান্য সর্দ্দি-কাশি ভিন্ন তার আর কোন রোগ নাই। তখন আমরা পরামর্শ করে স্থির করলাম যে হয়তো বিমল তার বুদ্ধি ও ক্ষমতানুযায়ী বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করতে পায়নি বলে প্রথমে দৌরাত্ম্য সুরু করে, তার পরে অসহিষ্ণু, অপরিণামদর্শী জননী তার ঝঞ্চাট সহ্য করতে না পেরে তাকে একরকম ত্যাগ করেছেন। সে এখন গিয়ে পড়েছে অপরিণতবুদ্ধি দাদা-দিদিদের হাতে। তারা তাকে বুঝতে না পেরে কঠিন শাসনে পীড়িত করে এবং সেই প্রবল শাসনের প্রতিবাদস্বরূপ বিমল এই সকল অসামাজিক কাজ করে।

এইভাবে, বিমলের স্বভাব-চরিত্রের বিকৃতির একটি কারণ নির্ণয় করে আমরা তাকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলাম। এরই মধ্যে আমাদের বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা তার বাড়ীতে গেলেন। সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে তিনি জানালেন যে নিতান্ত স্নেহের অভাবেই বিমলের আচার আচরণ এমনভাবে আক্রোশপরায়ণ হয়ে উঠেছে। পিতামাতার নিকটে তার যেন কোন মূল্য নাই, সে যেন নিতান্তই অবহেলার পাত্র। ক্রমান্বয়ে তাঁদের বিরক্তি, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের পরিচয় চেয়ে বিমল আত্মতৃপ্তি খুঁজছে অন্য জায়গায়। তার মন হয়েছে বিদ্বেষ ও অসত্যপরায়ণ, ব্যবহার হয়েছে অপরাধপ্রবণ।

এক বৎসর ধরে আমরা বিমলকে নিজেদের ধ্যানধারণা অনুসারে নানা কাজে প্রেরণা দিয়েছি, তার নানা অত্যাচার সহ্য করেও তাকে সারাদিন শিক্ষিকাগণ দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করেছেন। অমিয়দাদার

সঙ্গে বসে কাঠ কেটে পেরেক ঠুকে তৈরী হয়েছে পুতুলদের খাট, আলমারী। নার্স-এর সঙ্গে সে ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধুইয়ে দিয়েছে, শোওয়ার জন্য মাদুর পেতেছে, টিফিনের কৌটা খুলে অন্যদের সামনে পরিবেশন করেছে। দিদিমণিদের সঙ্গে ঘর ঝাঁট দেওয়া, ফুলবাগানের কেয়ারী তৈরী করা, বালির ভিতরে খাল কাটা, মাটি দিয়ে জিনিষ গড়া, ছবি আঁকা, কাগজ কেটে, ছবি কেটে বই তৈরী করা--সবেতেই সে পেয়েছে অসীম স্বাধীনতা এবং অক্লান্ত সাহায্য। এর ফলে, যে বিমল কোন স্থানে এক মিনিটও শান্ত হয়ে বসতো না, সেই বিমল এখন প্রার্থনাসভায় নিয়মিতভাবে আসে এবং যে সকল কাজে তার আগ্রহ নাই সেখানেও সে উৎপাত করে না।

বিমলের স্বাধীনতায় একেবারে হস্তক্ষেপ না করায় আমাদের যে অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে যখনই অন্যায় করেছে তখনি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেই অন্যায়ের ফলে হয় আর একজন কষ্ট পেয়েছে, না হয় কোন একটি জিনিষ নষ্ট হওয়াতে তাকে কত অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। যেমন, স্কুলের সাইকেলটিতে বিমলই সবচেয়ে বেশী চড়ে। একদিন ইচ্ছা করে ঠুকে ঠুকে গাড়ীটিকে ভেঙ্গে ফেললো বিমল—তারপর সেই গাড়ী মেরামত হয়ে ফিরে আসতে প্রায় মাসখানেক হলো। সাইকেল চড়তে না পাওয়ায় বিমল বেশ অসুবিধা ভোগ করে এবং কথায় কথায় একদিন নিজেই স্বীকার করলো যে, "দিদিমণি সাইকেল দাও, আর ভাঙ্গবো না।" বিমলের এখন পাঁচ বৎসর বয়স। লিখতে, পড়তে এখন তার সুস্পষ্ট আগ্রহ দেখা যায়, অথচ অন্য ছেলেদের তুলনায় পিছিয়ে আছে বলে সে সকলের সামনে বসে কোনমতেই পড়াশুনা করবে না—এমনই তার আত্মাভিমান। কয়েকদিন হলো আমাদের একটি নূতন খেলা সুরু হয়েছে—দুপুরে যখন সকলে ঘুমায় তখন সকল লোক চক্ষুর অন্তরালে বিমল ও শিক্ষিকা খাতা পেন্সিল নিয়ে বসেন। "এস বিমল আমরা লিখতে বসি—লেখতো—বাবা খাতা কিনে দিও।"—বিমল খাতা ভরে হিজিবিজি কেটে বলে, "বাবাকে লিখে দিয়েছি—কাল বাবা খাতা দেবে।" এই হিজিবিজি কাটতে কাটতে কিছুদিন হলো বিমল "বাবা" লিখতে শিখেছে।

বিজয় চার বৎসরের ছেলে। শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের একমাত্র সন্তান। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমরা খুসী হয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যবহারবিকৃতির পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। সে এত চঞ্চল যে খেতে খেতেও নাচতে থাকে, মনে হয় স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্যই সে এইভাবে লাফায়। পায়খানায় গিয়ে

অন্য শিশুদের গায়ে প্রস্রাব ত্যাগ করে। শিক্ষিকা শাসন করলে বলে, "ওগো, বড়দিদিমণিকে বলো না যেন।" বিজয়ের মায়ের সঙ্গে আলাপ করবো ভাবছি, এমন সময়ে একদিন রাস্তায় তার পিসিমার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি হাসিমুখে বললেন, "বিজয় কেমন করছে স্কুলে?" আমি জবাব দেওয়ার আগেই তিনি বললেন, "গত এক বৎসর বিজয় বহরমপুরে আমার কাছে ছিল, খুব শাসনে রেখেছিলাম, উঠতে বললে উঠতো, বসতে বললে বসতো।" এই সামান্য আলাপেই বিজয়ের হৃদয়ভরা সমস্ত বিদ্বেষ ও দুশ্চিন্তার কারণ আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। যে শিশু তিন বৎসর বয়সে বৃদ্ধা পিসিমার কঠিন শাসনে নিপীড়িত হয়েছে, সে শিশু যে সুযোগ পেলেই সেই পীড়নের প্রতিশোধ নেবে এতে আর আশ্চর্য্য কি?

লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে শিশুর দেহ ও মনের শৃঙ্খল মোচন না হলে তার স্বভাবে শৃঙ্খলাবোধ কোনমতেই স্থায়ী হতে পারে না। মনস্তত্ত্ববিদগণ শিশুকে শৃঙ্খলমুক্ত করে কিভাবে তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করেন সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত যে সকল গবেষণা হয়েছে সেগুলি যেমনই বিস্ময়কর তেমনি শিক্ষাপ্রদ। তাঁরা বলেন, আজ পৃথিবীতে মানুষকে লঙ্ঘন করে কর্ম্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে জীবন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ গার্হস্থ্য জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে; ফলে, গৃহে না আছে স্থানের অবকাশ, না আছে কালের অবকাশ, না আছে ধ্যানের অবকাশ। বিজ্ঞান বলে, ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মের মধ্যে মানুষের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেই বিশ্বনিয়ম মানুষের প্রবৃত্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতেও বলে না, আবার লালন করতেও বলে না। আপনার স্বাভাবিক নিয়মে প্রবৃত্তিগুলি মুক্তিলাভ করবে এই হলো প্রকৃতির নির্দ্দেশ। এই স্বাভাবিক নিয়মের নিতান্তই ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং তাতেই গৃহের মর্ম্মস্থান আক্রান্ত হয়েছে। শিশুই হলো গৃহের মর্ম্মস্থল, তাকে আমরা তার নিজের দাবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছি না। সে তার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলি ব্যক্ত করতে সুযোগ পায় না। পূর্ণবয়স্কের আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সাফল্যের আনন্দে গ্লানির পরাজয়ে সে নিতান্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভাষার সাবলীল গতি তার নাই, জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের তার একমাত্র উপায় হলো— খেলার সাহায্যে নিজেকে মুক্তি দেওয়া, সেই মুক্তির অবকাশ তার নাই বললেই চলে। যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি সে খেলার মাধ্যমে অবলীলাক্রমে তৃপ্ত করতে পারতো—সেগুলি সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থেকে যায়। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর ও মন যখন সবল হয় তখন যে-কোন উপায়েই হোক না কেন সে তার অতৃপ্ত

বাসনাগুলি তৃপ্ত করে। যেখানে বৈধ উপায় থাকে না, সেখানে অবৈধ উপায়ই অবলম্বন করে।

অবচেতন মনের নিরুদ্ধ কামনাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেলাধূলা বা কাজ কর্ম্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে না পারলেই মানসিক বিকার হয়, মনোবিকলন শাস্ত্রে আমরা এমনই নির্দ্দেশ পাই। ফ্রয়েড্‌পন্থিগণ চিত্তবৃত্তির নিগ্রহ ও নির্য্যাতনের উপরেই বিশেষ করে জোর দিয়েছেন। তাঁরা চিত্তবৃত্তিগুলির ভিতরে যৌনবৃত্তিকেই আদিমতম ও প্রধানতম বৃত্তি বলে স্বীকার করেছেন এবং বাস্তব জীবনে যা কিছু আমরা স্থূলভাবে উপভোগ করতে পারি না তাকেই আমরা ভোগ করি মনের দ্বারা—এমন কথাই তাঁরা বলে থাকেন। ফ্রয়েড্‌ বলেন যে কোন নিরুদ্ধ আবেগই পরবর্ত্তী জীবনের অসঙ্গতির কারণ। শৈশবে কোন তীব্র আবেগ অবরুদ্ধ হওয়া খুবই সম্ভব, যেমন হঠাৎ ভীষণ ভয় পেলে কিংবা প্রচণ্ড রাগ হলে তার উপযুক্ত প্রকাশের উপায় না থাকলে, তার একটা ছাপ মানুষের মনে যে থেকে যাবে এমন ধারণা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শিশুর যৌনাকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের যে মত, সে সম্বন্ধে বহু মনস্তত্ত্ববিদই সন্দিহান।

ফ্রয়েডের মতে মানবজাতির যৌনবাসনা হলো জীবনের সমস্ত উদ্যম, কর্ম্ম ও আকাঙ্ক্ষার মূল, কাজেই শিশুর মধ্যেও এই বাসনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "দি থ্রি কনট্রিবিউশন টু দি থিওরি অফ সেক্স" (The Three Contributions to the Theory of Sex) গ্রন্থে শৈশব হতে এই যৌন-আকাঙ্ক্ষার ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড্‌ বিশদরূপে আলোচনা করেছেন। জীবনের প্রথম স্তরে শিশুর যৌনচেতনা থাকে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, কোন নির্দ্দিষ্ট বাহ্য বস্তু বা ব্যক্তিতে তখনও কেন্দ্রীভূত হয় না। দ্বিতীয় স্তরে শিশুর ভালোবাসা স্বভাবতঃই তার জননীকে কেন্দ্র করে উন্মেষিত হয়। শিশুজীবনের এই স্বাভাবিক কামনা কত শত ভাবে আহত হয় তার ইয়ত্তা নাই। মাতার ভালোবাসার প্রবলতম অংশীদার হলেন শিশুর পিতা, তারপরে আসে তার অন্যান্য ভ্রাতাভগিনী ও আত্মীয়স্বজনের দল। জননীকে ঘিরেই শিশুর প্রীতি সবচেয়ে গভীর, তাই বেদনাও সেইখানেই সবচেয়ে বেশী। তার অবচেতন মনে যে ঈর্ষা বা হিংসার উদ্রেক হয়, তাই পরে জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করে বলেই ফ্রয়েডের স্থির সিদ্ধান্ত।

এর পরের স্তরে, শিশুর যৌন-আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে আরও কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে। তার সমগ্র দেহের প্রতি তার একটি বিশেষ প্রীতি জন্মায়। এই সময়ে সে সমলিঙ্গ শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের সঙ্গে খেলা-ধূলা করতে

ভালোবাসে। এটিও একটি অতি স্বাভাবিক ও সহজ পরিণতির স্তর—এই সময়েও শিশুর প্রবর্ধমান মনটিকে তৃপ্ত করবার জন্য চাই সমবয়সী আপনার মত শিশুর সঙ্গ ও নিবিড় সৌহার্দ্দ্য।

যৌবনাগমে মানুষের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী যায় বদলে। সে এখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বাসনার সমস্ত প্রভাব তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। যৌবন-মত্ততার হাব-ভাব, লীলা-চাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম—এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ। লক্ষ্যে, অলক্ষ্যে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, একটি অখণ্ড আনন্দ তার জীবনকে ঘিরে থাকে। কিন্তু সেই আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা মন যদি দেখে জীবন বড় কুটিল, হৃদয় বড় কঠিন, মিলনের পথ সহজ নয়, তখনই যৌবনের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন সহসা বজ্রাঘাতে চিরদিনের মত বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই বিশ্লিষ্ট মনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষাগুলি তখন অবচেতন মনের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের চারিপাশে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে। এরা সচেতন মনে স্থান পেলো না বটে কিন্তু তাই বলে তারা মরেও গেল না। এই অবরুদ্ধ, অতৃপ্ত, অশান্ত কামনাগুলি স্বাভাবিক পথে মুক্তি না পেয়ে অবিরতভাবে চেতন জীবনের ভিত্তিমূলকে আহত করে, আর তাতেই ঘটে মানসিক বিকার।

এইসব অতৃপ্ত বাসনাগুলিকে কোনমতে মুক্তি দিতে পারলেই পাওয়া যায় রোগের আরোগ্য। সচেতন জীবনের আলোকে রোগী যখন নিঃসঙ্কোচে মেনে নেবে যে তার বাসনাগুলি জীবনের গভীরতম সত্য, তার মধ্যে কোন মূঢ়তা বা দুঃসাহস নাই—তখনই সে হবে মুক্ত। মানসিক বিকারের শৃঙ্খলমুক্তি বাইরে থেকে হয় না। রোগীকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে তার মনের বাসনা-কামনাগুলি, যেমন অকুণ্ঠভাষায় নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করেন কবি ও শিল্পী। অবচেতন মনের এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতিই হলো ফ্রয়েড্ প্রবর্ত্তিত মনঃসমীক্ষণ।

পূর্ণবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে যেভাবে মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়—শিশুর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা, বয়স্ক ব্যক্তি সচেতন মনের সাহায্যে বিরোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে চিকিৎসকের কাছে তার মনের সকল গোপন কথা খুলে বলে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে কিন্তু শিশুর কাছে এ পথ খোলা নাই। সেইজন্য শিশুর খেলাকেই আশ্রয় করে তার মনটিকে জানবার চেষ্টা চলেছে গবেষকদের মধ্যে। এ বিষয়ে মেলানী ক্লাইন (Melani Klein), অ্যানা ফ্রয়েড্ (Anna Freud), ডাঃ লোয়েনফিল্ডের (Dr. Lowenfield) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই সত্যের সন্ধান করেছেন, তাই

তাঁদের মতের নানা অমিল থাকা স্বাভাবিক কিন্তু খেলার মাধ্যমে যে শিশুর মনটির বেশ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এ বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত।

দুই তিনটি খুব পরিচিত উদাহরণ দিলে হয়তো খেলার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে। পুতুলখেলার সময়ে দীপিকা রোজই "মা" সাজে। চারিপাশে হাঁড়িকুড়ি, পুতুল ছেলেমেয়ে—তাদের সাজাচ্ছে, গোছাচ্ছে ঘর-করনা করছে—বেশ একটা আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলেছে সে। একটি ছোট ও একটি বড় পুতুলকে সে ভাত বেড়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে দেখা গেল যে একটা ছোট বাটিতে করে কয়েকখানা ভাজা-মাছ সে তুলে রাখছে। "তপন (ছোট ভাই), তুমি আজ আর মাছ-ভাজা খেয়ো না।" তারপরে হঠাৎ কঠিন স্বরে বলে ওঠে দীপিকা, "আচ্ছা আচ্ছা তুমিই খাও—দিদি ওবেলা খাবে।"

একটি একটি উদাহরণ দিই—খুশির মিষ্টি, শান্ত, নরম স্বরটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে—পুতুলটিকে দাঁড় করিয়ে বলে, "তুমি কেবল খেলতেই আছ—ছোট বোনটিকে একটু দেখতে পারো না—না?"

এর চেয়েও বিস্ময়কর খেলা দেখছি নিজের বাড়ীতে। রত্না তিন বৎসর বয়সে একটি মিশনারীগণ পরিচালিত কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে সারাদিনই ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা চলে, এদিকে বাড়ীতে একেবারেই ইংরাজীর চল নেই। এই দোটনায় পড়ে রত্নার প্রাণ যায় আর কি। সে স্কুলে দেখে সে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা কেমন অনর্গল ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলছে ও শিক্ষিকার কথামত কাজকর্ম্ম করছে। শিক্ষিকা তাদের উপরে কত খুশী, তারা কেমন সহজে হেসে খেলে দিন কাটায়। সে বেচারী শত চেষ্টাতেও শিক্ষিকার মনের মত হতে পারছে না। একদিন বাড়ীতে দেখা গেল যে রত্না কয়েকটি মেজ, চৌকী টেনে এনে একটা কাঠগড়ার মত তৈরী করেছে। টেবিলের উপরে অনেকগুলি পুতুল সাজিয়ে, ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে নিজে ঢুকেছে। এখন সে হলো শিক্ষিকা। এর পর দেখা গেল যে, সে ইংরাজী কথার নকল করে কঠিন স্বরে কয়েকটি পুতুলকে বকছে, রুলার তুলে শাসাচ্ছে এবং চৌকীর গায়ে পেন্সিল ঠুকছে। একটু পরে পুতুলছাত্রীর মুখ দিয়ে নিজের নরম স্বরে ইংরাজীতে হিজিবিজি শব্দ করে শিক্ষিকাকে তুষ্ট করছে। আবার শিক্ষিকার ভূমিকায় ফিরে এসে নিজের রুষ্ট মুখখানাতে খুশীর ভাব এনে ইংরাজীতে বলছে, "Go —play" (যাও, খেলা করগে)। এই খেলার অভিনয়ে দেখা গেল যে রত্না দুটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে—একটি হলো শিক্ষিকার আর একটি হলো তার নিজের। শিক্ষিকার আচার ও আচরণ ও কথাবার্ত্তা তার কাছে দুর্ব্বোধ্য বলে, তাকে একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে বন্ধ করেছে, তারপরে সে পুতুলশিশুর

সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিক্ষিকাকে খুশী করে পুরস্কারস্বরূপ খেলার অনুমতি গ্রহণ করছে। অভিজ্ঞ দর্শক মাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, অবচেতন মনের গভীর বিরোধের ফলে শিশুর ব্যক্তিত্ব সাময়িকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাই সে খেলার সাহায্যে অন্তরের সমস্ত বিরোধী ক্রিয়া ও শক্তিকে সংহত করে তার ক্ষুব্ধ মনটিকে আবার সুস্থ করে তুলছে।

ছয় বৎসরের রণজিৎ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দেখতে সে আট বছরের মত, হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু মুখটি তার বড়ই বিষণ্ণ। বয়স আন্দাজে বেশী বড় দেখতে বলে—সবাই মনে করেন তার তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া উচিত। আত্মীয়-স্বজন এ সম্বন্ধে প্রায়ই কটাক্ষপাত করেন। ফলে যা হয় তাই—পিতামাতার রোষ গিয়ে পড়ে শিশুর উপরে। ছোট ভাই অভিজিৎ তিন বছরের, ছোটখাট দেখতে, একটু ভাবুকপ্রকৃতির, মায়ের কোলঘেঁষা। তাকেই সকলে আদর করেন, খেলনা কিনে দেন—অগোছালো ঢিলেঢালা স্বভাবের রণজিৎ দূরে দূরেই থাকে। একদিন সে ছবি আঁকতে বসলো। একটা চারতলা বাড়ী এঁকে তার উপরতলায় সে একা বসে আছে, একেবারে নীচের তলায় আছেন তার পিতা-মাতা আর সঙ্গে আছে সেই ছোট ভাইটি। কোন কোন বার তার বাবা তার মা ও ভাইকে নিয়ে তিনতলা পর্য্যন্ত উঠে আসছেন কিন্তু চারতলাতে আর কোনমতেই তাঁদের স্থান হলো না। কিছুক্ষণ পরে রণজিৎ চার তলার ছাদে চলে গেছে—সেখানে উঠে সে একা একা ঘুড়ি উড়াচ্ছে এমনও একটা ছবি তার খাতায় আঁকা আছে দেখা গেল। ছবিটি বেশ ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে রণজিৎ তার ক্ষুব্ধ অশান্ত মনটিকে শান্ত করবার জন্য চারতলায় গিয়ে একা বসে থাকে। তার একাকীত্বও কত প্রকট হয়ে উঠেছে এই সামান্য চিত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে। যেদিন হয়তো সে মায়ের কাছে আদর পেয়েছে সেদিন তাঁকে কাছে আনতে চায়। হয়তো কাছে আনবার জন্যই পিতামাতাকে তিনতলা পর্য্যন্ত উঠিয়ে আনে। কিন্তু ভালোবাসার জনকে সে এখনও একান্ত ভাবে পায়নি বলেই তাঁদের চারতলা পর্য্যন্ত উঠিয়েও আনে না নিজেও নীচে নেমে যায় না। ঘুড়ি উড়িয়ে তার ক্ষুব্ধ মনটিকে তৃপ্ত করে এবং ক্ষমতালাভের ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটিও হয়তো এইভাবে পূর্ণ করে।

শিশুদের মানসিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মনঃসমীক্ষণ এখনও পরীক্ষা-মূলক অবস্থাতেই আছে বললে ভুল হবে না। তবে খেলাধূলার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর অবচেতন মনের নিরুদ্ধ আবেগ অনুভূতিগুলির বেশ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্যই স্বভাববাদিগণ (Naturalists) ফ্রয়েডের মতবাদ গ্রহণ করে আজ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অবাধ খেলাধূলার এমন একটি

বিশেষ স্থান দিয়েছেন। তবে একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, শিশুর প্রত্যেক কাজের মধ্যেই একটি বিকৃত মনের পরিচয় পাওয়া যাবে এমন মনে না করাই উচিত কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে মনোবৈকল্যের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে বিশিষ্ট মনঃসমীক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করাই সমীচীন। একথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে সকল পর্য্যায়ের শিশুরই খেলাধূলার আবশ্যক—কেননা তাতে সহজ উপায়েই চিত্ত-বিশোধকের (catharsis) কাজটি হয়ে যায়, অর্থাৎ মনের কোণে যে সকল কলুষকালিমা প্রতিদিন সঞ্চিত হয়, প্রতিদিনের খেলার সাহায্যে সেগুলি নিষ্কাশিত হয়ে গিয়ে মনটি ক্রমোদ্‌গতির পথে এগিয়ে যায়। এই বিবর্ত্তন হলো প্রাণের ধর্ম্ম, বিবর্ত্তন প্রবাহের দ্বারাই মানবমন নবতর রূপ গ্রহণ করে।

এই সকল আলোচনা ও বিশ্লেষণের ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে অপরাধী হয়ে কোন শিশু জন্মায় না। পরিবেশের ফলেই হোক, কি আমাদের অজ্ঞতার ফলেই হোক, আমরা শিশুকে অপরাধী করে তুলি। পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্র হতে তার স্বাভাবিক বিকাশলাভের পরিপন্থী অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার একটা সহজ ক্ষমতা প্রত্যেক সুস্থ শিশুরই থাকে। সেই সহজ ক্ষমতাকে অনুকূল পরিবেশের দ্বারা উন্মেষিত করা, বিকাশসাধনে সাহায্য করা প্রত্যেক পূর্ণবয়স্কের দায়িত্ব। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় সেই অনুকূল পরিবেশ রচনায় যে বহু বাধা আছে একথা সকলেই জানেন এবং সেইজন্যই শিক্ষাবিদ ও সমাজ-তাত্ত্বিকগণ শিশুদের জন্য নবতর পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য তৎপর হয়েছেন।

অপরাধপ্রবণতার যে কয়েকটি মূল কারণ আছে সে সম্বন্ধেও আজ জনসাধারণকে সজাগ হতে হবে। গৃহের অর্থনৈতিক দুরবস্থা শিশুর অপরাধ-প্রবণতার একটি প্রধান কারণ হতে পারে। এখন যেমন কাঞ্চন-কৌলীন্যের দ্বারা মানুষের পূর্ণ মূল্য নির্ণীত হয়, পুরাকালে আমাদের দেশে সেইরূপ অবস্থা ছিল না। দারিদ্র্যহেতু শিশু যে অপরাধ করবে একথা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এখন খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, শিক্ষায়তনের গৃহে দুইটি শিশুর মধ্যে কত ব্যবধান। জলখাবার, কাপড়জামা, খাতা, পেন্সিল, কলম, কালী—সব জিনিষের মধ্যে নিজের গৌরব প্রকাশের জন্য যেন একটা গোপন প্রচেষ্টা উঁকি দিচ্ছে। যে হতভাগ্য শিশু পিতামাতার স্নেহ ও ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত, সে ক্রমে ক্রমে এই সকল জিনিষ চুরি করে নিজের অভাব-পীড়িত, স্নেহ-যত্ন-বঞ্চিত মনটিকে তৃপ্ত করে।

দ্বিতীয়তঃ, গৃহে গৃহে আজ এমন একটি প্রতিযোগিতার ভাব দেখা দিয়েছে যে শিশুসন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের প্রয়োজনগুলি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে পিতামাতা উভয়েই অর্থসংস্থানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একটি কথা প্রত্যেক জননীকে

মনে রাখতে হবে যে গৃহপরিজনকে সুখে রাখাই হলো তাঁর প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব, অর্থোপার্জ্জন তাঁর মুখ্য দায়িত্ব নয়। এছাড়া, সুষ্ঠুভাবে গৃহ পরিচালনা করে, সুখে দুঃখে সকলের সেবা করে তিনি গৃহপরিজনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে যে সাহায্য করছেন, এমনটি সকালবেলায় তাড়াহুড়া করে, চাকুরী বজায় রেখে ও সন্ধ্যাবেলায় কর্ম্মক্লান্ত শরীরে বাড়ী ফিরে এসে তাঁর আর স্বামীপুত্রের পরিচর্য্যা করবার অবসর বা সামর্থ্য থাকে না। যে ক্ষেত্রে পুরুষের সংসার প্রতিপালন করবার যোগ্য ক্ষমতা আছে, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর গৃহকর্ম্মেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশে পিতাই হবেন গৃহের কর্ত্তা, তাঁর পরিচালনায় ও স্ত্রীর সাহচর্য্যে গৃহের সমস্ত আবহাওয়ায় থাকবে একটি প্রকৃত কল্যাণকাঙ্ক্ষা। "অন্তরে যদি প্রেম বলে সত্যটি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই তো হলো প্রকৃত মিলন।" কবিগুরুর এই হলো নির্দ্দেশ। প্রত্যেক পরিবারের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কি, অর্থের ক্ষেত্রেই হোক, কি সুখ-সুবিধার ক্ষেত্রেই হোক তার সীমারেখা কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নিরূপণ করে দিতে পারেন না। গৃহের সকল দিক বিবেচনা করে, নিজেদের চাহিদার সীমা নির্দিষ্ট করে নেবেন প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী, এবং তার জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী। স্ত্রীর জীবনের চরম সুখ যেন তাঁর স্বামীপুত্রকে অতিক্রম করে বহির্মুখী না হয়ে ওঠে, এইদিকে আজ লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বিপদের অশুভ সূচনা দেখা দিয়েছে আধুনিক ভারতবর্ষে। ক্রিয়াকর্ম্ম, সামাজিক উন্নতিকল্পে জননী তাঁর সংসারের সীমার বাইরে যে কাজই করবেন তার উদ্দেশ্য ও অর্থ হবে তাঁর মাতৃহৃদয়কে আরও একটু প্রসারিত করে সমাজের মঙ্গলসাধন করা। মনে রাখতে হবে—"মাতৃ-স্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্য্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে"—রবীন্দ্রনাথ।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তাবোধ শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে একটি প্রধান সহায়ক। ছোট শিশু ঘুম ভেঙ্গে জননীকে খোঁজে, স্কুলের ছুটির পর ছেলেমেয়ে মায়ের কাছে বসে জলখাবার খেতে চায়, রাতে পিতামাতার আদরে পরিতৃপ্ত হয়ে শুতে যায়। নিত্য অভাব অনটনের কথা, দৈনন্দিন জীবনের অতৃপ্তি, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্যের ইঙ্গিতে যদি তার জীবন ভরে থাকে তাহলে জীবনের সুরটি বাজে না। তাই জনকজননীর তুচ্ছ কামনার ক্ষমাহীন সংঘাত শিশুর কাছে যত কম পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ততই ভালো; কেননা, এতে তার নিরাপত্তাবোধ আহত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধটি পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বা মৃগীরোগগ্রস্ত শিশুকেও অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ করতে দেখা যায়। নিজের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে প্রতিনিয়ত উৎকর্ষের পথে চালনা করতে হলে চাই বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি যার নাই সে সহজেই সমাজবিরোধী ব্যবহার করে থাকে এবং সমাজের পীড়নে অধিকতর অসহায় হয়ে পড়ে। দেখা গেছে বিশিষ্ট চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকেও এইসব শিশুদের শরীর ও মনের বিশেষ কোন উন্নতি হয় না। তাই এদের জন্য প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশেই বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এইসকল প্রতিষ্ঠান কারাগার বা পাগলাগারদের সামিল না হয়ে ওঠে। হতভাগ্য সন্তানদের দুঃখ মোচন করে তাদের সুখে শান্তিতে রাখাই হবে এইসকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

সোভিয়েট রাশিয়াতে শিক্ষাবিদগণ তরুণ বালকবালিকাদের অপরাধ-প্রবণতাকে ব্যক্তিগত সমস্যা বলে গণ্য করেন না। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন মানুষের মধ্যে বৈষম্য গড়ে উঠেছে, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই তাঁরা অপরাধপ্রবণতার একটি মূল কারণ বলে মনে করেন। অসাম্যের ভিত্তিতে সমাজগঠনের ফলে দারিদ্র্য ও পারিবারিক অশান্তিতে গৃহপরিবেশ বিষাক্ত হওয়ার জন্যই ছেলেমেয়েদের মনে এসেছে নিরানন্দ ও অসন্তোষ। তারা নিজেদের সুখসৌভাগ্য হতে বঞ্চিত বোধ করে এবং নিজেদের অবাঞ্ছিত মনে করে বলে তাদের মানসিক স্থৈর্য্য বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মত হলো এই যে, যেদিন এই সকল বৈষম্যের সমাপ্তি হবে, সেদিন অপরাধ-প্রবণতারূপ অভিশাপ হতে দেশও মুক্ত হবে।

শিশু যাতে অপরাধ না করে সেটাই হওয়া চাই সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এইজন্য সকল পর্য্যায়ের শিশুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার হওয়া চাই। অপরাধ-প্রবণতা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা প্রতিরুদ্ধ না হলে সমাজের ধ্বংস যে অনিবার্য্য একথা আজ শিক্ষিত জনগণের অবিদিত নাই। শাস্তির দ্বারা অপরাধীকে সংশোধন করার পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এমন কি অনেকের মনে এখনও দৃঢ়বিশ্বাস যে তাড়না না করলে শিশুর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিক জ্ঞান জাগে না। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি দণ্ড ও পুরস্কারের, ভয় ও লোভের উপরে গড়ে তোলা যায় না। এতে হয়তো সহজেই এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাওয়া যায় বলে অভিভাবকগণ দণ্ড বা পুরস্কারের দ্বারা শিশুকে শাসন করেন। লক বলেছেন যে এইরূপ শাসনপদ্ধতিতে আশুফল পাওয়া যেতে পারে বটে কিন্তু এতে শাসকের প্রকৃত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্তির উদ্দেশ্য হবে সংশোধন-মূলক। তাড়না ও পীড়নের ফলে যে সংশোধন সম্ভব তা কোনমতেই স্থায়ী

হতে পারে না, কেননা এতে মন্দ অভ্যাসটি হয়তো সাময়িকভাবে দমিত হতে পারে কিন্তু এই শাসন-প্রণালীর মধ্যে কোন গঠনমূলক শিক্ষা না থাকায় এবং ক্ষমা, ধৈর্য্য ও কল্যাণের কোনও পরিচয় না থাকায়, মনে ধরে রাখবার মত শিশুর কোন অবলম্বন থাকে না। (৩)

শিশুর উৎসাহ বৃদ্ধি করতে প্রশংসা ও পুরস্কারের ব্যবহার সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু এখানেও অভিভাবককে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। কেবলমাত্র পুরস্কারের প্রত্যাশায় শিশু যদি ভালো কাজ করে, তবে তার মন হয়ে উঠতে পারে সঙ্কীর্ণ ও লোভী। প্রতিযোগিতামূলক কাজে পুরস্কারের আশা থাকলে শিশুর মনে সহজেই হিংসা ও ঈর্ষার উদ্রেক হতে পারে। পুরস্কার ও প্রশংসার সাহায্যে যাতে স্থায়িভাবে শিশুর চরিত্র উৎকর্ষের পথে যেতে পারে, এই উদ্দেশ্যটি সম্মুখে রেখে শিশুকে প্রকৃত সামাজিক শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়। (৪) ক্রমে ক্রমে যৌথভাবে কাজ করতে শিখলে শিশু একদিন বুঝতে পারবে যে একতার মধ্যে কত বড় শক্তি নিহিত আছে এবং যখন একে অন্যের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হতে শিখবে, তখনই বোঝা যাবে যে শিশুর শিক্ষা সার্থকের পথে। তাদের জানাতে হবে যে "শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতং," অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব।"

আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি শাসন দমন ও পীড়নের দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে হিংস্র পশুর মত সংযত করতে নির্দ্দেশ দেয় না। সৌন্দর্য্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, ও মঙ্গলের দ্বারা পাপ একেবারে ভিতর হতে বিলুপ্ত ও বিলীন হয়ে যাবে, এই হলো আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। এইরূপ কল্যাণধর্ম্মের নিয়ন্ত্রণে জীবনে আসবে একটি সংশয়হীন পরিপূর্ণ শান্তি ও নিষ্কলুষ সৌন্দর্য্য।

আজ শিক্ষাজগতে একটা মন্থন চলেছে। যেদিন তা থিতিয়ে যাবে, সেদিন এই আলোড়ন থেকে কোন নূতন শিক্ষাদর্শ কি ভাবে জাগ্রত হবে সে সম্বন্ধে

---

(৩) (ক) "It is the lazy and short way of Government. Locke.

(খ) "The utmost it can do, is to prevent the fromation of bad habits but it can never help the child to form good habits. The great secret is to remember that children must have their character built and wills formed when they are good." Mumford—The Art of Bringing Up Children.

(৪) The cardinal principle of any good system of rewards is that it should not serve the merely temporary purpose of securing good conduct on a particular occasion, but that it should take account of the permanent effects on character." Raymont—The Principles of Education.

ভবিষ্যদ্বাণী করবার সাহস আমার নাই। মনে হয় বর্ত্তমান ভারত যেন এক বাৎসল্য-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করে রেখে যাচ্ছে এক শক্তির আধার ও সম্পদের সঞ্চয়। সুখী হোক তারা যারা আসছে; সুখী হবে তারা যারা আসবে।

গ্রন্থসূচী :—

Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology.

McDougall—Outline of Abnormal Psychology.

Bowley—The Natural Development of the Child.

C. E. Rogers—The Clinical Treatment of the Problem Child.

Suttie—Origins of Hate and Love.

S. Isaacs—The Psychological Aspects of Child Development.

Cyril Burt—The Young Delinquent.

A. S. Neil—Problem Child.

C. W. Valentine—The Difficult Child and Problem of Discipline.

সমাপ্ত